ইন্দ্র মিত্র

ইতিহাসে আনন্দবাজার



ইতিহাসে আনন্দবাজার

আনন্দবাজার পত্রিকার অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস

ইন্দ্রমিত্র

EVALUATION UNIT
Govt. of W. Bengal
LIBRARY
CALCUTTA-19

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : পূর্ণেন্দু পত্রী

বর্ণানুক্রমিক সূচী : শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ : ৪ অক্টোবর ১৯৭৫

কপিরাইট : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড

মূল্য : ১২·০০

.R.T.. West Bengal
...10-7-85...
c. No. 3992...
079.5414
IND

চিত্র পরিচিতি :

১। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার
২। শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার
৩। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

ইতিহাসে আনন্দবাজার

নিবেদন

বর্তমান গ্রন্থে দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস নিবেদিত হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি। অনুগ্রহ করে ভূমিকা লিখেছেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে দিয়েছেন শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায়। সংশিলষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে আমার ঋণ বিনম্র কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি। যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও হয়তো কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেল। সেজন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমাভিক্ষা ভিন্ন উপায় নেই।

ইন্দ্রমিত্র

ইতিহাসে আনন্দবাজার

ভূমিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯২২ সালের দোলযাত্রার দিনে (১৩ই মার্চ) প্রথম প্রকাশিত হয়। লাল কাগজে ছাপা কাগজ। আমি তখন ঢাকায়। তবু আনন্দবাজারের আবির্ভাব সেখানেও সাড়া জাগাল। নতুন কাগজ, নতুন নায়কের বারতা নিয়ে প্রকাশিত হলো। আশ্চর্যের বিষয়, প্রকাশের কিছুকাল পরেই আনন্দবাজার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

আনন্দবাজার পত্রিকার জনপ্রিয়তার কারণ—বাঙালী জাতির কাছে আনন্দবাজার 'নিজের পত্রিকা' হয়ে ওঠে এবং আজও তা সগৌরবে বজায় রেখেছে। আনন্দবাজার জাতীয়তাবোধ, স্বাদেশিকতা, বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে সর্বদা প্রাধান্য দিয়েছে। কি পরাধীন, কি স্বাধীন ভারতে—সর্বদাই বাঙলাদেশের দুঃখ-দুর্দশা অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের দৃপ্ত দাবি জানিয়ে জনমত গঠনে সহায়ক হয়েছে অনন্দবাজার। 'স্বরাজ' সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকার ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। প্রসঙ্গত আনন্দবাজার পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের (১৮ই মার্চ ১৯২২) অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিঃ

> "স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার—আর উহা আমাদের লাভ করিতেই হইবে, নতুবা আমাদের জাতির থাকা-না-থাকা সমান। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এই স্বরাজলাভের জন্যই জীবনপাত করিয়াছেন। সর্বপ্রকার দুঃখ ও নির্যাতন অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন। আর আজ মহাত্মা গান্ধী স্বরাজলাভের জন্য জাতির সম্মুখে ত্যাগ ও তপস্যার আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত অপূর্ব নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলন এই স্বরাজলাভেরই পথ নির্দেশ করিতেছে। মহাত্মা এই স্বরাজযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়াছেন। তিনি আজ কারাগারে। কিন্তু জাতি তাঁহার নির্ধারিত পথ কি ভুলিয়া যাইবে?

"স্বরাজলাভের পথে ঘরে বাইরে অনেক বিঘ্ন আছে। বাহিরের যে প্রতিকূল শক্তি—যে ঈর্ষা, লোভ ও ক্ষমতালিপ্সা আমাদের স্বরাজলাভের পরিপন্থী, তাহার মোড় আমাদিগকে ফিরাইতে হইবে—লোভ ও ক্ষমতালিপ্সার গতিকে—বিশ্বমানবিকতার উচ্চ আদর্শের দিকে চালিত করিতে হইবে। যাহারা ভ্রান্ত ধারণা ও স্বার্থের বশীভূত হইয়া, আমাদের মুক্তি-লাভের প্রতিকুলতা করিতেছে প্রেম ও অহিংসার দ্বারা তাদের হৃদয় জয় করিতে হইবে।"

আনন্দবাজার এইভাবে দিনের পর দিন পথনির্দেশ করেছে—জনমত গঠনে সাহায্য করেছে।

১৯২৪ সালের ২৩শে নভেম্বর কংগ্রেস অসহযোগ প্রত্যাহার করে কাউন্সিলে প্রবেশ নীতিকেই সরকারী নীতি বলে গ্রহণ করে। এই নিয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কয়েকটি অগ্নিগর্ভ সম্পাদকীয় লিখেছিল। প্রসঙ্গত একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিঃ

"জীবন্মৃত হইয়া, দুর্বহ অস্তিত্ব পলে পলে বহনের অভিশাপ মাথায় লইয়া আমরা কোথায় চলিয়াছি? ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ দেশের সেবা—বীরধর্ম ও শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ! বরষার বিপুল সলিল সম্ভার নদী যেমন কৃপণের মত বন্ধনে ধরিয়া রাখে না, দুই কুল ভাঙিয়া চুরিয়া উভয় পার্শ্বের ধরিত্রীকে প্লাবিত করিয়া শস্যশ্যামলা করিয়া তোলে, তেমনি শক্তিমান তাহার শক্তির ঐশ্বর্যকে ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রয়োজন পূরণে রাখিতে পারে না,—তাহা ব্যষ্টির প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া সমষ্টির সেবায় দিকে দিকে উছলিয়া পড়ে। "তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন, তোমরা বীর হও"—নব্যভারতের মন্ত্র-গুরুর এই অমোঘ দীক্ষা কি বাঙালী যুবক ভুলিতে বসিয়াছে?"

ইতিহাসে আনন্দবাজার

আনন্দবাজার পত্রিকা বিহারের ভূমিকম্প (১৯৩৪) ও ভাওয়াল মামলার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করে বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ভাওয়াল রাজবাড়ির মামলা চলাকালীন ঢাকাতে দেখেছি আনন্দবাজার কেনার জন্যে জনসাধারণের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। বাড়ির মহিলারা রান্না করার ফাঁকে ফাঁকে আনন্দবাজার পড়তেন।

মহাত্মা গান্ধী ও অসহযোগ আন্দোলন চলার সময় আনন্দবাজার পত্রিকা নির্ভীক সাহসিকতার সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। বাঙলাদেশের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের প্রয়াসের পেছনেও আনন্দবাজার দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছে। ভারতবর্ষের নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতিটি কাজে আনন্দবাজার ছিল সহযোগী। ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রের অপ্রত্যাশিত গৃহত্যাগের সংবাদটি শুধুমাত্র আনন্দবাজার পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়। ২৬শে জানুয়ারী গভীর রাতে শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার খবরটি আনন্দবাজারকে দেন। এই খবরটি প্রকাশের পরেই জনসাধারণ এবং ব্রিটিশ সরকার জানতে পারে সুভাষচন্দ্র আর গৃহবন্দী নন। পরে ১৯৪২ সালের ৩০শে মার্চ আনন্দবাজারে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সেই সম্পাদকীয়টি প্রমাণ করে সুভাষচন্দ্রের প্রতি আনন্দবাজারের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের।

> **"শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু**
> 'রয়টার' পরকীয় সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা শোক-লিখন লিখিব না। সুভাষচন্দ্র দীর্ঘজীবী হউন!"

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্রফুল্লবাবু ও সুরেশবাবুর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। সুভাষচন্দ্রকে আনন্দবাজার নিজের একান্ত আত্মীয় মনে করে।

স্বাধীনোত্তর কালেও আনন্দবাজার পত্রিকা তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। যেখানেই অবিচার-অনাচার প্রকট হয়ে উঠেছে সেখানে আনন্দবাজারও সোচ্চার হয়েছে। আনন্দবাজারের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে জাতির মনের কথা। প্রসঙ্গতঃ একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। দেশ তখন স্বাধীন হয়েছে। একদিন সুরেশ মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। আমি অভিযোগের সুরে তাঁকে জানালাম যে, বৃটিশের আমলে সরকারের কাজের তীব্র সমালোচনা আনন্দবাজার করতো। অথচ আজকাল সরকারের অন্ধ সমর্থক কেন সে!

সুরেশবাবু স্বভাবসুলভ হাসি হেসে বললেন, দেখুন আমি কংগ্রেস করি বলে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসকে সমর্থন করি কিন্তু আনন্দবাজার করে না। নতুন সরকার সবে কাজে হাত দিচ্ছে, প্রথমেই বিরূপ সমালোচনা বা আক্রমণ করলে ডিমরালাইজড হয়ে যাবে। সরকারের পক্ষে তা যেমন ক্ষতিকারক হবে, তার চেয়েও বেশী ক্ষতি হবে দেশের।

একটু থেমে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেনঃ এটা নিশ্চিত জানবেন। একটু হাঁটতে শিখলেই আনন্দবাজার কঠোর মনোভাবের সঙ্গে সরকারের কাজের পর্যালোচনা করবে। কারণ, আনন্দবাজার জনসাধারণের পত্রিকা, কোন বিশেষ দলীয় মুখপাত্র বা ক্ষমতাসীন সরকারের প্রবক্তা নয়।

সুরেশবাবুর সেদিনকার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। পরবর্তী কালে আনন্দবাজার অনেকবার সরকারের তীব্র সমালোচনা করে জাতীয় কর্তব্য পালন করেছে। তবে আনন্দবাজারের সমালোচনা সাধারণতঃ কনস্ট্রাক্টিভ। কারণ পত্রিকাটি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী।

বর্তমানে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্…' সঙ্গীতটি আমাদের জাতীয়-সঙ্গীত। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বিবেচনায়, জাতির প্রাণধর্মের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। কংগ্রেস 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতকে সরকারীভাবে জাতীয়-সঙ্গীত হিসেবে কোনদিন গ্রহণ করেনি। স্বাভাবিকভাবে 'বন্দেমাতরম্' দীর্ঘকাল জাতীয়-সঙ্গীতরূপে পরিণত হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৯৩৭ সালের ৩০শে অক্টোবর লিখেছেঃ 'বন্দেমাতরম্' সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের অর্থ—"যতক্ষণ না জাতীয় সঙ্গীত হইবার উপযোগী কোন হিন্দুস্থানী গান পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ 'বন্দেমাতরম্' গান চলিতে পারে কিন্তু তাহাও প্রথম দুইটি পদ্যাংশ মাত্র।" 'বন্দেমাতরম্'-এর এই খণ্ডিত অংশ এখন হইতে 'জাতীয় সঙ্গীত' বলিয়া বিবেচিত ও সম্মানিত হইবে, এই আশ্বাসটুকুও ওয়ার্কিং কমিটির সুদীর্ঘ বিবৃতি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া কোথাও পাওয়া গেল না, বরং ইহার বিপরীত এই কথাই আছে যে, জাতীয় অনুষ্ঠান-সমূহে 'বন্দেমাতরম্'-এর পরিবর্তে অন্য যে কোন আপত্তিশূন্য গানও গাওয়া যাইতে পারে।"

ইতিহাসে আনন্দবাজার

আনন্দবাজার পত্রিকা এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেন। ১৯৩৯ সালের গোড়ায় আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের নূতন রেকর্ড জন-সাধারণের হাতে তুলে দেন। সুভাষচন্দ্র 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত ভারতবর্ষের সর্বত্র যাতে প্রচারিত হয় তাহাই চেয়েছিলেন। তাঁর আশার স্বার্থক-রূপ দিয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকা।

আনন্দবাজার পত্রিকার জন্ম পরাধীন ভারতবর্ষে—মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন তখন সবেমাত্র দানা বেঁধে উঠেছে। জন্মদিন থেকে (১৯২২) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত (১৯৪৭) বহুবার আনন্দবাজারকে সংবাদ ও সম্পাদকীয় ছাপার জন্য রাজরোষে পড়তে হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দুঃখ, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তেমনি আনন্দবাজার পত্রিকাকে ও তার কর্মকর্তাদের বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে এবং হাজার হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৯২৩ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর 'বাঙ্গালী বীর যতীন্দ্রনাথ' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশের জন্য ভারতীয় দন্ডবিধির ১২৪(ক) ধারা অনুসারে পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ও মুদ্রাকর শ্রীঅধরচন্দ্র দাসকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। জামিন দেওয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে জেল হাজতে রাখা হয়। পরে তাঁরা মুক্তি পান। ১৯২৬ সালে আবার ফৌজদারী দন্ডবিধির ১৫৩(ক) ধারা অনুসারে ইংরেজ সরকার পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ১৯২৭ সালের ২৫শে জুলাই শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮ ধারা আনুসারে অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২৯ সালে বিশেষ কংগ্রেস সংখ্যায় বাংলার বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। সম্পাদকের এক হাজার টাকা জরিমানা হয়, ইহা না দেওয়ায় একমাস বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়। এই বছরের ৩১শে ডিসেম্বর পুলিশ আনন্দবাজার অফিস খানাতল্লাসী করে পত্রিকার কংগ্রেস সংখ্যার অবিক্রীত সংখ্যাগুলো বাজেয়াপ্ত

করে। ১৯৩০ সালে বিশেষ কংগ্রেস সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ড হয়। ওই বছরের ১৪ নভেম্বর আনন্দবাজার অফিসে পুলিশ হানা দেয় এবং পরদিন শ্রীমাখনলাল সেনকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে শ্রীমাখনলাল সেনের ছয়মাস কারাদণ্ড হয়। ১৯৩১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের ৯ মাসের জন্য কারাদণ্ড হয়। ১৯৩২ সালে সরকার আনন্দবাজার পত্রিকার কাছ থেকে দুই হাজার টাকা জামানত দাবী করে। ১৯৩৩ সালে এক হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করে; তারপর নূতন করে ৩ হাজার টাকা জামানত দাবী করে। এইখানেই শেষ নয়—ওই বছরেই আবার দুই হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করে নূতন করে ৮ হাজার টাকা জামানত দাবী করে। আনন্দবাজার পত্রিকা সরকারের টাকা মিটিয়ে দেয়। এছাড়াও ওই বছরের ১লা এপ্রিল থেকে পত্রিকার সুরেশবাবু ও সত্যেনবাবুকে ছয়দিনের জন্য বিনা কারণে আটক করে রাখে ইংরেজ সরকার। ১৯৩৪ সালে এক হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করে এবং নূতন করে ১০ হাজার টাকা জামানত দাবী করে। ১৯৩৬ সালে 'সাহিত্যে সরকারী দৌরাত্ম্য' সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশের জন্য সরকার ২ হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করে এবং আবার ১০ হাজার টাকা জামানত চায়। ১৯৩৮ সালে সত্যেনবাবুর ৬ মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাবাস ও মুদ্রাকর শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ৩ মাস কারাবাসের আদেশ হয়। ১৯৪০ সালে 'জাতীয়-সপ্তাহ' সম্পর্কে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আনন্দবাজার পত্রিকা সংবাদ প্রকাশ করলে রাজশক্তি পত্রিকাকে 'সাবধান' করে অভিযোগ থেকে রেহাই দেন। ওই বছর ভারতরক্ষা আইন অনুসারে পত্রিকার বিরুদ্ধে একটি মামলাও হয়। ১৯৪১ সালে সরকারী নির্দেশ অমান্য করবার অভিযোগে মামলা হয়। এই মামলায় সম্পাদকের ১৫০ টাকা এবং মুদ্রাকরের ৫০ টাকা জরিমানা হয়। ১৯৪২ সালে শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারকে ভারতরক্ষা আইনের বলে ২৭শে আগস্ট গ্রেপ্তার করা হয়। ওই সময় বেশ কয়েকদিনের কাগজের প্রচারও বন্ধ থাকে। ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে ইংরেজ সরকার পত্রিকাটির বিরুদ্ধে কয়েকটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ইংরেজ সরকারের দমননীতি আনন্দবাজারকে তার কর্তব্য থেকে বিরত রাখতে

পারেনি। আনন্দবাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীর কর্তব্য পালন করেছে। ১৯ বার শাস্তি দিয়ে রাজশক্তি সেদিনকার আনন্দবাজারকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি।

সংবাদ পরিবেশনায় আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান বাঙলা ভাষায় লাইনো টাইপের প্রবর্তন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুটি কারণে ১৯৩৫ বিখ্যাত। প্রথমটি ১৯৩৫ সালের 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট'—দ্বিতীয়টি বাঙলা ভাষায় লাইনো টাইপের প্রবর্তন। ওই বছরের ২৬শে সেপ্টেম্বর লাইনো টাইপের কার্য্যারম্ভ হয়। সেদিন থেকেই মুদ্রণশিল্পে এক বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাঙলাভাষায় লাইনো টাইপ প্রবর্তনের জন্য বাঙালীর মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ বাঙলা লাইনো টাইপের পেটেণ্ট নিয়ে অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারতেন—কিন্তু করেননি। আনন্দবাজার পত্রিকা জাতীয়তাবাদে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। কাজেই তার কাছে দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি ও শিল্পের উন্নতিই প্রাধান্য পেয়েছে। দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকার অবদানও কম নয়।

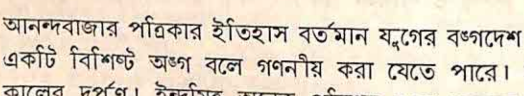
আনন্দবাজার পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারের পিতা শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ছিলেন আনন্দবাজারের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। তাঁর সাহিত্য-চেতনা ছিল অতি উচ্চাঙ্গের। শুধু তাই নয়, বাঙলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেক পড়াশুনা করতেন। আমার সঙ্গে তাঁর সংবাদপত্র বিষয়ে যতো না আলাপ হতো, তার চেয়ে অনেক বেশী হতো দেশের ইতিহাস, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে। আমার এই বিপিন পাল রোডের বাড়িতে তিনি একাধিকবার এসেছেন ও নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। একবার আমার বাড়িতে কতিপয় উৎসাহী তরুণের উদ্যোগে প্রতি মাসেই একটা করে সভা বসতো। সেই সভায় দেশের সাহিত্য থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে আলাচনা হতো। একদিন জনৈক তরুণ প্রফুল্লবাবুকে সভাপতি করে সে সভায় নিয়ে এলো। সেই সভায় কোন একজন বক্তা ইতিহাসের তথ্য নিয়ে কি সব আলোচনা করলেন। আজ আর তা মনে নেই। তা যাক, প্রফুল্লবাবু তাঁর সভাপতির ভাষণে সেই বক্তার সমস্ত বক্তব্যকে দেশ-বিদেশের ইতিহাসের

ইতিহাসে আনন্দবাজার

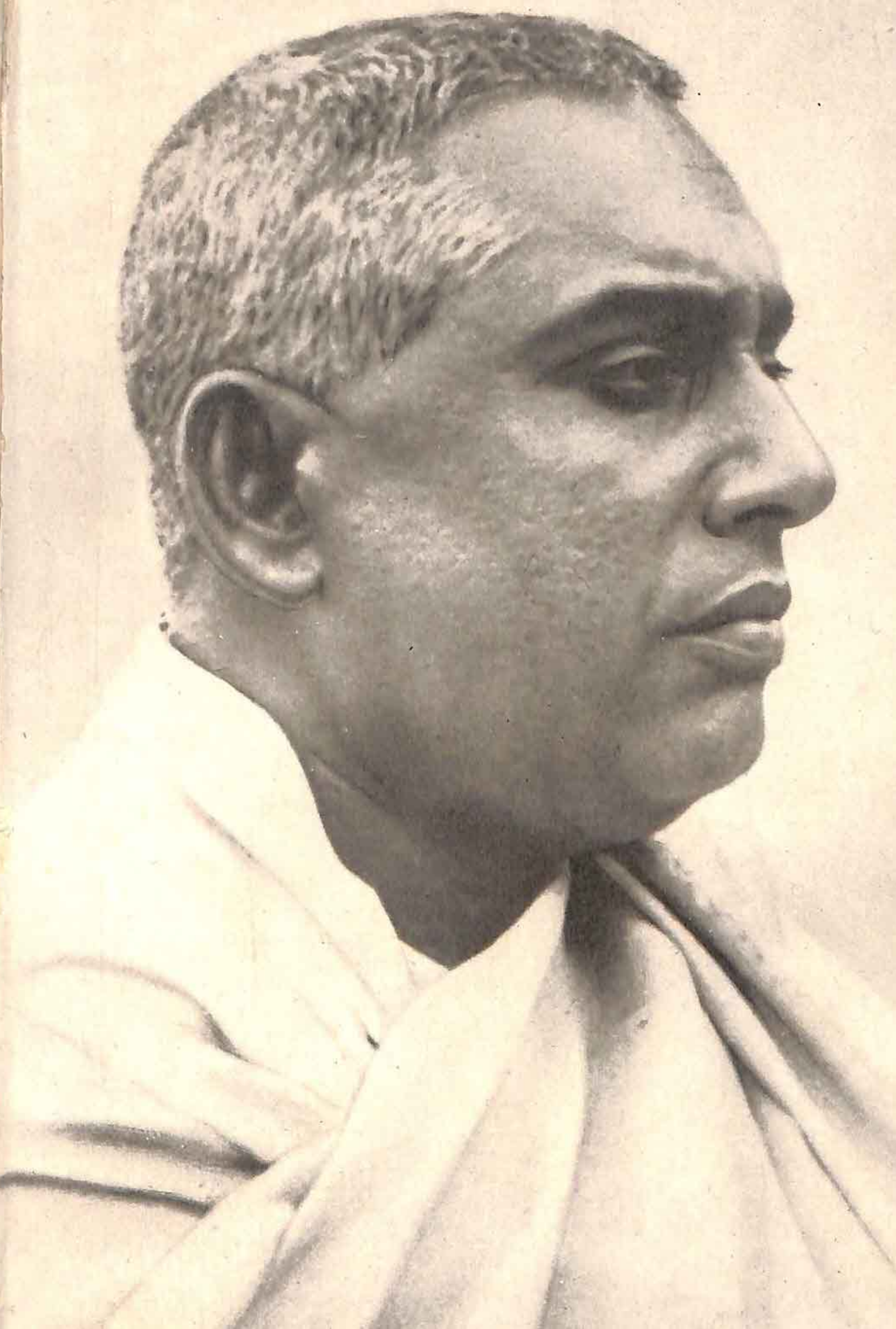
নানা তথ্য ও দৃষ্টান্ত তুলে তুলে একেবারে নস্যাৎ করে দিলেন। সেদিনই তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই ও সখ্যতা জন্মে ওঠে।
ইদানীং বহু সংবাদপত্রের সম্পাদকই শোভাবর্ধনের সম্পাদক। অনেক নামী সম্পাদকই নিজে সম্পাদকীয় লেখেন না, অথচ প্রফুল্লবাবুর ক্ষেত্রে তা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। প্রতিদিনই নানা বিষয়বস্তুর ওপরে তিনি সাহিত্যচেতনাসমৃদ্ধ রচনা পাঠকদের উপহার দিতেন। বাঙলার সংবাদপত্র পড়ুয়াদের কাছে প্রফুল্ল-কুমার তাই এত ঘনিষ্ট হ'তে পেরেছিলেন। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকারের সম্পাদকীয় লেখার আদর্শ তাঁর সুপুত্র শ্রীঅশোককুমার ও পৌত্র অভীককুমারও অনুসরণ করে যাচ্ছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার ইতিহাস বর্তমান যুগের বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালীর ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলে গণনীয় করা যেতে পারে। আনন্দবাজার সমসাময়িক কালের দর্পণ। ইন্দ্রমিত্র অনেক পরিশ্রম করে পুরনো আনন্দবাজার পত্রিকা ও সমসাময়িক নথিপত্র ঘেটে 'ইতিহাসে আনন্দবাজার' লিখেছেন, আমি তার বহুল প্রচার কামনা করি।

....



ইতিহাসে আনন্দবাজার



ইতিহাসে আনন্দবাজার

প্রফুল্লকুমার সরকারের বাড়ি তৎকালীন নদীয়া জিলার কুষ্ঠিয়া মহকুমার কুমারখালি গ্রামে।

পাবনা জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রফুল্লকুমার কলকাতায় এসেছেন। ১৯০৫ সালে তিনি জেনারেল অ্যাসেম্বলী ইনষ্টিটিউসন থেকে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন; এই পরীক্ষায় বাঙলা ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি বঙ্কিম-পদক পেয়েছেন। "কলেজে অধ্যয়নের জীবন হইতে প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশ-সেবার অনুপ্রেরণায় প্রফুল্লকুমার অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তৎকালীন ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এক্ষেত্রে তাঁহার উপদেষ্টা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। সতীশচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া তখন বাঙলার একদল সাধক সন্তান দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন; প্রফুল্লকুমার ইঁহাদের অন্যতম। এই সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের ত্যাগময় জীবনও প্রফুল্ল-কুমারের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"[১]

১৯০৫ সালে প্রফুল্লকুমার বিবাহ করেছেন; স্ত্রীর নাম নির্ঝরিণী সরকার; ইনি স্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষের ভাগিনেয়ী সরলাবালা সরকারের কন্যা।

১৯০৭ সালে প্রফুল্লকুমার বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন; ১৯০৮-০৯ সালে ফরিদপুরে ওকালতি করেছেন। তারপর ডালটনগঞ্জে; সেখানে ওকালতি করে ১৯১২ সাল পর্যন্ত কাটিয়েছেন। সেই শেষ ওকালতি; জীবনে আর কখনও ওকালতি করেননি।

ওকালতি ছেড়ে ১৯১৩ সালে তিনি ঢেঙ্কানল রাজবাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাজ নিলেন। তারপর তিনি হলেন ঢেঙ্কানল স্টেটের সহকারী দেওয়ান; অস্থায়ীভাবে কিছুদিন প্রফুল্লকুমার দেওয়ানের কাজও করেছেন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রফুল্লকুমারের জীবন কেটেছে ঢেঙ্কানলে।

তারপর ঢেঙ্কানলের কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এলেন প্রফুল্লকুমার। "এই সময়ে সংবাদপত্র সেবার দিকে তাঁহার চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। অসহযোগের অভূতপূর্ব আন্দোলনে সমগ্র দেশ তৎকালে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীযুক্ত সরকার এই সময়ে প্রায় তিন চারি মাসের জন্য অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয়

মতিলাল ঘোষের অধীনে সহকারী সম্পাদকের কার্য করেন।"[২]

মায়ের নাম উপেন্দ্রমোহিনী দেবী, বাবার নাম মহেন্দ্রনাথ দাশ মজুমদার। বাবা নদীয়া জেলাবোর্ডের ওভারসিয়ার; তাঁর কর্মক্ষেত্র গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম।

এই দ্বিতীয় সন্তানের নাম সুরেশচন্দ্র মজুমদার। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছেন: "মধ্যশ্রেণীর কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণনগরেই তিনি বাল্যশিক্ষা প্রাপ্ত হন। কিন্তু পিতার অকাল মৃত্যুতে পারিবারিক নানা কারণে স্কুল কলেজের শিক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। দারিদ্র্যের সহিত, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার সহিত কিশোর বয়সেই তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। এই সময় বিষয়কর্মোপলক্ষ্যে বিপ্লবী যতীন মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) কৃষ্ণনগরে যাতায়াত করিতেন। সুরেশচন্দ্র তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া জীবিকার সংগ্রামের পরিবর্তে দেশের মুক্তিসংগ্রামে বৈপ্লবিক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। বিপ্লবী যুবক কলিকাতায় আসিয়া অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী, নরেন ভট্টাচার্য (বিখ্যাত মানবেন্দ্র রায়) প্রভৃতির সহিত পরিচিত হন। দলের সংগঠনে এবং বিবিধ বিপজ্জনক কার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। ১৯১০ সালে পুলিশ সুপার সামসুল হুদার হত্যার অভিযোগে তিনি যতীন মুখোপাধ্যায়ের সহিত গ্রেফ্‌তার হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। প্রমাণাভাবে মুক্তি পাইবার পর তাঁহাকে শিবপুর ডাকাতী মামলার সহিত জড়িত করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয়বারও কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি মুক্তলাভ করেন।...এইকালে গৃহহীন কর্মহীন যুবককে, মনস্বিনী শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার (অমৃতবাজারের শিশিরকুমার মতিলালের ভাগিনেয়ী এবং প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী কিশোরীলাল সরকার মহাশয়ের কন্যা) তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহে মাতৃক্রোড়ে গ্রহণ করেন। সুরেশচন্দ্রের জীবনের ধারা বদ্‌লাইল। সরলাবালার মাতৃস্নেহে এবং সুপরিচালনায় সুরেশচন্দ্রের কর্মজীবনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। শ্রীযুক্তা সরলাবালার প্রচেষ্টায় এবং অমৃতবাজারের মৃণালকান্তি ঘোষের সহযোগিতায় তিনি ১৯১৪ সালে ক্ষুদ্র আকারে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রতিষ্ঠা করিলেন। ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উদ্বোধন কার্যালয়ের পরিচালক গণেন্দ্রনাথ তাঁহার চরিত্র ও ব্যবসায়িক সততায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বন্ধু হইলেন।"

এখানে বলে রাখা ভালো, ইতিপূর্বে ১৯১২ সালে সুরেশচন্দ্র ইরাসমাস অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির অধুনালুপ্ত ক্যাম্ব্রিয়ান প্রেসে কাজ নিয়েছেন; কিন্তু বেশিদিন সেখানে কাজ করেননি।

অতঃপর, আগেই বলা হয়েছে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস স্থাপিত হয়েছে। এই ছাপাখানার চেহারা ও চরিত্র সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার চমৎকার বর্ণনা করেছেন: "শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের একতলায় সুরেশচন্দ্রের ছোট্ট আপিস ঘর—জ্ঞানী গুণী শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক দেশভক্ত-গণের নিত্য সমাবেশ। তাঁহার হৃদয়বত্তা ও চরিত্র-মাধুর্য সকলকেই সমানভাবে আকর্ষণ করে। এমন কি কলেজ স্কোয়ারের পূর্বদিকের ফুটপাতের বাসিন্দা ভিখারীরা পর্যন্ত তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু, সুখদুঃখের কথা বলিয়া দক্ষিণা লইয়া চলিয়া যায়। এই যে প্রত্যহ বহু ভিখারীকে দান, তাহাও তিনি কত নম্রভাবে শ্রদ্ধার সহিত দিতেন। অন্যদিকে প্রবীণ নবীন সকলেরই তিনি অন্তরঙ্গ। কনিষ্ঠদের তিনি সুরেশদা—আপদে বিপদে সাহায্য করিতে পরামর্শ দিতে তিনি অকৃপণ। তাঁহার বিশাল সহানুভূতিপ্রবণ হৃদয়ে যেন সকলের জন্যই স্নেহ মমতা সঞ্চিত হইয়া আছে। মুদ্রণশিল্পের প্রতি তাঁহার অদ্ভুত নিষ্ঠা ছিল, ইহার উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি এবং বিলাতের মতই উৎকৃষ্ট মুদ্রণ তাঁহার ছিল উচ্চাশা। এই সাধনায় সারাক্ষণ ডুবিয়া থাকিলেও, তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক

আন্দোলনের সহিত প্রাণগত যোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। ব্যবসায়ে সততা, উৎকৃষ্টতর মুদ্রণের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। ইহা কেবল ছাপাখানা নহে, নব্য বাংলার দেশভক্তদের মিলন কেন্দ্র।"[৩]

বিধুভূষণ সেনগুপ্ত লিখেছেন: "তাঁকে (সুরেশচন্দ্র) দেখে মনে হত যেন স্বেচ্ছাসেবকের জীবন তাঁর। প্রেসের কাজ, বিপ্লবী ও দেশকর্মী বন্ধুদের সাহচর্য, সরল অনাড়ম্বর জীবন। কখনও তাঁর প্রেসে গিয়ে দেখেছি চারটি চেয়ার একসঙ্গে করে বইপত্র মাথার নীচে রেখে অজস্র কাজের মাঝখানে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছেন।"[৪]

সুরেশচন্দ্র মর্মে-মর্মে অনুভব করলেন, মহাত্মা গান্ধীর কর্মপন্থা ও ভাবধারা এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বার্তা প্রচারের জন্য আদর্শবাদী একখানা দৈনিক বাঙলা সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়োজন। কিন্তু তেমন সম্বল কোথায়? সুরেশচন্দ্র হতাশ হলেন না। তিনি বন্ধুবান্ধব অন্তরঙ্গদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। অনেক আলাপ-আলোচনা হল, বিচার-বিবেচনা হল। এবং শেষপর্যন্ত সুরেশচন্দ্রের সংকল্প সুস্থির রইল—আদর্শবাদী একখানা দৈনিক বাঙালা সংবাদপত্র প্রকাশিতব্য।

বিধুভূষণ সেনগুপ্ত লিখেছেন: "১৯২১এর ডিসেম্বরে, প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের আহ্বানে ঢেঙ্কানল রাজ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লকুমার কলিকাতায় ফিরিলেন। ১৯২১এর সেপ্টেম্বর মাস হইতেই মহাত্মা গান্ধীর পরিচালিত কংগ্রেস আন্দোলনের স্বপক্ষে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার একখানি বাঙলা দৈনিক পরিচালনা করিতে মনস্থ করেন। এই পরিকল্পনায় যোগদান করিবার জন্যই সুরেশবাবুর আমন্ত্রণে প্রফুল্লবাবু কলিকাতা আসিয়াছিলেন। তিনি সর্বান্তঃকরণে যোগদান করিলেন।"[৫]

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র সেন একদিন শুনলেন—গৌরাঙ্গ প্রেস থেকে একখানা নতুন দৈনিকপত্র বের হচ্ছে। সুরেশদা এই কাগজের উদ্যোক্তা।[৬]

দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশের উদ্যোগ-আয়োজন হচ্ছে। চারু রায় প্রথম হেডিং ও অন্যান্য যাবতীয় আঁকার কাজ করে দিয়েছেন।

দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রথম দিন থেকেই এই পত্রিকার সঙ্গে পাতিরাম পারিজার যোগাযোগ।

পাতিরাম পারিজা বলেছেন:

"এই পত্রিকার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মাধ্যমে। সে সময় চিত্তরঞ্জন দাশের 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় উগ্র সিং-এর সঙ্গে আমি কাজ করতাম। উগ্র সিং ছিল 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার বিক্রেতা, অর্থাৎ একমাত্র এজেন্ট, আমি ছিলাম তার সহকারী এবং সুভাষবাবু ছিলেন 'ফরোয়ার্ড'এর ম্যানেজার। সেই সময় সুরেশবাবু, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, জে. এম. সেনগুপ্ত এ'রা সকলেই ছিলেন পরস্পরের একান্ত সুহৃদ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুভাষবাবু আমাদের ডেকে একদিন বললেন, আমাদেরই দলের এক বন্ধু সুরেশ মজুমদার এক পয়সা দামের সান্ধ্য পত্রিকা বার করছেন। আমার ইচ্ছা 'ফরোয়ার্ড'-এর মতো তুমি সুরেশের পত্রিকার বিক্রীর ব্যাপারটা দেখাশোনা করো।

সুভাষবাবুর কথায় উগ্র সিং আনন্দবাজার পত্রিকা বিক্রীর দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন। যদিও সরাসরি দায়িত্বটা উগ্র সিং আমার ওপরেই পরে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। সুভাষবাবুর চিঠি নিয়ে আমরা এলাম ৭১/১, মীর্জাপুর ষ্ট্রীটের বাড়িতে। সেসময় ঐখানেই ছিল আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস। আমরা এসে দেখলাম নিচে গেটের কাছে খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবী পরে দাঁড়িয়ে আছেন সুরেশবাবু। আমরা তাঁকে সুভাষবাবুর চিঠি দিতেই বললেন, কে, সুভাষ পাঠিয়েছে? ঠিক আছে, একটু বসো,

কাগজ এখনো মেসিনে। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। বিকেল সাড়ে চারটে কি পাঁচটা নাগাদ প্রথম আনন্দবাজার বেরুলো।"[৭]

বাঙলা হিসেবে: ২৯ ফাল্গুনঃ ১৩২৮; ইংরেজি হিসেবে ১৩ই মার্চ ১৯২২। দোলপূর্ণিমা। দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সেদিন প্রথম প্রকাশিত হল। আদ্যন্ত লাল কালিতে ছাপা। চার পৃষ্ঠা। একেকটি পৃষ্ঠার আয়তন: ৫৪×৪৪ সেন্টিমিটার। নগদ মূল্য দুই পয়সা। প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনে ভর্তি। ৭১/১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস থেকে অধরচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। কোথাও সম্পাদক অথবা কার্যাধ্যক্ষের নাম নেই।

তিনদিন আগে—১৯২২ সালের ১০ মার্চ—বিকেলে মহাত্মা গান্ধী আমেদাবাদে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন। প্রথমদিনের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ ভৈষজ্যালয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত 'মহাত্মা গান্ধি কারাগারে' শিরোনামে মহাত্মা গান্ধীর তিনকলমব্যাপী একখানা ছবি। প্রায় সমস্ত পত্রিকাটি মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। সেদিনের সম্পাদকীয় থেকে পাঁচটি বাক্য উদ্ধার করি: "মহাত্মা আজ শাসনশক্তির রোষে পতিত—কারাগারে বন্দী। সেজন্য দুঃখ করিবার কিছু নাই; তিনি যে দুঃখের অতীত। দেশের জন্য তিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী,—সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ ও অপমানকেই তিনি মাথায় পাতিয়া লইয়াছেন। দেশসেবা তাঁহার কাছে শুধু politics বা বিলাতি রাজনীতি নহে—এ যে তাঁর ধর্ম্ম। আর এই ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য, তুচ্ছ কারাগারের ক্লেশ তাঁর কাছে কিছুই নহে।"

প্রথম দিন কত কাগজ ছাপা হয়েছিল, কত কাগজ বিক্রী হয়েছিল? উত্তরকালে পাতিরাম পারিজা বলেছেন: "প্রথম ছাপা হয়েছিল এক হাজার কপি। আমি বিক্রী করেছিলাম যতদূর মনে পড়ে ৬০০ কি ৭০০ কপির মতো।"

'স্টেটসম্যান', ১৯২২ সালের ১৪ মার্চ, লিখেছে: "NEW CALCUTTA JOURNAL,—A new vernacular named *Ananda Bazar* appeared yesterday. A peculiar feature of the Journal is that it is printed on red paper."

'ইংলিশম্যান লিখেছে: "A new Bengali daily made its appearance yesterday from the Baghbazar, coloured like a danger signal."

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২২ সালের ১৪ মার্চ, মন্তব্য করেছে: "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান 'আনন্দ বাজারের' বিশেষত্ব সম্পর্কে লালরঙের বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছেন। গতকল্য দোলের দিন বলিয়াই আমাদের কাগজের রং লাল করা হইয়াছিল; নতুবা লাল রংএ কাগজ বাহির করিবার কোন রাজনৈতিক মতলব নাই। 'ইংলিশম্যান' কিন্তু আমাদের 'আনন্দ বাজার'কে 'danger signal' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইংলিশম্যান দেখিতেছি সোজাসুজি মনের ভরটা ব্যক্ত করিয়াছেন। লাল রং দেখিয়া ষাঁড় ক্ষেপিয়া উঠে; ইংলিশম্যান ক্ষেপিয়াছেন কেন?"

প্রথম দিনের দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সংবাদ অল্প হলেও বিশেষত্ববর্জিত নয়, মন্তব্যসমেত পরিবেশিত হয়েছে। উত্তরকালের সাংবাদিক এই সমন্তব্য সংবাদের বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করেননি। অমিতাভ চৌধুরী সম্প্রতি যথার্থ লিখেছেন: "কাঠখোট্টা খবরে ভাষার চেয়ে এই সমন্তব্য সংবাদ পাঠকের কাছে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। অন্যভাবে,

---

*শ্রীপাতিরাম পারিজা এখানে ঈষৎ ভুল বলেছেন, সে সময়ে 'ফরোয়ার্ড' অসম্ভব; 'ফরোয়ার্ড' প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৩ সালের ২৫ অক্টোবর।

অন্য চেহারায়, অন্য ভঙ্গিতে সেই অন্তরঙ্গতার ধারা আজও প্রবহমান।"[৮]

১৯২২ সালের দোলপূর্ণিমার দিন দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু ইতিপূর্বে দৈনিক না হলেও সাপ্তাহিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অস্তিত্ব ছিল। সাপ্তাহিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র জন্মের একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে।

রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী লিখেছেন: "লর্ড লিটন এদেশে গভর্নর জেনারেল হইয়া আসিলে ইডেন সাহেবের অনুরোধে একরাত্রের মধ্যেই মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইন বা Vernacular Press Act বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন দ্বারা ইংরাজিতে প্রকাশিত সংবাদপত্রের দণ্ডের কোন বিধান ছিল না, কিন্তু যদি কোন সংবাদপত্র দেশীয় ভাষায় ও ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত হয় তাহা হইলে ঐ সংবাদপত্রের ইংরাজি অংশের জন্যও দণ্ডের ব্যবস্থা হইল। এই ধারাটী কেবল মাত্র অমৃতবাজার পত্রিকাকে দণ্ড দিবার জন্যই প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই আইন পাসের কয়েকদিন পরেই ইডেন সাহেবকে বলিতে হইয়াছিল যে শিশিরকুমার একজন যাদুকর। তিনি কলিকাতা Small Cause Court-এর Judge বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেন Shishir Kumar is a wizard -ইডেন সাহেবের এইরূপ কথা বলার বিশেষ কারণ ছিল। কারণ উক্ত প্রেস আইন Pass হইবার পর হইতেই অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পূর্ণ ইংরাজি ভাষায় বাহির হইতে লাগিল। শিশিরকুমার হইলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক এবং হেমন্তকুমার হইলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক। আর মতিলাল ছিলেন উভয় ভ্রাতারই দক্ষিণ হস্ত, উভয় পত্রিকারই প্রবন্ধ লেখক।"[৯]

সাপ্তাহিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রসঙ্গে শিশিরকুমার, হেমন্তকুমার ও মতিলাল ঘোষের সঙ্গে আরো একজনের নাম স্মরণীয়—গোলাপলাল ঘোষ। উত্তরকালে গোলাপলাল লিখেছেন: "আনন্দবাজার পত্রিকা যখন প্রথম সাপ্তাহিক আকারে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কার্যালয় হইতে বাহির হয়, তখন বাঙ্গলা দেশে সংবাদপত্র খুব কমই ছিল। আনন্দবাজার সেসময় নির্ভীকভাবে আপনার দায়িত্ব পালন করিতে ত্রুটী করে নাই। স্বর্গীয় হেমন্তকুমার ঘোষ, শিশিরকুমার, মতিলাল প্রভৃতি আনন্দবাজারের শৈশব-ধাত্রী ছিলেন। আমি তাহাকে সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।"[১০]

কিন্তু, দুঃখের কথা, সাপ্তাহিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' দীর্ঘজীবী হয়নি, ১৮৮৬ সালে সাপ্তাহিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বন্ধ হয়ে গেছে। রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী লিখেছেন: "অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে পৃথক হইয়া আনন্দবাজার পত্রিকা হেমন্তকুমারের হাতে দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে লাগিল।...আনন্দবাজার এরূপ প্রতাপশালী হয় যে ইংলিশম্যান ও পাওনিয়ার ঐ কাগজের মত তরজমা করিয়া মন্তব্য সহ প্রায়ই নিজ নিজ কাগজে দিতেন। যখন, প্রেস আইন (Press Act) উঠিয়া গেল তখন হইতে গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ভাষায় ইংরাজি তরজমা ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি বড় বড় কর্মচারিগণকে দিতে আরম্ভ করেন। আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় স্তম্ভের মতও উহাতে নিয়মমত দেওয়া হইত। এই কারণে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিরাও আনন্দবাজারের নাম জানিতেন। একবার একটি রহস্যজনক ঘটনা ঘটে। সেসময় কলিকাতা-খুলনা রেল খোলা হয় নাই। কলিকাতা হইতে রাণাঘাট দিয়া নবগ্রাম পর্যন্ত রেলে যাওয়া যাইত। যাত্রিদিগকে সমস্ত রাত্রি রাণাঘাট ষ্টেশনে থাকিতে হইত। একদিন হেমন্তবাবু যশোহর যাইবার সময় রাণাঘাট ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে (Waiting room) বসিয়া আছেন এমন সময়ে যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট বার্টন (Barton) সাহেবও সেই ঘরে ঢুকিলেন। প্রথমে বাঙ্গালী বলিয়া হেমন্তবাবুর সহিত সাহেব কথা বলেন

নাই কিন্তু মানুষ সমস্ত রাত্র চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। কথায় কথায় বার্টন সাহেব বলিলেন যে "আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক নিতান্ত মূর্খ, কিছুই জানে না, আমার সহিত যদি তাহার দেখা হয় তাহা হইলে বিলক্ষণ শিক্ষা দিই। আপনার ন্যায় well informed বাঙ্গালীর সহিত অদ্যাবধি আমার আলাপ হয় নাই। আপনার মত লোক যদি ঐ সংবাদপত্রের সম্পাদক হয় তাহা হইলে দেশের বিশেষ উপকার হয়।" হেমন্তবাবু তখন নিজের পরিচয় দিলেন এবং সেই হইতে উভয়ের মধ্যে বন্ধুতা হয়। যখন আনন্দবাজার পত্রিকা এইরূপ গৌরবের সহিত চলিতেছিল সেই সময় কতকগুলি সাংসারিক কারণে হেমন্তবাবুর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অমৃতবাজারের বাড়িতে গিয়া সপরিবারে বাস করিতে হয়। সেখান হইতে তিনি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পাঠাইতেন কিন্তু প্রকৃত ভার পড়িল মতিবাবুর* উপর। তিনি বাবু শরৎচন্দ্র রায় ও বাবু মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সাহায্যে কাগজ চালাইতে লাগিলেন। এই সময় আনন্দবাজারের বার্ষিক মূল্য ছিল ৮৲ টাকা। কিন্তু ২৲ বার্ষিক চাঁদা, এবং তাহার উপর উপহারের লোভ দেখাইয়া সস্তা দামের কাগজ বাহির হইল। ঘোষ মহাশয়েরা কাগজের মূল্য কমাইতে নারাজ, সুতরাং গ্রাহকসংখ্যা কমিতে লাগিল। দাম কমাইলে কাগজ চলিত কিন্তু তাহাতে কাগজের মর্য্যাদাহানি হইবে বলিয়া আনন্দবাজার প্রকাশ বন্ধ হইল।...প্রথম পর্য্যায়ের "আনন্দবাজার" বন্ধ হইল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে।"[১১]

কিছুকাল পর আবার 'আনন্দবাজার' দেখা গেল। কিন্তু সেবার আর শুধু 'আনন্দবাজার' নয়, সঙ্গে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, আছে; আগে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া', পরে 'আনন্দবাজার'; নতুন সাপ্তাহিক পত্রের নাম 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার'। একাধারে ধর্মবিষয়ক ও রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্র।

'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতি কটূক্তি করেছে। আহিরীটোলার বৈষ্ণবদাস মুখোপাধ্যায় সেবিষয়ে প্রতিবাদ করে একখানা পত্র প্রেরণ করেছেন 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার' পত্রিকার দপ্তরে, বৈষ্ণবদাসের পত্রের ভাষায় কিঞ্চিৎ সবিনয় আছে, পত্রখানা ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৫-ভাদ্রের 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হল, সঙ্গে দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য। উক্ত মন্তব্যের একাংশ উদ্ধার করি: "পত্রপ্রেরক একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব। আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার পত্রখানি অনুরুদ্ধ হইয়া মুদ্রিত করিলাম। ফলতঃ এ বিষয়ে আমরা যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, সেই সকল দেখিয়া তৎসম্বন্ধে যদি প্রতিবাদ করা আবশ্যক হয়, কটূক্তি না করিয়া ভদ্রভাবে তাহার বাদ প্রতিবাদ করিলে আমরা সন্তুষ্টির সহিত তাহার যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত প্রতিবাদ করিতে সচেষ্ট হইব। কটূক্তি বা গালাগালি করিয়া আত্মাবমাননায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না।"

১৯১৭ সালের ২৬-শের 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা'র শেষপৃষ্ঠায় লেখা আছে: "প্রতি শনিবারে ১৯/২০ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট পত্রিকা প্রেস হইতে শ্রীকেশব লাল রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।" কোথাও সম্পাদকের নাম নেই। সেদিনের পত্রিকা থেকে একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধার করি:

"প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা।
বার্ষিক মূল্য ২৲ অগ্রিম দেয়।
বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি ছত্র ১ম বার ।৵০ ছয় আনা
প্রতি ছত্র ২য় বার ।০ চারি আনা
তিন মাস, ছয় মাস বা এক বৎসরের বিজ্ঞাপনের হার পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

(ম্যানেজার) শ্রীনীহার কান্তি ঘোষ।

আনন্দবাজার পত্রিকা অফিস, ২নং আনন্দ চাটুয্যের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।"

কিন্তু 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা'ও দীর্ঘায়ু হয়নি।

রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী লিখেছেন: "তিনি (শিশিরকুমার ঘোষ) একসঙ্গে ধর্ম্ম-বিষয়ক ও রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার মনস্থ করিলেন। এ এক নূতন কল্পনা; ...'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' ও "আনন্দবাজার" পত্রিকা নাম দিয়া আবার সাপ্তাহিক 'আনন্দবাজার' বাহির করিলেন। ইহার সম্পাদকীয় ভার ছিল শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের উপর। শিশির বাবু মতি বাবু ইহাতে অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধ লেখেন। এই বহু বৎসর দক্ষতার সহিত পরিচালনার পর ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় আবার আনন্দবাজার বন্ধ হইয়া গেল।[১২]

সাপ্তাহিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে আপন সম্পর্কের কথা দৈনিক 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা' অস্বীকার করেনি, আপন অস্তিত্বকে 'নবপর্যায়' হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

কিন্তু আসলে তো নবপর্যায় নয়, নবজন্ম।

১৯২২ সালের ১৩ই মার্চ থেকে প্রত্যহ দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শিরোভাগে লিখিত হয়েছে: "অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকগণ কর্তৃক ১৮৭৭ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত।" কিন্তু "১৮৭৭ সাল" তো স্পষ্টত ভুল। এই ভুল সংশোধন করে ১৯২২ সালের ১০ এপ্রিল থেকে বহুদিন দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শিরোভাগে লিখিত হয়েছে: "অমৃতবাজার পত্রিকা'র পরিচালকগণ কর্তৃক ১৮৭৮ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত।" ১৯২৫ সালের ১০ আগস্ট থেকে দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শিরোভাগে এই বাক্যটি আর মুদ্রিত হয়নি।

দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকার' কার্য্যাধ্যক্ষের নাম প্রথম মুদ্রিত হয়েছে ১৯২২ সালের ১৭ মার্চ। কার্যাধ্যক্ষের নাম: মৃণালকান্তি ঘোষ।

১৯২২ সালের ১ জুন দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় প্রথম দেখা গেল সম্পাদকের নাম: প্রফুল্লকুমার সরকার।

---

*মতিলাল ঘোষ ১৯২২ সালের ৫-সেপ্টেম্বর লোকান্তরিত হয়েছেন। দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, লিখেছে' "এই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে তাঁহার (মতিলাল ঘোষ) সম্বন্ধ এককালে বড় মধুর ও ঘনিষ্ঠ ছিল। মুদ্রাযন্ত্র আইন পাশ হইবার পর, 'অমৃতবাজার' ইংরাজী সংবাদপত্রে পরিণত হইলে, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার ও মতিলাল—তিন ভাই মিলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাহির করেন। প্রধানতঃ হেমন্তকুমার ও মতিলালই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' পরিচালনা করিতেন কারণ শিশিরকুমার 'অমৃতবাজার' লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। কিছুদিন পরে হেমন্তকুমার যশোহরে চলিয়া গেলে মতিলালের উপরই 'আনন্দবাজারের' সম্পাদন ভার পড়ে। সুতরাং 'আনন্দবাজার' যে তাহার শৈশবকালে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র সম্পাদক দেশপূজ্য মতিলালের সেবা পাইয়াছিল একথা স্মরণ করিয়া আজ আমরা আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতেছি।"

১। দেশ, ২২ এপ্রিল ১৯৪৪, পৃ. ২৯৭
২। আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪ এপ্রিল ১৯৪৪
৩। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেশচন্দ্র মজুমদার (কলকাতা, ১৯৫৪), পৃ. ৩—৪
৪। বিধুভূষণ সেনগুপ্ত সাংবাদিকের স্মৃতিকথা (কলকাতা, ১৯৫৫), পৃ. ২৪—২৬
৫। দেশ, ২৯ এপ্রিল ১৯৪৪
৬। দেশ, ২১ আগস্ট ১৯৫৪

৭। পাতিরাম পারিজার সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার
৮। আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭৭, পৃ. ২
৯। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২
১০। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬
১১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২
১২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২

ইতিহাসে আনন্দবাজার

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রথম কার্টুনিস্টের নাম চারু রায়। উত্তরকালে চারু রায় বলেছেন: একদিন পরান (সুরেশচন্দ্র মজুমদার) এসে বলে—'চারু, তুমি তো ভালো কার্টুনও আঁকতে পার। এখন থেকে তুমি আমাদের কাগজে কার্টুনও আঁকবে। পরান সাবজেক্ট বলে দিত, আমি আঁকতাম। প্রথম কার্টুনটা ছিল মণ্টেগুর পদত্যাগ আর সুরেন বাড়ুজ্জেকে ব্যঙ্গ করে আঁকা। তারপরে প্রায় প্রতিদিনই আমার আঁকা কার্টুন থাকত, আর ঐসব কার্টুনে বাংলাদেশে সেসময় আনন্দবাজার হৈচৈ করিয়ে দিয়েছিল। ...প্রতিটি কার্টুনের বিষয় পরান বলে দিত।'"[১]

কার্টুনিস্ট হিসেবে আরো একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনেশরঞ্জন দাশ। তাঁরও বহু কার্টুন সেকালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন—শ্রেষ্ঠতম চিন্তা ভাবসম্পদকে প্রত্যেকের কাছে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২২ সালের ১৬ মার্চ, লিখেছে: "জাতির চিন্তার স্রোতকে ঐক্যের দিকে, কল্যাণের দিকে চালিত করিবার চেষ্টাই সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আলস্যে, ঔদাসীন্যে, জাতির যে বিপুল শক্তি স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে জাগ্রত করিয়া তোলাই আমাদের দায়; সেই সব জাগ্রত শক্তির কর্ম্মপথ নির্দ্দেশ করা নহে। সংবাদপত্রের দায়—শ্রেষ্ঠতম চিন্তা ও ভাবসম্পদকে প্রত্যেকের নিকট বহন করিয়া লইয়া যাওয়া মাত্র—তাহার মধ্যে কতটুকু গ্রাহ্য তাহা বিচার করিবেন মানবহিতব্রতী কর্ম্মীবৃন্দ। বর্ত্তমান জাতীয় জীবনে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়াছে দেশের মনীষীবৃন্দ তাহা মীমাংসা করিবার জন্য যে উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেগুলি যাহাতে ধারণা করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে পারিলেই সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে।"

এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা' চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি।

স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে অহিংসামন্ত্রের পুরোহিত মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশিত

পন্থা অভ্রান্ত, এ-সত্যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নিঃসংশয়। মহাত্মা গান্ধী রাজরোষে ছ-বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ১৯২২ সালের ২০-মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের উপর দিয়া একটা বজ্র-গর্ভ-বিদ্যুত চমকিয়া গেল—মহাত্মা গান্ধির ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড!! এশিয়ার আলোকস্তম্ভ শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের জন্মভূমিতে, এক পরাধীন পতিত জাতির অধঃপতনের চরম অবস্থায়—যখন আমরা চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিলাম, কোন্ পথে যাইব, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না, সেই সময়, সম্মুখে দেখিলাম এক অপূর্ব্ব মূর্তি—দারিদ্র্যে মণ্ডিত, অনশন-ক্লিষ্ট, তপস্যায় শীর্ণ, অহিংসা মন্ত্রের পুরোহিত মহাত্মা গান্ধি!...স্বরাজ লাভের জন্য যে উপায় তিনি নির্দ্দেশ করিতেছেন, এবং যে ভাবে তাঁহার জীবনের আদর্শ ও উপদেশে ঘটনার পর ঘটনার সমাবেশ হইতেছে, তাহাতে ভারত-রঙ্গমঞ্চে তাঁহার লীলাভিনয় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না। সহস্র বৎসর পর ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সমষ্টিমুক্তির এক উদ্দাম কল্পনা লইয়া মহাত্মা গান্ধি অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ মুক্তি রাজনৈতিক-মুক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু সমষ্টি-মুক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে, এই কল্পনা, এই বিপুল অধ্যবসায় যে এক বিরাট মহাপ্রাণ হইতে অনুসৃত হইয়াছে, তাহা ভারতের পারমার্থিক জগতে কেবল বুদ্ধ ও শঙ্করে সম্ভব হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে আজ গান্ধি রাজনৈতিক ভূমিতে পদচারণা করিতেছেন, ঘটনার চক্র যদি উল্টা দিকে ঘুরিয়া যাইত, পারমার্থিক জগতে যদি এই মহাপুরুষ ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় আবির্ভূত হইতেন, তবে ইঁহার স্থান বুদ্ধ ও শঙ্করের পার্শ্বে হইত—নিম্নে নহে।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা' বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা ও উদারতার আদর্শে অভিলাষী। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২২ সালের ১৪ নভেম্বর, লিখেছে: বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও উদারতার আদর্শ রক্ষিত হয়, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।"

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয় হলেও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বঙ্গসমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে উদাসীন থাকেনি। বাঙালীর দোষত্রুটি সম্পর্কে নিঃশব্দ থেকে বাঙালীর স্তাবকতা করে জনপ্রিয় হওয়ার চেষ্টা করেনি।

১৯২২ সালের ১৫-মে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "আজ বাঙ্গালীর দর্শন অন্ধ হইয়াছে, বাঙ্গালীর সাহিত্য 'বিশ্বসাহিত্যের' নামে ফেরঙ্গ উচ্ছিষ্ট বমন করিতেছে, বাঙ্গলার দিক্‌পাল রাজনৈতিক নেতাগণ রাজবাড়ীর বারান্দা মুছিবার ছেঁড়া ন্যাতায় পরিণত হইয়াছে, বাঙ্গলার রাজনৈতিক প্রতিভা, গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, বাঙ্গলার যুবকশক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের দাঁড়ে বসিয়া নিশ্চিন্তে শুষ্ক প্রশ্নপত্র চর্ব্বন করিতেছে, বাঙ্গলার দোকানদার দুহাতে বিলাতী কাপড়ের দোকানের কপাট খুলিয়া দিয়াছে—আর বাঙ্গলার পঞ্চ-সহস্র বাণবিদ্ধ কেশরী কারাগারের অন্ধতমসাচ্ছন্ন গুহায়! এ দুঃখ, এ মর্ম্মযাতনা, এ গ্লানির বেদনা—যদি বিধাতা শক্তি দিতেন, তবে আগুনের হরপে লিখিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীর চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিতাম! রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, পাপ আর পারা হজম হয় না! শতাব্দীর ফেরঙ্গ বিষ আজ বাঙ্গলার সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এত যে অপমান, এত যে দুঃখ, তবু হতভাগ্য জাতির ধৃষ্টতার অন্ত নাই; প্রায়শ্চিত্ত সম্মুখে দেখিয়া, সে সেই মহাসত্যকে 'গুজ্‌রাটের কথা' বলিয়া উপহাস করে!"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২২ সালের ২৯-মে, লিখেছে: "সেদিন কি দরকারে জেনেরেল পোষ্ট অফিসে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম;—অসংখ্য বেহারা, দারোয়ান বা চাপরাসী দাঁড়াইয়া, বুকপোষ্ট পার্শ্বেল ও চিঠি রেজেষ্টারি

বা মনিঅর্ডার করিতেছে;—মধুকর গুঞ্জনের ন্যায় একটা রহস্যময় গুঞ্জন ধ্বনিও বেশ শোনা যাইতেছিল। কিন্তু কি যে খুঁতখুঁতে মন হইয়াছে, সেই বেহারা চাপরাসী দারোয়ানের নিবিড় জনতার মধ্যে একজনও বাঙ্গালী নাই—সবই উড়িয়া, বেহারী বা হিন্দুস্থানী, দুই একটা নেপালী ছোকরাও আছে। ভাবিলাম বাঙ্গালী কি এত ধনী যে এই দরোয়ানী বা চাপরাসীগিরি করিতে তার মন উঠে না?"

১৯২২ সালের ১৬-জুন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে:

"যে শিক্ষায় ভবিষ্যতে শুধু কেরানীগীরি বা বটতলার উকীল ছাড়া আর কিছু হইবার পথ নাই, তার জন্য এত ব্যাকুলতা কেন? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি দেশের কল্যাণকামী মনীষীগণ, পুনঃ পুনঃ এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কেবল 'অরণ্যে রোদন' সার হইয়াছে। বাঙ্গলার যুবকগণ উদ্ভ্রান্তচিত্তে—আত্মহত্যার পথেই ছুটিতেছে।

এদিকে কি সহরে, কি গ্রামে বাঙ্গলার বাহিরের লোক আসিয়া অর্থোপার্জ্জনের সমস্ত পথ ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়া লইতেছে। ছোট বড় সমস্ত রকম ব্যবসা বাণিজ্য, শ্রমশিল্প তাহাদের হাতে যাইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী তাদের দোকানে গোমস্তাগিরি করিয়া উদয়াস্ত খাটিয়া মরিতেছে—কিন্তু তবু তাহারা এমনই 'মানী' যে ঐ "ছোট ছোট" বৃত্তিগুলিতে হাত দিতে তাহাদের মন উঠে না। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পার্শী, বা হিন্দুস্থানী যুবকেরা বি.এ, এম.এ পাশ করিয়া ডিগ্রী পায় না সত্য; কিন্তু তারা না খাইয়া মরে না!"

১৯২২ সালের ২০-জুন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে:

"বাঙ্গালী মরিতে বসিয়াছে,—তাহার জীবনশক্তি দিন দিন ক্ষয় হইয়া যাইতেছে—পদে পদে সে অবাঙ্গালীর হাতে জীবনযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছে, এ কথা যে এতদিন পরে দেশী বিদেশী অনেক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাতে আমরা সুখী হইয়াছি। কেন না, আমরা প্রায়ই বড় বড় সমস্যা লইয়া উন্মত্ত থাকি;—এ সব "ঘরোয়া" কথায় কান দিবার আমাদের অবসর নাই।

"ঘরোয়াই হোক—আর যাই হোক, কথাটা যে নিতান্ত সামান্য নহে তাহা আমাদের বুঝিবার দিন আসিয়াছে। জনকয়েক বেহারী নাপিত, চীনা মিস্ত্রী, উড়িয়া ধোপা বা ভোজপুরী দারোয়ান, বাঙ্গলা দেশে আসিয়া অন্ন সংস্থান করিতেছে, সেই জন্যই যে আমরা অতিমাত্র উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছি, তাহা নয়। অথবা জনকয়েক মাড়োয়ারী, ভাটীয়া, পার্শী বা দিল্লীওয়ালা দোকান-পসার খুলিয়া, বাঙ্গলার ধন লুটিয়া লইয়া যাইতেছে, সেজন্যই যে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছি, এরূপ কথাও লঘু প্রকৃতি বা সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ মনে করিবে না। কেন না আমরা জানি ২।৪ জন বাঙ্গালীও অন্যান্য প্রদেশে গিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকার জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেছে।

"কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, ২।৪ জন বাঙ্গালী যদিও বাঙ্গলার বাহিরে অর্থ সংগ্রহ করিতে যায়, তার চেয়ে অনেক বেশীলোক বাহির হইতে বাঙ্গলায় আসে। আর এই সব বাহিরের লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে, এবং তাহারা দ্রুতবেগে বাঙ্গালীর ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষ-বাস, বাড়ী-বাগান, জমিজমা দখল করিয়া লইতেছে। আমরা এই সব ভিন্ন প্রদেশের লোকদের হিংসা করি না। তাহারা নিজেদের গুণেই, বাঙ্গালীকে জীবন-যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিতেছে।...

"তবে কি বাঙ্গালী জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে?—প্রাকৃতিক নিয়মে জীবনযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, পৃথিবীর অন্য অনেক প্রাচীন জাতির মতই সে প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে? তাহার বাঁচিবার কি কোন উপায় নাই?

"আছে। সে উপায় আর কিছুই নহে,—জীবনের মূলে যে শক্তি কাজ করিতেছে তাহারই সাধনা করা। সে শক্তি হইতেছে ইচ্ছা-শক্তি—will to live! আমরা বাঁচিবই—আমাদের বাঁচিতেই হইবে। পৃথিবীর অন্য দশটা জাতি যেমন বাঁচিয়া আছে—'অন্ন ও অমৃত' উভয়ই আহরণ করিয়া মাতা বসুন্ধরার বুকে লীলা করিতেছে—আমাদেরও তেমনি বাঁচিতে হইবে, জীবনসংগ্রামে অন্য দশটা জাতির প্রতিযোগিতার মধ্যে স্থান করিয়া লইতে হইবে।..."

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২২ সালের ১২-সেপ্টেম্বর, লিখেছে: "ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য প্রতীচ্য সংঘর্ষে অভিশপ্ত বাঙ্গালী জাতির ঘাড়ে যত কুগ্রহ চাপিয়াছে—তার মধ্যে প্রধান হইতেছে—বিলাতী বিলাস ও ব্যসন। ইংরাজ জাতির নির্ভীকতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা অতুলনীয়। কিন্তু পরাধীন দুর্ব্বল আমরা তাহাদের মহৎ গুণগুলি চোখে দেখি নাই; হীন অনুকরণের ফলে তাহাদের বিলাস-ব্যসন, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এইসব গিল্টীর গহনাই অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইয়াছি। তাই 'বাবু' বাঙ্গালী আজ ভারতের সর্ব্বত্র হেয়,—পৃথিবীতে হীন পরগাছার জাতি বলিয়া পরিচিত।"

মাতৃভাষা সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কোনো বক্তব্য নেই? আছে। অতিশয় স্পষ্ট বক্তব্য। বঙ্গদেশে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হবে, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সহজ ও স্বাভাবিক, বিদেশী ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখিয়ে সাফল্য অসম্ভব।

১৯২২ সালের ২৩-জুন 'আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছে: "বিদেশী ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া সাফল্য লাভ করা গিয়াছে, এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার কেহ কখন দেখিয়াছে কি? পৃথিবীর সকল দেশেই, বিশেষতঃ স্বাধীন দেশ সমূহে মাতৃভাষাতেই সব বিষয় শেখানো হইয়া থাকে। উহা এত সহজ ও স্বাভাবিক যে, উহার স্বপক্ষে কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতে হয়, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।"

১৯২২ সালের ২৮-জুন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট-সভার এক অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, উচ্চবিদ্যালয় সমূহে (প্রবেশিকা) মাতৃভাষাই প্রধান পাঠ্য হইবে—ইংরেজী ভাষা দ্বিতীয় বা গৌণ ভাষারূপে গণ্য হইবে। আমাদের দেশীয় কয়েকজন এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের আপত্তি টিকে নাই। এই প্রতিবাদ তুলিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়। ইঁহারা মাত্র ৭টী ভোট পাইয়াছিলেন এবং ২১টী ইঁহাদের বিপক্ষে ছিল। ইঁহাদের ইংরাজী ভাষার প্রতি মমতার প্রধান কারণ এই যে, ভাল ইংরাজী না শিখিয়া ছাত্রগণ কলেজে আসিলে, সাহেব অধ্যাপকদের বক্তৃতা বুঝিতে পারিবে না। ইহার উত্তর দিয়াছেন, ডাক্তার হাওয়েল্স সাহেব। তিনি বলেন, গৌরাঙ্গ অধ্যাপকগণ প্রয়োজন মত বাঙ্গলা শিখিয়া লইবেন।... ইহা যে সম্ভব, তাহা প্রতিবাদকারীদের বেশ জানা আছে, কিন্তু বালকদের সম্পর্কে যদি হাত-পা নাড়িয়া ইংরাজী বক্তৃতার কেরামতিই না দেখানো গেল, তবে যে কষ্টার্জ্জিত বিলাতীবিদ্যার সমস্ত মহিমা ব্যর্থ হইয়া যায়! অতএব ভোটে হারিয়াও ইঁহারা আশা ছাড়েন নাই। পরস্পর জানিতে পারিলাম যে, ইঁহারা এক অভিনব আপত্তি তুলিবেন। বাঙ্গলার হিন্দুদের জন্য যদি বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার বাহন হয়, তবে মুসলমানদের জন্যই বা উর্দ্দুভাষা কেন চলিবে না? এবং ইহা লইয়া নাকি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভায় ইঁহাদের তরফে ভাড়াটীয়া মেম্বর মিলিতে পারে। সে যাহা হউক, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর আবর্জ্জনাগুলির দেশের সম্বন্ধে ধারণা এত বিকৃত যে, দেখিয়া অবাক হইতে হয়। ইঁহারা বোধ হয় জানেন না যে, বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই মাতৃভাষা বাঙ্গলা। ইঁহারা বোধ হয় জানেন না যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন উর্দ্দুভাষা প্রবেশিকা পরীক্ষায় মুসলমানদের জন্য শিক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, মুসলমান সমাজই তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ

করিয়াছিলেন। ইঁহারা বোধ হয় জানেন না যে, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথও বাঙ্গলাভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার অনুকূলে প্রভৃত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ জিদের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ সমস্ত মাতব্বরেরা এত ভাবিবার অবসর পান নাই। যে মুসলমানদের জন্য তাঁহারা এত ব্যস্ত, সেই মুসলমান সমাজের মুখপত্র 'সেবক'ও প্রবেশিকায় মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করা সোৎসাহে সমর্থন করিয়াছেন।"

স্বদেশের শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র আগ্রহের অভাব নেই, কিন্তু কোথাও অনুমাত্র বিলাতী কায়দা দেখলে আপত্তি জানিয়েছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২২ সালের ২১-আগষ্ট, লিখেছে:

"গত শনিবার সন্ধ্যায় "বর্ষামঙ্গল" উৎসব আলফ্রেড থিয়েটারে পুনরায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গতবারে স্থানাভাবে অনেক লোককে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। এবার তাঁহাদেরই সুবিধার জন্য এই অনুষ্ঠান। কিন্তু এবারেও প্রশস্ত থিয়েটার হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না। বোধ হয় এবারও অনেকে টিকেট কিনিতে পারেন নাই।

"ষ্টেজ" পূর্ব্বারের মতই বেশ সাজানো হইয়াছিল। কবি স্বয়ং বসিয়া সমস্ত উৎসব পরিচলনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গলা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এবার আবৃত্তি করিতে পারেন নাই। মাত্র ছোট একটী কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

"সর্ব্বশুদ্ধ বর্ষামঙ্গলের ১৮টী গান গাওয়া হইয়াছিল। গানগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীমতী চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সিদ্ধান্তের পত্নী) ও শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় (শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রবধূ) প্রত্যেকে ২টী করিয়া গান গাহিয়াছিলেন। শ্রীমতী চিত্রলেখার গান অতি সুন্দর হইয়াছিল। সঙ্গীতের জন্য নাকি তাঁহার ডাক নাম "নাইটিঙ্গল" হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের একটু আপত্তি আছে। এদেশে এত শ্যামা, বুলবুল, পাপিয়া, কোকিল থাকিতে নাইটিঙ্গল কেন? সব বিষয়ে বিলাতী কায়দা না হইলে কি আর হয় না!"

অত্যন্ত সামান্য ব্যাপার, কিন্তু 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার জন্য এই সামান্য ব্যাপারটিরও গভীর মূল্য আছে।

নির্ভয়ে যিনি সত্য চিন্তা ও ব্যক্ত করতে পারেন, তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কাছে শ্রদ্ধেয় মানুষ। সেইরকম একজন মানুষ—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সিনেটে তিনি সাহসী বক্তৃতা দিয়েছেন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আনন্দিত হয়েছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২২ সালের ৬-ডিসেম্বর, লিখেছে: "বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় ভাইস-চান্সেলর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। সে আনন্দের কারণ আশুতোষের ভাষার বাঁধুনী, যুক্তির ধারা, বা উদ্দীপনাময়ী বাগ্মিতা নহে; সে আনন্দ এই ভাবিয়া যে এখনও বাঙ্গলা দেশে দোষেগুণে এমন পুরুষসিংহ আছেন, যিনি জগতে দেশী-বিদেশী কোন জুজুর ভয়ই করেন না, যাঁহার মাথা কোন বাহ্যশক্তির কাছেই নত হয় না—যিনি নির্ভয়ে সত্যকে চিন্তা করিতে ও ব্যক্ত করিতে পারেন।"

১৯২২ সালের ৩০ মে থেকে আরম্ভ করে কিছুকাল পর্যন্ত বিজ্ঞাপিত হল: "প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি ও অফিস-সংক্রান্ত পত্রাদি ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে।" কিন্তু কোথাও সম্পাদক অথবা ম্যানেজারের নাম উল্লিখিত হয়নি।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সেসময়ের নিয়মাবলী ১৯২২ সালের ১৮-আগস্টের পত্রিকা থেকে উদ্ধার করি:

"গ্রাহকগণ সম্বন্ধে নিয়মাবলী
পত্রিকার মূল্য সর্ব্বদা অগ্রিম দেয়

	কলিকাতা	মফঃস্বল
১ মাসের জন্য	১।০	১।০
৩ মাসের জন্য	৩৲	৩॥০
৬ মাসের জন্য	৫॥০	৬॥০
১ বৎসরের জন্য	১০৲	১২॥০

ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠাইতে কেহ আমাদের অনুরোধ করিবেন না।

মূল্য যে দিন আমাদিগের হস্তগত হয় সেই দিন অথবা তাহার পরদিন হইতেই গ্রাহককে পত্রিকা প্রেরণ করা হয়।

মূল্য এবং পত্রাদি প্রেরণকালে স্পষ্টাক্ষরে নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর লিখিবেন। নূতন গ্রাহক হইলে পত্রে "নূতন" শব্দটি লিখিবেন।

যে সংখ্যার পত্রিকা বিলম্বে পাইবেন সেই সংখ্যার মোড়কের কাগজ ডাক পিয়নের স্বাক্ষর সহ আমাদের নিকট পাঠাইবেন। কোন সংখ্যার পত্রিকা হস্তগত না হইলে "পোষ্টমাষ্টার জেনারেল, বেঙ্গল" এই নামে অনুযোগ-পত্র পাঠাইবেন।

পত্রিকা পাঠাইবার অন্ততঃ এক মাসের মধ্যে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হইবে। অনুগ্রহ করিয়া এক মাসের মধ্যে গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের জন্য আমাদের অনুরোধ করিবেন না। ঠিকানায় ভুল থাকিলে আফিসে অবিলম্বে জানাইবেন।

পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে বা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিতে হইবে।

এজেণ্টগণ সম্বন্ধে নিয়মাবলী

পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। এজেণ্ট হইতে হইলে প্রতি পত্রিকার জন্য মাসিক ৸৴০ আনা হিসাবে টাকা জমা দিতে হয়। জমার টাকা এজেন্সী ত্যাগের সময় ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

প্রত্যহ ২৫ খানার কম পত্রিকা লইলে পত্রিকা ডাকে পাঠান হয়, রেলে পাঠান হয় না। এজেণ্টদিগকে শতকরা ২৫৲ টাকা হিসেবে কমিশন দেওয়া হয়।

অবিক্রীত কাগজ শতকরা ৫ খানি ফেরৎ লওয়া হয়। মাসের শেষে ঐ পত্রিকার মাথা তারিখ সহ কাটিয়া মাসিক হিসাবের সহিত পাঠাইতে হয়। বাকী অংশ কাগজ কিছু জমিলে পুরাতন কাগজের দরে বিক্রয় করিয়া উহার দামও ঐ হিসাবের সঙ্গে আমাদের পাঠাইতে হইবে।

প্রতি মাসের শেষ দিনে এজেণ্টগণ স্ব স্ব দেয় টাকা ও তাহার হিসাব ম্যানেজারের নিকট পাঠাইবেন। না পাঠাইলে পর মাসের প্রথম সপ্তাহের ভিতর কাগজ পাঠান বন্ধ করা হইবে।

কাগজ বা টাকা পাঠাইবার ডাকমাশুল বা কমিশন এজেণ্টদিগকে দিতে হইবে না।

এজেন্সীর কাগজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে সঙ্গে সঙ্গে জমার টাকাও অনুপাত অনুসারে বৃদ্ধি করিয়া পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে নিয়মাবলী
১ম এবং ৪র্থ পৃষ্ঠার জন্য
সাময়িক (casual)
প্রতিবার (per insertion)

	প্রতি লাইন	প্রতি ইঞ্চি
১ দিনের জন্য	।।৵০	২৸০
৩ দিনের জন্য	।।০	২৲
৬ বা ততোধিক দিনের জন্য	।৵০	১।।০

চুক্তিতে (on contract)
নির্দিষ্ট পরিমাণ (Fixed Space)
প্রতিবার (per insertion)

এক বৎসরের জন্য	প্রতি ইঞ্চি	।।৵০
ছয় মাসের জন্য	"	৸০
তিন মাসের জন্য	"	৸৴০
এক মাসের জন্য	"	১৵০

এক বৎসরের জন্য চুক্তিতে
(Contract for one year)

১০০০ ইঃ ও তদূর্দ্ধ (মাসিক অন্ততঃ ৮০ ইঃ)	।।৵০
৫০০ ইঃ হইতে ৯৯৯ ইঃ (মাসিক অন্ততঃ ৪০ ইঃ)	৸০
২৫০ ইঃ হইতে ৪৯৯ ইঃ (মাসিক অন্ততঃ ২০ ইঃ)	৸৵০
১২৫ ইঃ হইতে ২৪৯ ইঃ (মাসিক অন্ততঃ ১০ ইঃ)	১৵০

কোম্পানির প্রস্পেকটাসের (Company Prospectus), এবং প্যারাগ্রাফ বিজ্ঞাপনের (Paragraph Advertisement) জন্য প্রতিদিন প্রতি ইঞ্চির মূল্য ৩।।০। সাধারণ নোটীশের (Public Notice) জন্য প্রতিদিন প্রতি ইঞ্চির মূল্য সাময়িক (Casual) হারের সমান।

তৃতীয় পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের মূল্য সাধারণ মূল্য অপেক্ষা শতকরা ৫০৲ টাকা বেশী।

স্তম্ভের দুই পার্শ্বের এবং লিডারের বাম পার্শ্বের কলমের বিজ্ঞাপনের মূল্যের জন্য ম্যানেজারের নিকট লিখিবেন বা সাক্ষাৎ করিবেন।

সাময়িক বিজ্ঞাপন দিতে হইলে অথবা পুরাতন বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে যে তারিখের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে অন্ততঃ তাহার পূর্ব্ব তারিখে বেলা ১২টার মধ্যে উহা আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

বিজ্ঞাপনের এজেণ্টগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়। সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। সবিশেষ জানিবার জন্য ম্যানেজারের নিকট লিখিবেন বা সাক্ষাৎ করিবেন।

পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ ইত্যাদি, অভাব-অভিযোগ, বিনিময় ও সমালোচনার্থ পত্রিকা ও পুস্তক ইত্যাদি সম্পাদকের নিকট এবং মনি অর্ডার প্রভৃতি ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হইবে।"

১৯২২ সালের ২৩-সেপ্টেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে একটি 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' উদ্ধার করি: "আগামী ৯ই আশ্বিন ২৬শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার (মফঃস্বল বুধবার) 'আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা' বর্দ্ধিত আকারে নানা প্রবন্ধ, গল্প, রঙ্গ, ব্যঙ্গচিত্র

ইত্যাদিতে সুশোভিত হইয়া বাহির হইবে। মফঃস্বলের এজেন্টগণ পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করুন।"

কিন্তু ওই ২৬-সেপ্টেম্বর শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। সেদিনের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় একটি 'বিশেষ বিজ্ঞাপন' আছে: "গতকল্য কলিকাতায় জলপ্লাবনের জন্য আমরা আমাদিগের পূজার সংখ্যা অদ্য বাহির করিতে পারিলাম না। অদ্য আমাদের সাধারণ সংখ্যাই বাহির হইল। আগামী কল্য প্রাতে পূজা সংখ্যা বাহির হইবে।..."

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রথম শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। শারদীয় সংখ্যার লেখকদের নাম: বিরূপাক্ষ শর্মা; ধনঞ্জয় শর্মা; শচীন্দ্রলাল রায়; বলাই দেবশর্মা; শ্রী— ভট্টাচার্য; বিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন বিদ্যাভূষণ এবং কাজী নজরুল ইসলাম। নিয়মিত আকারের ছ-পৃষ্ঠার শারদীয় সংখ্যা, চারপৃষ্ঠা লালকালিতে ছাপা, দু-পৃষ্ঠা কালো কালিতে। এবং 'বিশেষ দ্রষ্টব্য': "আনন্দবাজারের শারদীয় সংস্করণ দেড় সিট করিয়া দেওয়া হইল। এই জন্য কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি করা হইল না। গ্রাহকগণ দেখিয়া লইবেন।"

দুর্গোৎসব উপলক্ষে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৯২২ সালে ছ-দিন বন্ধ রইল— ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর।

এতদিন পত্রিকার আয়তন চারপৃষ্ঠা ছিল, ১৯২২ সালের ২১-ডিসেম্বর থেকে আয়তন দেড়গুণ হল, ছ-পৃষ্ঠা হল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২২ সালের ২১-ডিসেম্বর, লিখেছে: "আনন্দবাজার" আপাততঃ দেড় সীট করিয়া বাহির হইবে স্থির হইল। মূল্য পূর্ব্ববৎ দুই পয়সাই রহিল। গ্রাহকগণ দেখিয়া লইবেন।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসের প্রথম বেয়ারার নাম কৃষ্ণকুমার দাস। একাধারে সে বেয়ারা দারোয়ান ও পিওন। উত্তরকালে কৃষ্ণকুমার দাস বলেছে: আমি যখন বেয়ারার চাকরি পেয়ে আনন্দবাজারে আসি তখন পত্রিকার অফিস ছিল শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে। সেসময় আমিই আনন্দবাজারের একমাত্র বেয়ারা। শুধু বেয়ারা নয়, দারোয়ান, পিয়ন সব আমি।...রাত্রে আমি অফিসেই ঘুমোতাম। তখন গোটা অফিসে সব মিলিয়ে লোক ছিল কুড়িজনের মতো। পাঁচখানা কি সাতখানা চেয়ার ছিল, টেবিল মনে হয় তিনটে কি চারটে।...প্রফুল্লবাবু আসতেন সকাল এগারোটায়, একেবারে ঘড়িবাঁধা টাইম। যেতে যেতে রাত বারোটাও বেজে যেত। আমি যদি ঘুমিয়েও পড়তাম তবুও আমাকে বকাবকি না করে খুব আস্তে আস্তে ডাকতেন। আমি উঠে দরজা খুলে দিতাম, চলে গেলে আবার বন্ধ করতাম।"

১। চারু রায়ের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।

ইতিহাসে আনন্দবাজার

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কস্মিনকালেও কণামাত্র সংশয় ছিল না। এককালে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক মতানৈক্য হয়েছে, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' মহাত্মা গান্ধীর সমর্থক থেকেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নামে অভিযোগ করেছেন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' মর্মাহত হয়েছে কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শ্রদ্ধা কখনো বিচলিত হয়নি।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২২ সালের ১৯-ডিসেম্বর, লিখেছে: "বাঙলার নেতা—আগামী জাতীয় মহাসভার অধ্যক্ষ দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ যে আমাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে আমরা মর্ম্মাহত হইলেও বিস্মিত হই নাই। আজ যদি আমরা প্রত্যুত্তরে ঐরূপ ভাষা দেশবন্ধুর উপর প্রয়োগ করি, তবে তাহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত অশোভন হইবে; কেননা দেশবন্ধু যাহাই মনে করুন না কেন, আমরা তাঁহাকে দেশনায়ক বলিয়া শ্রদ্ধা করি—তাঁহার উপর কোন কটূক্তি আমাদের প্রাণে লাগে। তাঁহার বর্ত্তমান ভ্রান্তমতের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি বটে, কিন্তু তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে কখনই আক্রমণ করি নাই।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২২ সালের ২৭-ডিসেম্বর লিখেছে: "গয়াধামে জাতীয় মহাসভার সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে।...তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণে ব্যক্ত সমস্ত মতামত হয়ত আমরা পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে না পারি, কিন্তু সর্ব্বত্রই যে তিনি তাঁহার স্বাভাবিক তর্কশক্তি, বিচারনৈপুণ্য ও গভীর রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর সমস্ত অভিভাষণের মধ্য দিয়া সকলের চেয়ে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে দেশবন্ধুর অকৃত্রিম দেশপ্রেম। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী হয়ত কোন কোন স্থলে ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু মাতৃভূমির কল্যাণই যে তাঁহার একমাত্র আদর্শ একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না।"

অভিযোগ উঠেছে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যথাযথ প্রকাশিত হয় না। এই 'অমূলক ও অযৌক্তিক' অভিযোগের প্রতিবাদও যথাসময়ে পত্রস্থ

হয়েছে। অভিযোগ করেছেন হেমন্তকুমার বসু।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদককে হেমন্তকুমার বসু একখানা চিঠি লিখেছেন:
"মাননীয়

"আনন্দবাজার পত্রিকা" সম্পাদক সমীপেষু—
মহাশয়,

২৫ জন সভ্যের স্বাক্ষরিত এক অনুরোধ পত্রের মর্ম্মানুসারে গত ২৫শে রবিবার এই সমিতির একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে গত ১৯শে মার্চ্চ "আনন্দবাজার পত্রিকা" ও ১৮ই মার্চ্চের দেশবন্ধু দাশের হ্যালিডে পার্কের বক্তৃতা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সেইদিনকার সভায় আলোচিত বিষয়ের যাবতীয় সংবাদ আপনার নিকট পাঠান হইয়াছে। আশা করি, তাহা আপনার হস্তগত হইয়াছে। দেশবন্ধুর হ্যালিডে পার্কের বক্তৃতার যে অংশগুলি আপনার পত্রিকায় বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, এজন্য আপনার নিকট একটী আপত্তিজনক পত্র পাঠাইতে সেদিনকার সভা আমাকে আদেশ করেন। সেই সভার আদেশ অনুযায়ী আপনাকে এই পত্র পাঠাইতেছি। প্রথমতঃ দেশবন্ধু সেদিনকার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, শুধু চরকায় স্বরাজ আসিতে পারে না। সেস্থানে আপনার "শুধু" কথাটী তুলিয়া খদ্দরে কখনও স্বরাজ আসিতে পারে না এই কথাটী সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন "মহাত্মার সহিত আমার মনান্তর, না, তাঁহার সহিত কাহারও মনান্তর হইতে পারে না, মতান্তর হইয়াছিল।" সেই স্থলে আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, "মহাত্মার সহিত আমার মনান্তর না—না—না তাহার সহিত কাহারও মনান্তর হইতে পারে না, মতান্তর হইয়াছিল। এখানে তিনটি 'না' এর দ্বারা দেশবন্ধু দাশের বক্তৃতার ভাব বিকৃত হইয়া পড়ে।

কথিত ২৫ জন সভ্য বিশ্বাস করেন কাউন্সিল লইয়া দেশবন্ধু দাশের সহিত মতবিরোধ হইবার পর হইতে "আনন্দবাজার পত্রিকা" সময়ে সময়ে নানা রকম ব্যঙ্গচিত্র ও ব্যঙ্গ উক্তির দ্বারা তাঁহার মতকে বিকৃত ভাবে প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। "আনন্দ-বাজার পত্রিকা" বাঙলা দেশের একখানি জাতীয় মুখপত্র। সেইজন্য এই পত্রিকা দেশবন্ধুর মতন নেতার প্রতি এইরূপ অবিচার করিতেছেন বলিয়া ২৫ জন সভ্য বড় ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়া এই সমিতির এক সাধারণ সভার আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও মনে করেন, বাঙলা দেশের জনসাধারণ, যাঁহাদের ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান নাই, "আনন্দবাজার পত্রিকা" দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে তাঁহাদের মনে অযথা বিরাগ সৃষ্টি করিতেছে। আমার কথা যে "আনন্দবাজার পত্রিকার" প্রচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং এই পত্রিকা যদি দেশবন্ধুর মতগুলি যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের মনে সত্যের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়, তাহাতে দেশের অধিকতর মঙ্গল সাধন হইবে। আমাদের এই পত্রটী আপনার পত্রে প্রকাশ করিবেন এবং একটী সন্তোষজনক উত্তরদানে বাধিত করিবেন। ইতি—

বিনীত—
শ্রীহেমন্তকুমার বসু,
সম্পাদক
বাগবাজার, দর্জ্জিপাড়া, রাষ্ট্রীয় সমিতি।"

হেমন্তকুমারের এই চিঠিখানা ১৯২৩ সালের ৩০-মার্চ্চের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছে; এবং তৎসহ মুদ্রিত হয়েছে সম্পাদকের উত্তর:

"গত ২৭ তাং আপনাদের সভার বিবরণী আমরা পাইয়াছিলাম, কিন্তু আপনাদের পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত উহা প্রকাশ করিতে বিরত ছিলাম। কিন্তু আপনারা আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আপনাদের সভার বিবরণী 'সার্ভেণ্টে' ছাপাইয়াছেন। উক্ত

রিপোর্টে 'আনন্দবাজারে' দেশবন্ধুর বক্তৃতা কোনস্থলে বিকৃত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ নাই। এবং ২৯শে তারিখের 'সার্ভেণ্টে' উক্ত রিপোর্ট যে যথাযথভাবে লিখিত হয় নাই, তৎ সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকারী সম্পাদকের এক প্রতিবাদপত্র ছাপা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সম্পর্কে আপনারা রিপোর্টে যাহা লিখিয়াছেন, তিনি তাহা অস্বীকার করিয়া 'সার্ভেণ্টে' এক পত্র লিখিয়াছেন। যাহা হউক আপনার অবগতির নিমিত্ত পত্রোত্তরে জানাইতেছি—

১। আমাদের রিপোর্ট ইংরাজীর অনুবাদ নহে, নিজস্ব রিপোর্টার কর্ত্তৃক গৃহীত এবং আমরা...উপস্থিত থাকিয়াও দেশবন্ধুর...সৌভাগ্যলাভ করিয়াছি।

২। "শুধু" কথাটি তুলিয়া দেওয়া হয় নাই। তিনি যেরূপ কহিয়াছেন, তাহাই লেখা হইয়াছে। 'খদ্দর বা চরকায় স্বরাজ আসিবে না'—এমন কথা দেশবন্ধু বহুবার বলিয়াছেন। ২৬শে নবেম্বর কলিকাতার খিলাফৎ .কন্ফারেন্সে দেশবন্ধু বলিয়াছেন "No nation could achieve success in a peaceful atmosphere of khadder" এবং ঐ বক্তৃতায় তিনি খদ্দর সম্পর্কে আরও যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে 'শুধু' বা 'only' এইরূপ শব্দ ছিল না। এবারেও 'শুধু' কথাটী আমরা 'তুলিয়া' দেই নাই, হয়তো দেশবন্ধু বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

৩। দেশবন্ধু 'মনান্তর' শব্দটী উচ্চারণ করিবার পর থমকিয়া নীরব হইয়াছিলেন, পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া 'না—না—না' 'মতান্তর' এইরূপ বলিয়াছিলেন। একটী 'না' স্থলে তিনটী 'না' দ্বারা দেশবন্ধুর বক্তব্য যে কি ভাবে বিকৃত হইয়া পড়ে, দুঃখের বিষয় আমরা বুঝিলাম না। বরং তিনটী 'না' দ্বারা দেশবন্ধুর অভিপ্রায় আরও সুস্পষ্ট-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার মহাত্মার সহিত 'মনান্তর' নহে, 'মতান্তর' হইয়াছিল, কিন্তু 'মনান্তর' শব্দটী তিনি ভ্রম বশতঃ প্রয়োগ করিয়া পরক্ষণেই উহা সংশোধন করিয়াছেন। এরূপ স্থলে 'না' এর পুনরুক্তি দৃঢ়তাই সূচিত করে। ইহা বঙ্গভাষাভাষী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

৪। 'দেশবন্ধুর' কোন্ মত বিকৃত করিয়া কবে 'আনন্দবাজারে' দেখানো হইয়াছে, আপনি অবশ্যই তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন, এবং প্রমাণ সহ তাহা উল্লেখ করিলেই শোভনীয় হইত। কিন্তু আপনি তাহা করেন নাই।

৫। দেশবন্ধু দেশের প্রতি, অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি, কংগ্রেসের প্রতি অবিচার করিতেছেন, আমাদের এইরূপ ধারণা। এবং তাহার যথাশক্তি প্রতিবাদ করা আমরা আবশ্যক মনে করি।

৬। দেশবন্ধুর মত 'আনন্দবাজারে' 'যথাযথ ভাবে' প্রকাশ হয় না, আপনার এই অভিযোগ অমূলক ও অযৌক্তিক।

দেশবন্ধুর মত, তৎপ্রচারিত ও অধুনালুপ্ত 'বাঙ্গলার কথায়' বাঙ্গলা ভাষায় তিন মাস ধরিয়া বাহির হইয়াছিল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ব্যতীত, আরও বাঙ্গলা দৈনিক কাগজে দেশবন্ধুর বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত মত বহুবার আলোচিত হইয়াছে। অতএব দেশবাসীর ইংরাজী জ্ঞানহীনতার সুযোগ লইয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা' জনসাধারণের চিত্তে দেশবন্ধুর প্রতি 'অযথা বিরাগের' সৃষ্টি করিতেছে, আপনার এই যুক্তি প্রমাণহীন অভিযোগ আমরা অ-সত্য বলিয়া সসম্ভ্রমে উপেক্ষা করিতেছি এবং ইহা লইয়া বাদানুবাদ একান্ত নিষ্প্রয়োজন মনে করি।"

১৯২৫ সালের ১৬ জুন দার্জিলিঙে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হল; ১৮ জুন সকালবেলা তাঁর মরদেহ ট্রেনে কলকাতায় এল।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৯২৫ সালের ১৮ জুন, লিখেছে: "দেশবন্ধুর চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশ প্রেম—এমন তীব্র স্বদেশপ্রেম এক স্বামী

বিবেকানন্দ বা উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ব্যতীত আর কাহারও মধ্যে আমরা দেখি নাই।" "দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হইলে এখনই আমি প্রাণ বিসর্জন করিতে পারি" —এই কথা অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। আজ আমাদের মনে হইতেছে, দেশের জন্য শক্তি উৎসর্গ করিয়া তিনি মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন।"

উত্তরকালে হেমন্তকুমার বসু বলেছেন: "স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আনন্দবাজারের সংগে দেশবন্ধুর সম্পর্ক ভালো ছিল না। কারণ আনন্দবাজার সর্বদাই মহাত্মা গান্ধীর প্রবল সমর্থক ছিল। ফলে দেশবন্ধুর ভিন্ন মতের রাজনীতিকে সমর্থন করতে পারেনি আনন্দবাজার। অথচ দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর আনন্দবাজার কি আশ্চর্য দরদী ও অশ্রুসজল লেখাই না লিখেছিল!"[১]

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৫ সালের ২১ জুন লিখেছে: "বিধিনির্দিষ্ট অসহযোগ ত্যাগ করিয়া ভিন্নপথের দাবী চিত্তরঞ্জনের সহিত মহাত্মাজীর মতপার্থক্য সত্ত্বেও প্রাণের মিলন একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কলিকাতার চুক্তিনামা হইতে দেশবন্ধুর ফরিদপুরী অভিভাষণ পর্যন্ত—মহাত্মা গান্ধী কি বিপুল স্নেহ ও প্রেম লইয়া সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক সংকটে দেশবন্ধুকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তা সেদিনের ঘটনা! মহাত্মা গান্ধীই চিত্তরঞ্জনকে সন্ন্যাসী করিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধীই তাঁহাকে 'দেশবন্ধু' করিয়া ভারতবর্ষকে এবং মনুষ্যত্বের এক অতুলনীয় আদর্শরূপে সমগ্র জগতকে দান করিয়াছিলেন! সেই মহাত্ম গান্ধীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—সে আর কয় দিন?—আবার গুরুশিষ্যে মিলন হইয়াছিল।"

সকল সংবাদপত্রের অস্তিত্বের পক্ষে বিজ্ঞাপন একটি অপরিহার্য উপকরণ। সেসময়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' দিনের পর দিন বিজ্ঞাপন দিয়েছে।

১৯২৩ সালের ১০ জানুয়ারির 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধার করি:

"আপনি যদি বিজ্ঞাপন দিয়া লাভবান হইতে চান, তবে আনন্দবাজার পত্রিকা আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করিবে।

কোন বাঙ্গলা কাগজে বিজ্ঞাপন দিবার পূর্ব্বে, আপনি নিম্নলিখিত কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবেন।

বাঙ্গলার বাহিরে সমস্ত ভারতবর্ষে যেখানেই বাঙ্গালী আছেন, সেইখানেই 'আনন্দবাজারের' আদর!

'আনন্দবাজারে' সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকপাঠিকাগণের সুবিধার জন্য রাজনীতি, সমাজনীতি, বাণিজ্য, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল মনীষীগণের লিখিত উপাদেয় প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি প্রত্যহই থাকে,—ইহা আনন্দবাজারের বিশেষত্ব।

এই কারণে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে "আনন্দবাজার পত্রিকা" বিরাজিত। বাঙ্গলার অন্তঃপুরে "আনন্দবাজারের" সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর—ইহা আমাদের বিশেষ বিশেষত্ব।

নানাদেশের সংবাদ ও বিশেষভাবে দেশের সমস্ত খবর ও প্রবন্ধাদি প্রচুর পরিমাণে দিবার জন্য পাঠকবর্গের অনুগ্রহে আমরা প্রত্যহ এক সীট্ করিয়া কাগজ বেশী দিতেছি।

অথচ অন্যান্য দৈনিকের সহিত তুলনায় আনন্দবাজারের মূল্য অনেক সস্তা।

১। হেমন্তকুমার বসুর সংগে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।

জনসাধারণের সমাদরে আনন্দবাজারের কাটতি বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতাদের সুবিধার জন্য আমাদের বিজ্ঞাপনের হার সকলের চেয়ে সুলভ। ইহাতে ছোট বড় সকল ব্যবসায়ীই অক্লেশে বিজ্ঞাপন দিতে পারিবেন।

বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও আসামের সমস্ত ছোট বড় সহরেই 'আনন্দবাজার' এজেণ্টগণ কর্ত্তৃক বিক্রীত হয়।

বাঙ্গলাদেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকই ইংরাজী জানে। আর আজকাল গ্রামে গ্রামে জাতীয় আন্দোলনের ফলে বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই দৈনিক আনন্দবাজার পাঠ করিয়া থাকেন,—অতএব সকলশ্রেণীর লোকের নিকট বিজ্ঞাপনের বহুল প্রচারের জন্য, আপনার আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

বিজ্ঞাপনের মূল্য জানিবার জন্য স্বয়ং আসিয়া ম্যানেজারের সহিত দেখা করুন অথবা পত্র লিখিয়া অবগত হউন।"

বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন আছে, তবু 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বিজ্ঞাপনের জন্য নিতান্ত দুর্দিনেও আপন আদর্শ বিসর্জন দেয়নি, মদ কিম্বা ঘোড়দৌড়ের বিজ্ঞাপন গ্রহণ করেনি।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৪ সালের ১২ এপ্রিল, লিখেছে: "আমাদের মতে মদের বিজ্ঞাপনের চেয়ে ঘোড়দৌড়ের বিজ্ঞাপন দেশের পক্ষে কম অনিষ্টকর নয়।...আমরা ক্ষুদ্র হলেও মদের বিজ্ঞাপন ও ঘোড়দৌড়ের বিজ্ঞাপন কখনই ছাপি নাই, ছাপাবোও না, একথা বরাবরই জোর গলায় বলে আসছি।"

কোনো-কোনো 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদপত্র সেসময়ে পয়সার লোভে মদ ও ঘোড়-দৌড়ের বিজ্ঞাপন নিয়েছে, তাদের এই 'নিতান্ত ঘৃণিত কার্য'কে সেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধিক্কার দিয়েছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৪ সালের ১৫ এপ্রিল, লিখেছে: "অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে, এই ঘোড়দৌড়ের নেশা-দমনের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, কোন কোন "জাতীয়তাবাদী" দেশীয় সংবাদপত্র পয়সার লোভে "রেস্‌টীপ" ও ঘোড়দৌড়ের বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া, সাধারণকে উৎসাহ প্রদান করেন। পয়সার লোভে লোকে অনেক কু-কাজ করে সন্দেহ নাই। কিন্তু মুখে জাতি-হিতৈষী সাজিয়া কাজে জাতির আত্মহত্যার পথ দেখাইয়া দেওয়া, নিতান্ত ঘৃণিত কার্য্য বলিয়াই বোধ হয়। দেশীয় সংবাদপত্রের পক্ষে মদের বিজ্ঞাপন ও ঘোড়দৌড়ের বিজ্ঞাপন ছাপানো এক হিসাবে দেশের লোককে আত্মহত্যার পথ দেখাইয়া দেওয়া ছাড়া, আর কি?"

Acc. No. 3293

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শ্রদ্ধা অপরিসীম।

১৯২২ সালের ৩১-মে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রহ্মচারী প্রফুল্লচন্দ্র, পরদুঃখকাতর, ত্যাগী প্রফুল্লচন্দ্র, আজ কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া কর্ম্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র রাজনীতিজ্ঞ নহেন, তিনি রাজ-নৈতিক নেতা হিসাবে দেশের সম্মুখে দণ্ডায়মান হন নাই। তিনি কর্ম্মী—তাই তাঁহার বার্দ্ধক্যজীর্ণ দেহের মধ্য হইতেও জীবন্ত জাগ্রত জীবনের অদম্য তেজ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে। তিনি মহৎ, তাই কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত মহাত্মা গান্ধির অলোকসামান্য চরিত্র-মহিমা তাঁহাকে অভিভূত ও আলোড়িত করিয়াছে। দীন দরিদ্র, পতিত উৎপীড়িতের প্রতি যে গভীর মমত্ববোধের জীবন্ত মূর্ত্তি, আমরা বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ ও গান্ধিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—আজ সেই একই মমত্ববোধের প্রেরণায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র নগ্নপদে জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপিত বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রাজকারাগারে বন্দী!—আজ সারা বাঙ্গলায় যদি একজন মানুষের নাম

R.T. West Be... Library

করিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম স্মরণীয়।..."

১৯২৩ সালের ১৭-জুনের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধের স্থলে প্রকাশিত হল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'পঞ্চদশ গান্ধি-পুণ্যাহ' নামে একটি রচনা। রচনাটি থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করি: "এক বৎসরকাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন নগরে ও বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া দেশের কিছু পরিচয় পাইয়াছি। আমার নিকট ক্রমেই এই বোধ স্পষ্টতর হইতেছে যে, দেশ অমৃতের সন্ধান পাইয়াছে। যে সত্যাগ্রহ, সত্যের প্রতি একনিষ্ঠা মহাত্মাজী প্রচার করিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষেরই মর্ম্মবাণী। মহাত্মাজীর ব্যক্তিগত পুণ্যপ্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক মনস্বী সেই বাণী গ্রহণ করিয়া দেশের কর্ম্মে নূতন পথে কৃচ্ছ্রসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন, আজ তাঁহাদের কেহ যদি আদর্শচ্যুত হইয়া মুক্তির ও কল্যাণের পথ ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও একথা মানিব যে, সমষ্টিগতভাবে দেশ অগ্রসর হইয়াছে—দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে 'স্যর' উপাধি গ্রহণ করেছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কারো কণামাত্র সহযোগিতাও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অভিপ্রেত নয়, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সেদিন বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা সত্ত্বেও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সেদিন নিঃশব্দ থাকেনি।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৪ সালের ১৬-ডিসেম্বর, লিখেছে:

"গভর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে একজন শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক বলিয়া 'স্যর' উপাধি দিয়াছিলেন, আর দেশসেবাক্ষেত্রে ত্যাগী ও কর্ম্মী প্রফুল্লচন্দ্রকে দেশবাসী চিন্তা-নায়কের আসন দিয়া 'আচার্য্য' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল। দেশের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বড়, না রাজ-সম্মান বড়?—সংশয় দোলায় গত তিন চার বৎসর দুলিয়া দুলিয়া অবশেষে শাসক-শক্তির অপেয় ও অগ্রাহ্য, সর্ব্বনাশী অনুগ্রহ মদ্য পান করাই স্যর প্রফুল্লচন্দ্র শ্রেয় স্থির করিয়াছেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম, অদ্য বেলা ১০টার সময়, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র লাট-ভবনে 'সনদের' ভিক্ষাথী হইয়া লর্ড রেডিংএর সম্মুখে 'নাইট' রূপে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ধন্য হইয়াছেন। এক ক্ষুরধার দুর্গম পথে সতর্ক পদবিক্ষেপে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র যখন লক্ষ্যের প্রায় সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময় আচম্বিতে তাঁহার এই পদস্খলন—দুঃস্বপ্নেও যে আমরা কল্পনা করিতে পারি নাই। জীবনের সুমহৎ আদর্শকে দু'পায়ে দলিয়া প্রবলের অনুগ্রহ ভিক্ষার এই শোচনীয় অভিনয়ে বাঙ্গালীর মাথা হেঁট হইল!

দৌর্ব্বল্যবশেই 'স্যর' উপাধির মায়া প্রফুল্লচন্দ্র কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না; লর্ড রেডিংএর 'সনদ' গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান বা হুকুমনামা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না—ইহা বুঝিয়া দেশ কি ভাবিবে? বাঙ্গলায় দমন-নীতি প্রবর্ত্তনের তীব্র প্রতিবাদ সেদিনও যাঁহার কণ্ঠে অতি উচ্চৈঃস্বরেই ধ্বনিত হইয়াছিল, তাঁহার অন্তরের এই দৌর্ব্বল্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি।

দেশের সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালবাসা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী প্রভুত্বের অনুগ্রহই যাঁহার নিকট অধিকতর লোভনীয়, তিনি যে এবং যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহার এই কার্য্য যে সাংঘাতিক হৃদয়দৌর্ব্বল্য, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই।..."

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পরম লক্ষ্য সেদিন দেশের স্বাধীনতা ও সমষ্টিমুক্তি। নানাবিধ অভাব-অভিযোগ সেসময়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নিত্যসঙ্গী; তবু

'আনন্দবাজার পত্রিকা' সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে সাধ্যানুসারে মনোযোগী হয়েছে, অন্যায় ও অনাচারের প্রশ্রয় দেয়নি, অশ্লীলতার ভাণ্ডার সাজিয়ে ব্যবসা করেনি।

আর্টের নামে বাঁদরামিকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রশ্রয় দেয়নি। এ-বিষয়ে সম্পাদককে লেখা সুধীনচন্দ্র পালের একখানা চিঠি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ১৯২৩ সালের ২৪-জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে: "কলিকাতায় প্রকাশিত কয়েকটি সাময়িক পত্রিকায় রমণীর উলঙ্গ মূর্ত্তির ছবি উপর্য্যুপরি বাহির হইতেছে। আপনার "আনন্দবাজারে" আর্টের নামে এ-সব বাঁদরামি বিশেষভাবে আলোচিতও হইয়াছে। কিন্তু উক্ত আলোচনায় শিল্পকলা হিসাবে বিচার করিয়াই ছবিগুলির বিভৎসভাবের কথা বলা হয়। সে ত এক কথা; কিন্তু ছবিগুলি প্রকাশের আর একটি দিক আছে, সেটি বলা হয় নাই। সেটি হইতেছে, ছবি আঁকার বেশ্যাবৃত্তি। কলিকাতা ভোগ-বিলাসের সহর, লালসায় লক লক জিহ্বা চারিদিকে লোলিহান। সাহিত্য সম্পদে কাগজ বিক্রয় না হয়, লালসার ইন্ধন যোগাইতে পারিলে হয়ত কিছু বেশি কাট্‌তি হয়। হায় বাঙ্গালীর অন্নচিন্তা!"

১৯২৩ সালের ৩-মার্চ ও ৪-মার্চ কাশীতে 'উত্তর ভারত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে'র অধিবেশন হল। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৩ সালের ২২-মার্চ, দুঃখ করে লিখেছে: "জাতীয় জীবনের এত বড় একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল, কিন্তু বাঙ্গালী তাহার কোন খবর রাখিল না। বাঙ্গলাদেশের কোন খবরের কাগজে এই সাহিত্য সম্মিলনের পূর্ব-বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই, কবিগুরুর অভিভাষণও কোন সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। অথচ কিছু দিন পূর্ব্বেই বাঙ্গলাদেশের খবরের কাগজগুলিতে হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনীর সম্বন্ধে লম্বা লম্বা টেলিগ্রাফ ছাপা হইয়াছিল! বাঙ্গালী যে জীবনের সর্ব্ববিভাগে প্রতিষ্ঠাহীন হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?"

'আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯২৩ সালের ১৬-মে, লিখেছে: "মাসিক বসুমতী"—এবার অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। একদিকে কামিনীকাঞ্চনত্যাগী পরমহংসদেবের চিত্র; আর ঠিক তারই পাশাপাশি উলঙ্গ রমণীর 'বাস্তব' সৌন্দর্য্য! শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ না হয় উলঙ্গ রমণীর রসে মসগুল—দিশেহারা; কিন্তু প্রৌঢ় "বসুমতী" লজ্জার মাথা খাইয়া সে রসের বিকৃতি কিরূপে আকণ্ঠ পান করিতেছেন? চিত্রখানির নাম—"পল্লীপ্রাণ"!—পল্লীর প্রাণ কি এত জিনিষ ছাড়িয়া শেষকালে স্নান-নিরতা উলঙ্গ রমণীর অনাবৃত নিতম্ব ও উরুদেশে আশ্রয় লইয়াছে। আমরা জানি, এরূপ একখানি লালসা উদ্দীপক উলঙ্গ রমণীর ছবি বাহির করিতে পারিলে বাঙ্গলার বাজারে হুহু করিয়া কাগজ বিকায়,—কেননা এটা অশ্লীল উপন্যাস, অশ্লীল ছবি ও মদনানন্দ মোদকের যুগ! কিন্তু 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত' 'বসুমতীর'ও কি এ ব্যবসাদারী করিতে একটু চক্ষুলজ্জা হয় না?"

১৯২৩ সালের ৪-জুলাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "বাঙ্গালী কতদূর লম্পট ও কামুক হইয়া উঠিতেছে, তাহার একটা লক্ষণ অশ্লীল "গণিকাতন্ত্র সাহিত্য", তথাকথিত ন্যক্কারজনক "যৌন বিজ্ঞান" ও লালসা উদ্দীপক অশ্লীল ছবির বহুল প্রচার। আর্ট ও বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া যারা এই সব বিষ ছড়াইতেছে, তাদের না আছে আর্টের জ্ঞান—না আছে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে পরিচয়। লোকের লালসার আবর্জ্জনার মধ্যে কৃমিকীটের ন্যায় তাহারা বিচরণ করিতেছে।...বাঙ্গলাদেশে যৌন-বিজ্ঞানের নামে কোন কোন গ্রন্থকার ও প্রকাশক যে বিষ ছড়াইতেছেন, তাহা সত্যই জাতি-ধ্বংসকর! উহাদের বইয়ের বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত ভদ্রলোকের অপাঠ্য!"

কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে যেখানে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য, সেখানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সানন্দে অভ্যর্থনায় মুখর হয়ে উঠেছে, কণামাত্র কার্পণ্য করেনি।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৩ সালের ৩০-জানুয়ারি, লিখেছে: "বোলপুরের বিশ্বভারতী শিক্ষায়তন হইতে রবীন্দ্রনাথ একটা বেশ ভাল কাজ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এ দেশের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতি আমাদের ঔদাসীন্যে কতক বা কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কতক বা বিদেশী মিউজিয়মে স্থান লাভ করিতেছে। অথচ এইগুলিই আমাদের প্রাচীন ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির অমূল্য খনি। রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী'র পক্ষ হইতে এইগুলি সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম।..."

১৯২৩ সালের ২৯-আগস্ট 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "আমরা কাল এম্পায়ার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। "বিশ্বভারতীর" সাহায্যকল্পে অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ উহারই ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকেরা প্রধান প্রধান চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয়ের সাজসজ্জা বিশেষতঃ বর্ণসমাবেশ, উচ্চ শিল্পকলার পরিচায়ক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিনয় চাতুর্য্যের বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। রঘুপতির চরিত্রে লোকাচার ও ধর্ম্ম, অন্ধবিশ্বাস ও মানব হৃদয়ের মধ্যে পদে পদে যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ফুটিয়া উঠিয়াছে,—রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে তাহা মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা গিয়াছিল। এরূপ উচ্চাঙ্গের অভিনয় কলা দর্শনের সৌভাগ্য সকল সময়ে হয় না। রাজার ভূমিকায় কবির পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও রঘুপতির ভূমিকায় দীনেন্দ্রনাথ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের পরেই, রঘুপতির ভূমিকায় দীনেন্দ্রনাথের অভিনয়ের উল্লেখ করিতে হয়। অপর্ণা ও রাণীর অভিনয়ও ভাল হইয়াছিল। শ্রীমতী সাহানা বসু মধুর সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চ লোকে লোকারণ্য; দেখিয়া মনে হইল যে অভিনয়ের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। আমরা বিসর্জ্জন অভিনয় দর্শনে বাস্তবিকই খুব প্রীত হইয়াছি।"

১৯২৩ সালের ১২-সেপ্টেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "(ষ্টার থিয়েটারে) আজ "রাজা ও রাণীর" তৃতীয় অভিনয়। রবীন্দ্রনাথের এই প্রসিদ্ধ নাটকের অভিনয় দর্শন নাট্যামোদী মাত্রেরই কর্তব্য।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৫ সালের ১১-জুলাই, লিখেছে: "গত রবিবারে নাট্যমন্দিরে "সীতা"-র শততম অভিনয় হইয়া গিয়াছে। সেই উপলক্ষে গত রবিবার সেখানে উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। নাট্যমন্দির পুষ্পলতায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং অভ্যাগত ও দর্শকবৃন্দ পুষ্পমাল্য ও সুগন্ধি জলে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন।..."সীতা" অভিনয়ের অসাধারণ সাফল্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও তাঁহার সহকারীবর্গের অতুলনীয় অভিনয় নৈপুণ্য ও কলা জ্ঞানেরই পরিচয় দিতেছে। তিনি এই অভিনয়ে সবদিক দিয়া বাঙলার নাট্যকলার যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।...আমরা শিশিরবাবু ও তাঁহার নাট্য সম্প্রদায়কে "সীতা" অভিনয়ের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন করিতেছি।"

প্রফুল্লকুমার সরকার, ১৯২৫ সালের ১৪-জুলাই, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লিখেছেন: "মনোমোহন 'নাট্যমন্দিরে' "জনা"' অভিনয় দেখিয়া, আমরা অতীব আনন্দিত হইয়াছি। বহুদিন বাঙলা রঙ্গালয়ে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় দেখি নাই। কেবল কতকগুলি ভাল ভাল কথা সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়া গেলেই নাটকাভিনয় হয় না। সাজসজ্জা, দৃশ্যপট, প্রয়োগনৈপুণ্যের উপরেই যে প্রধানতঃ রসসৃষ্টির সাফল্য নির্ভর করে, শিশিরবাবু "জনার" অভিনয়ে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মত প্রতিভাশালী অভিনেতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন কলাবিদের নিকট আমরা এইরূপই আশা করি।..."

বাঙলা হিসেবে: ১৯-ফাল্গুন, ১৩২৯; ইংরেজি হিসেবেঃ ৩-মার্চ ১৯২৩। দোলপূর্ণিমা। সেদিন পত্রিকার কাগজের রঙ লাল। সেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "অদ্য দোলপূর্ণিমা ও আমাদের নববর্ষ উপলক্ষে "আনন্দ বাজার" আট পৃষ্ঠা বাহির হইল। মূল্য পূর্ব্ববৎ দুই পয়সাই রহিল। পাঠকবর্গ দেখিয়া লইবেন।"

দিনকয়েক পরে মহাত্মা গান্ধীর কারাবাসের এক বছর পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

১৯২৩ সালের ১৭-মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "মহাত্মার কারা-সাম্বৎসরিকী উপলক্ষে "আনন্দ বাজারের" বিশেষ সংখ্যা আট পৃষ্ঠা বাহির হইল। মূল্য পূর্ব্ববৎ দুই পয়সাই রহিল।" সেদিনের পত্রিকা থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করি: "আমাদের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি সম্প্রতি মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত শান্তিনিকেতন আশ্রমের "নীচু বাংলায়" গিয়া সাক্ষাৎ করেন ও মহাত্মা গান্ধির এক বৎসর কারাবাসে তাঁহার মানসিক অবস্থার কথা জানিতে চাহেন। অনতিপর এই পরম ঋষি অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আসনে বসিয়া বসিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন, মহাত্মার কথা পাড়িতেই তাঁহার শান্ত চক্ষুদ্বয় প্রথমে একটু দীপ্ত হইয়া উঠিল; তাহার পর এত বড় সাধু পুরুষ এখন কারাগারে এ কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া তাঁহার চোখে মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমার শরীরের এখন যে অবস্থা, তাহাতে বসিয়া কিছু নিজে লিখিয়া দেওয়া শক্ত।" এই বলিয়া তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে এই কয়টি লাইন লিখিয়া লইতে বলিলেন:—

"ইংরেজদের ন্যায় অত বড় একটা দিগ্‌গজ সভ্যজাতি গান্ধিজীর ন্যায় সাধুপ্রকৃতি ও নিরপরাধ অমন একজন লোকপূজ্য মহাত্মার প্রতি ও-রকম অযোগ্য ব্যবহার করিয়াও যে তাহাদের হস্ত অসাড় না হইয়া দিব্য স্বচ্ছন্দে পানভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, Western Civilization নামে মহাপর্বত, কাজে কিছুই না।"

১৯২৩ সালের ২৫-সেপ্টেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে:

"স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় আমাদের জাতীয় চরিত্রের সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করিতে পারে নাই। সেই বিপুল বন্যার শক্তিকে আমরা ধরিয়া রাখিতেও পারি নাই। বরং যাঁহারাই স্বদেশী আন্দোলনের ভিতরকার কথা লইয়া চিন্তা করিবেন, তাঁহারাই বলিবেন যে, আমাদের মনুষ্যত্বহীনতা ও চরিত্র দৌর্ব্বল্যের জন্যই এই মহৎ আন্দোলন স্থায়ী হয় নাই। বাঙ্গালীর নীচ স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বিলাসব্যসন, মিথ্যাচার, কপটতা, ভণ্ডামি ও ভীরুতা,—স্বদেশী আন্দোলন ধ্বংস করিবার প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

"স্বদেশী আন্দোলনের পর বিরাট জাতীয় আন্দোলন—মহাত্মা গান্ধির অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। কিন্তু এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ও প্রধান নেতা মহাত্মা গান্ধি, ব্যাধির বীজ কোথায় তাহা ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাই অহিংস অসহযোগের উদ্দেশ্য কেবল বিদেশী আমলাতন্ত্রের হাত হইতে শাসনযন্ত্রকে কাড়িয়া লওয়া নয়, আত্মশুদ্ধি বা কলুষিত জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধনও ইহার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মহাত্মা গান্ধি অসাধারণ দূরদর্শিতা বলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আমাদের মনুষ্যত্বহীনতা ও চরিত্রদৌর্ব্বল্যই পরাধীনতার প্রকৃত কারণ। জাতীয় চরিত্রের এই ব্যাধি দূর করিতে হইলে কঠোর সাধনা চাই, নতুবা স্বাধীনতা কোন অদ্ভুত উপায়ে করতলগত হইলেও আমরা রাখিতে পারিব না। অতএব বিদেশী আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সংঘর্ষ চালাইলেই হইবে না, সেই সংঘর্ষ যাহারা চালাইতে পারে এমন বীর্য্যবান, চরিত্রবান, মরণভয়রহিত, নিঃস্বার্থ মানুষও চাই! এই মনুষ্যত্ব সৃষ্টি বা চরিত্র গঠনই অসহযোগের অন্তর্ম্মুখীন উদ্দেশ্য।"

কিন্তু আন্দোলনের এই অন্তর্ম্মুখীন উদ্দেশ্য কি সম্পূর্ণ সফল হয়েছে? সেদিন

'আনন্দবাজার পত্রিকা' দুঃখ করে লিখেছে: "বাঙ্গলা দেশে যে অসহযোগ আন্দোলনের এই অন্তর্ম্মুখীন উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা আজ নিতান্ত দুঃখের সঙ্গেই বলিতে হইতেছে। স্বদেশী আন্দোলন যেমন বাঙ্গলার যুবকদের পাষাণ-কঠিন হৃদয়ে স্থায়ী রেখা টানিতে পারে নাই, অসহযোগ আন্দোলনও তেমন বাঙ্গালী যুবকের চরিত্রের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। তাহারা পূর্ব্বের মতই স্বার্থপর, কাপুরুষ, চরিত্রহীন, কপট ও ভণ্ডরূপে আত্মপরিচয় দিতেছে।"

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, বাঙলার স্বার্থপর, কাপুরুষ, চরিত্রহীন, কপট ও ভণ্ড যুবকদের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সেদিন নির্ভয়ে ধিক্কার দিয়েছে।

একদিন জুহুতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বিশেষ প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বিশেষ প্রতিনিধি লিখেছেন: "বোম্বাই হইতে পুণায় গিয়া হাঁসপাতালে মহাত্মার পুণ্যদর্শন লাভ করি। তিনি "আনন্দবাজারের" প্রতিনিধি বলিয়া আমাকে সদয়ভাবে স্নেহভরে বলিলেন, "তুমি 'আনন্দবাজারের' পক্ষ হইতে আসিয়াছ,—তাই তোমাকে ছবি তুলিতে অনুমতি দিলাম।" কিন্তু তখন শিখ নেতারা তাঁর সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, কাজেই ব্যস্তভাবে যে ছবি তুলিয়াছিলাম, তাহা ভাল হয় নাই। তারপর জুহুতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া পুনরায় ছবি তুলিবার অনুমতি পাই। তিনি তখন একখানি গুজরাটী পত্রিকা পড়িতেছিলেন। সেদিন সোমবার ছিল—মহাত্মার মৌনব্রতের দিন। আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত কিছু দিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি আমার প্রদত্ত কাগজ-কলম লইয়া কয়েক মিনিট ভাবিলেন, অবশেষে লিখিয়া দিলেন—"চরকা যজ্ঞ করো"—মো, ক, গান্ধি"। আমি প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। ইতিপূর্ব্বে তিনি আর কোন কাগজের জন্য ছবি দেন নাই।"

১৯২৪ সালের ৬-এপ্রিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় মহাত্মা গান্ধীর উক্ত আলোকচিত্রের (দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত) প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিকৃতির নিচে সম্পাদকীয় নিবেদন: "বোম্বাইএর সমুদ্রতীরে জুহু 'বিশ্রাম কুটীরে' 'আনন্দবাজারের' প্রতিনিধি মহাত্মাজীর দর্শন লাভ করিয়া, তাঁহার আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহাত্মাজী আনন্দের সহিত 'আনন্দবাজারের' জন্য তাঁহার আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি দেওয়ায়, তাঁহার বর্ত্তমান প্রতিকৃতি আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিতে সক্ষম হইলাম।"

বাঙলা সংবাদপত্রের ইতিহাস উপেক্ষিত হলে বাঙলীর জাতীয় জীবনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৩ সালের ১৭ নভেম্বর লিখেছে: বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে বাঙ্গলা-সংবাদপত্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া, বাঙ্গালীর নবযুগের সাহিত্য যেমন তাহার জাতীয় জীবনকে নবভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, বাঙ্গলা সংবাদপত্রও তেমনই আমাদের জাতীয় জাগরণের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে! যাহারা নব্যবাঙ্গালীকে ধরিতে ও বুঝিতে চান, বাঙ্গলা-সংবাদপত্রের বিচিত্র ইতিহাসও তাঁহাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। যাঁহারা স্বজাতির ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ইতিহাস জানেন না, সেই সমস্ত কুসংস্কারগ্রস্ত অজ্ঞ ব্যক্তিই কেবল বাঙ্গলা-সংবাদপত্রের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন।"

এ-বিষয়ে তিলার্ধ সংশয় নেই যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাঙলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি নতুন গৌরবময় অধ্যায় সংযোজিত করেছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র

আদিপর্বের ইতিহাস মসৃণ নয়, বহু বাধাবিঘ্ন দুঃখদুর্দশায় আচ্ছন্ন। আদিপর্বে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আদর্শবাদী সংগ্রামীর ভূমিকা নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে পালন করেছে।

১৯২৩ সালের ২৮-মে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "আমাদের দেশে সংবাদ-পত্রগুলিকে যে কত সাবধানতার সহিত সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। আইনের দৌরাত্ম্যে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। তাহার মস্তকের উপর নানা প্রকার আইন, প্রতিনিয়ত ডিমাক্লিসের তরবারির ন্যায় ঝুলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বাঁধাধরার পথ হইতে ভ্রমক্রমে একটু বিচলিত হইলেই আর রক্ষা নাই। নির্ভীক সমালোচক সংবাদপত্রমাত্রেই সরকারী কর্ম্মচারীদের তীক্ষ্নদৃষ্টির বিষয়ীভূত। সুবিধা ও সুযোগ হইলেই সংবাদপত্রকে দলন করিবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীরা ছলে-বলে-কৌশলে কি নির্লজ্জ চেষ্টা করেন, মানহানি মূলক ক্ষতিপূরণের মামলার ফলাফলগুলি দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। এমন দিন খুব কমই যায় যেদিন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগের সংবাদ না থাকে। আমাদের দেশে যদি কোন প্রকাশ্য স্থানে শত শত ব্যক্তির চক্ষুর সম্মুখে পুলিশ কাহারও উপর অন্যায় অত্যাচার করে, তবে সেই সংবাদ যে পর্য্যন্ত 'এসোসিয়েটেড প্রেস' অথবা সরকারী ইস্তাহারে স্বীকার করা না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত কোন সংবাদপত্রেই তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। সংবাদদাতা যত বিশ্বাসীই হউক না কেন, এমন কি সংবাদপত্রের নিজস্ব প্রতিনিধি বা স্বয়ং সম্পাদক পর্য্যন্ত স্বচক্ষে দর্শন করিলেও উহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার উপায় নাই। যাহার হস্তে আইন প্রয়োগ করিবার ও দণ্ড দিবার অধিকার আছে —তাহার অনভিপ্রেত সংবাদ প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রকে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা সহ্য করিয়া দেশীয় দরিদ্র সংবাদপত্রগুলির পক্ষে নির্ভীকভাবে নিরপেক্ষ সংবাদ প্রকাশ করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

কেবলমাত্র ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নয়, কংগ্রেস থেকেও একদা সংবাদপত্রের উপর কঠোর-নীতি প্রয়োগের বন্দোবস্ত হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কংগ্রেসের সেই প্রয়াস কণামাত্র সমর্থন করেনি।

১৯২৩ সালের ২১-সেপ্টেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে:
"দেশীয় খবরের কাগজগুলির উপর যে কঠোরনীতি প্রয়োগের বন্দোবস্ত কংগ্রেস হইতে হইয়াছে, তাহা ঠিক হয় নাই। ইহাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা হইবে। একেই, বিদেশী আমলা তন্ত্রের আইনের খড়্গ, সব সময়ে দেশী খবরের কাগজের মাথার উপরে দুলিতেছে, তার উপরে কংগ্রেসও যদি তাহাদের জন্য নাগপাশের ব্যবস্থা করেন, তবে তাহারা যাইবে কোথায়? যাহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়িয়া উঠে, এমন সব মিথ্যা, অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচার বা প্রবন্ধ প্রকাশ, অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা নিবারণের উপায় কি খাঁটী, ব্যুরোক্রেটীক ধরণে সংবাদপত্রকে বয়কট করা বা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া? তার চেয়ে আর কোন ভাল উপায় কি নেতাদের বুদ্ধিতে আসিল না?

আমাদের বিশ্বাস যে, হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি সত্যই সংবাদপত্রের বিদ্বেষমূলক লেখাকে প্রশ্রয় না দেন, তবেই সংবাদপত্র সাবধান ও সংযত হইবে। অন্য প্রদেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু বাঙ্গলাদেশে কয়েকখানি সংবাদপত্র প্রশ্রয় পাইয়া, ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবিষ উদ্গীরণ করিতেছে, ইহা আমরা জানি; কিন্তু তবুও জোর করিয়া তাহাদের মুখবন্ধ করিবার আমরা পক্ষপাতি নহি। তাহারা যদি বুঝিতে পারে যে, সমাজ তাহাদের বিদ্বেষ-প্রচার সমর্থন করে না, তবে তাহারা নিজ হইতেই সংযত হইবে।"

সমালোচনা করেছে, এই অপরাধে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কোনো-কোনো দেশীয় রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়েছে।

১৯২৩ সালের ২৩-সেপ্টেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "হায়দ্রাবাদ রাজ্য হইতে "হিন্দু" পত্রিকা কেন নির্ব্বাসিত হইয়াছে, এতদিন পরে তাহার কারণ জানা গিয়াছে। "হিন্দুর" সম্পাদক বলিয়াছেন যে, সন্ত নিহাল সিং হায়দ্রাবাদ রাজ্য সম্বন্ধে 'হিন্দুতে' কয়েকটী প্রবন্ধ লেখেন। উহাতে রাজ্যের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে ২। ১টী বিরুদ্ধ সমালোচনা ছিল। ইহারই ফলে নিজাম স্বীয় রাজ্য হইতে 'হিন্দুকে' নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।...আমাদের এই ক্ষুদ্র "আনন্দবাজার পত্রিকাও" উড়িষ্যার কোন কোন দেশীয় রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত। দেশীয় রাজ্যগুলি কথায় কথায় এত মারমুখী কেন? তাঁহারা কি সমালোচনার আলোক সহ্য করিতে পারেন না?"

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পরম লক্ষ্য স্বদেশের স্বাধীনতা, চরম কামনা স্বদেশের স্বাধীনতালাভের চেষ্টায় সকলে মনেপ্রাণে আত্মনিয়োগ করুন। এ-বিষয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র চরিত্র ষোলোআনা আপোষহীন। স্বদেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ও বিনীত প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৪ সালের ২৫-অক্টোবর, লিখেছে: "আমাদের রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন পূর্ব্বে প্যারিসে গিয়াছিলেন, তথা হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি আমেরিকার একটা ষ্টেটে যাইতেছেন, তাহাদের স্বাধীনতার শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দিবার জন্য। কবির এ গৌরবে আমরা আনন্দিত। কিন্তু বিশ্বপ্রেমিক কবি স্বদেশের স্বাধীনতালাভের চেষ্টায় মনপ্রাণ দিয়া যোগ দিতেছেন না কেন?"

দেশের মুক্তিসাধনায় রবীন্দ্রনাথের দান অসামান্য, একথা কি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেনি? করেছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৯ সালের ২০ আগস্ট, লিখেছে: "রবীন্দ্রনাথ ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশে বিশ্বকবি ও মনীষীরূপেই পরিচিত। কিন্তু বাঙলার তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনে, দেশের মুক্তি সাধনায় তাঁহার দান যে অসামান্য, একথা বাঙলা দেশে কে না জানে? যেদিন "আবেদন ও নিবেদনের মালা" বহন করাই রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখ্য উপায় ছিল, সেইদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অমর লেখনীর দ্বারা আত্মশক্তির মহিমা জাতির চিত্তে উদ্বোধন করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তাঁহার রচিত কবিতা, সঙ্গীত এবং প্রবন্ধ দেশের যুবকবৃন্দের মধ্যে যে নূতন শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার গৌরব কোনদিন ম্লান হইবে না। এই বার্ধক্যেও রবীন্দ্রনাথের চিরনবীন মন জাতিকে যে চিন্তা ও ভাবের ঐশ্বর্য দান করিতেছে, তাহার তুলনা নাই।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রচারেও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। প্রমথনাথ বিশী, ১৯৭০ সালের ১৪ এপ্রিল, বলেছেন: "আনন্দবাজার পত্রিকার চরিত্রের মধ্যে গত শতকের সমন্বয় প্রচেষ্টার বীজ আছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের হাতিয়াররূপে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম, শিক্ষা ও সাহিত্যকে অবহেলা করেনি আনন্দবাজার পত্রিকা। আর সাহিত্য, বিশেষতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রচারে আনন্দবাজার পত্রিকার দান অবিস্মরণীয়।"

আগেই বলা হয়েছে, প্রফুল্লকুমার সরকার ১৯০৬ সালে নির্ঝরিণীকে বিবাহ করেছেন। নির্ঝরিণী আবাল্য স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উজ্জীবিত, স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। নির্ঝরিণী রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিস্তর চিঠি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ, ১৯১০ সালের

২৫ এপ্রিল, নির্ঝরিণীকে একখানা চিঠিতে লিখেছেন: "মা, তোমার যখন ইচ্ছা হয় আমাকে চিঠি লিখিয়ো। এক এক সময় আমি ব্যস্ত থাকি, তা ছাড়া আজকাল ক্লান্তি ও আলস্যে সব সময় পত্রাদি লিখিতে পারি না—যদি কখনো উত্তর না পাও বা বিলম্ব ঘটে কিছু মনে করিয়ো না। তুমি নিশ্চয় জানিয়ো তোমার মঙ্গল হয় এই আমার অন্তরের কামনা। সংসারের কল্যাণরূপিণী হইয়া থাক—তোমার চরিত্রের দীপ্তিতে চতুর্দ্দিককে জ্যোতির্ম্ময় এবং হৃদয়ের মাধুর্য্যে সকলকে আনন্দিত করিয়া গৃহের মধ্যে পুণ্যপ্রতিমা হইয়া বিরাজ কর এই আমি মনের সঙ্গে প্রার্থনা করি।"[২]

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ চিঠিপত্র, সপ্তম খণ্ড (কলকাতা, ১৮৮২ শকাব্দ), পৃ. ১৫১-৫২।

ইতিহাসে আনন্দবাজার

১৯২৩ সালের ৩১-মে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'বিশেষ বিজ্ঞাপন' দেখা গেল: "আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের অনুরোধে আগামী কল্য ১লা জুন শুক্রবার হইতে "আনন্দবাজার" প্রাতে বাহির হইবে।"

আর সান্ধ্য দৈনিক নয়, ১৯২৩ সালের ১লা জুন থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রভাতী দৈনিক। উত্তরকালে বিরজাকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন: "আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রমোন্নতির প্রথম ধাপ, সান্ধ্য সংস্করণ পরিত্যাগ করিয়া প্রভাতী সংস্করণ প্রকাশ। তখন ১৯২৩ সালের জুন মাস। আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের অর্থসংগতি অপ্রচুর। তবু টাটকা সংবাদ পরিবেশনের উদ্দেশ্যে "রয়টার" ও "এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার" সংবাদ লইবার ব্যবস্থা হইল। "ফ্রী প্রেস অব ইণ্ডিয়ার" সংবাদ লইবার বন্দোবস্ত পূর্ব হইতেই ছিল।"[১]

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৩ সালের ৩-জুন, বিজ্ঞাপিত করেছে: "এখন হইতে প্রতি রবিবার "আনন্দবাজার পত্রিকা" বাহির হইবে এবং সোমবার দিন বন্ধ থাকিবে।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৩ সালের ৩০-জুলাই, বিজ্ঞাপিত করেছে: "আগামী ৩১শে জুলাই মঙ্গলবার (মফঃস্বল বুধবার) লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের স্মৃতি-তর্পণের জন্য "আনন্দবাজার পত্রিকার" একটি বিশেষ সংখ্যা বাহির হইবে। ঐ সংখ্যা আয়তনে দ্বিগুণ হইবে; উহাতে বহু চিত্র থাকিবে এবং দেশবিখ্যাত নেতাগণের লিখিত প্রবন্ধাদিও উহার শোভাবর্ধন করিবে।"

১৯২৩ সালের ৩১-জুলাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "লোকমান্য তিলক সংখ্যা' আট পৃষ্ঠা প্রকাশিত হইল। মূল্য পূর্ব্ববৎ দুই পয়সাই রহিল।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'লোকমান্য তিলক সংখ্যা'র জন্য বিশেষভাবে লিখিত কয়েকটি রচনার লেখকের নামোল্লেখ করি: মোয়াজ্জেম আলী; বিপিনচন্দ্র পাল; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; হরদয়াল নাগ; শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী; অরবিন্দ ঘোষ; ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন; হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ জুন ১৯৫৫।

১৯২৩ সালের ৯-সেপ্টেম্বরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'বাঙ্গালী বীর যতীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রথম সম্পাদকীয় রচনা প্রকাশিত হয়েছে:

"১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার বালেশ্বরের অরণ্যে পাঁচজন বাঙ্গালী যুবক আত্মসমর্পণ না করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল,—এই যুদ্ধে পুলিশ পক্ষের হতাহতের সংখ্যা রাউলাট কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ না করা হইলেও, সংখ্যা বড় কম ছিল না। সে যাহাই হউক, প্রায় ৫০ জন অশ্বারোহী রাইফেলধারী সুশিক্ষিত পুলিশ-সৈন্যের সহিত ৫ জন বাঙ্গালী যুবকের অসমসাহসিক যুদ্ধ ও বীরের মত নির্ভীক দৃঢ়তায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন,—সেদিনের বাঙ্গালী সভয়ে, বিস্ময়ে এই কথা শুনিয়াছিল। কে এ বালকবীর চিত্তপ্রিয়, কে এ বিপ্লববীর যতীন্দ্রনাথ? এই মেঘবৎ ভীরু, সর্ব্বদা প্রাণভয়ে কাতর, বাঙ্গালীর মধ্যে ইহারা কোন দুর্দ্দমনীয় শক্তির প্রচণ্ড স্ফুরণ? ইহারা নর-হন্তৃ পরস্বাপহারী দস্যু, না ভগবদ্ভক্ত কর্ম্মযোগী, স্বদেশসেবক? এ প্রশ্ন সেদিন কেহ করিতে সাহস পায় নাই। কিন্তু অতীতের সেই বিপ্লব আন্দোলন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক প্রতিশোধ কল্পনা, সেই জীবন-মরণ তুচ্ছকারী দুঃসাহস, বাঙ্গলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক শোণিতসিক্ত অধ্যায়। এ অধ্যায় কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না!

বাঙ্গালী যুবক প্রাণ তুচ্ছ করিয়া, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য, প্রতাপশালী ব্রিটিশ-সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছিল, অসাধ্য সাধনের ব্রত লইয়া মরণের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। আইনের চক্ষে তাহারা অপরাধী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কিন্তু এই চেষ্টার মধ্যে বাঙ্গালী চরিত্রের বহুদিনের লুপ্ত শক্তির একটা গর্ব্বদৃপ্ত বিকাশ স্বদেশী ও বিদেশীয়, উভয়কেই যুগপৎ এমন বিস্মিত করিয়াছিল, যাহাতে বাঙ্গালীজাতির মনে একটা আনন্দ ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস অতি সহজেই জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং রাজপুরুষগণও এই কৃশজীর্ণতনু বাঙ্গালীকে শতবর্ষ ধরিয়া যে পরিমাণ অবজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছিলেন, এই ঘটনায় চিরদিনের মত তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। মুখে যে যাহাই বলুক, অন্তরে সকলেই এই বিপ্লববাদী বীরগণকে শ্রদ্ধা করিয়াছে। মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী যুবকের আগুন লইয়া খেলিবার দুঃসাহস দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টও বিচলিত ও চঞ্চল হইয়াছিলেন,—প্রথমে ভারতরক্ষা আইন, পরে রাউলাট আইনই তাহার প্রমাণ। বঙ্গভঙ্গরোধ, দুই দফা শাসনসংস্কার,—ইহাও যে বলিতে গেলে, এই বহুধা-নিন্দিত বালকদলই বুকের রক্ত দিয়া অর্জ্জন করিয়াছে—একথা বলিলে ভিক্ষাপন্থী, তথাকথিত নিয়মতন্ত্রবাদী ভূতপূর্ব্ব নেতারা নিশ্চয়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী যুবকই ভাঙ্গিয়াছে, গড়িয়াছে।

যে ধাতুতে শেরসাহ, প্রতাপসিংহ, প্রতাপাদিত্য, শিবাজীর সৃষ্টি হইয়াছিল,—সেই ধাতুতেই বিদ্রোহীদলের নায়ক যতীন্দ্রনাথ গড়া। সন্যাসী রামদাসের শিষ্য শিবাজী সপ্তদশ শতাব্দীতে এক সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইসলাম-ফকিরের শিষ্য জায়গীরদার-পুত্র শেরসাহ ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের সম্রাট হইয়াছিলেন।—সে যুগে জন্মিলে সন্ন্যাসী ভোলাগিরির শিষ্য যতীন্দ্রনাথ ঐরূপ একজন জগদ্বিখ্যাত বীরই হইতেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংরাজ-শাসিত নিরস্ত্র ভারতবর্ষে, সে অভিনয় সম্ভব নয়। বিশেষতঃ এই মরণভীরু বাগালীর দেশে তাহা একান্তই অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে গিয়া যতীন্দ্রনাথ প্রাণ দিয়াছেন।...

কৈশোরে চরিত্রবান, নির্ভীক, সংযত, তাপস, যৌবনে সত্যের সাধক স্বদেশপ্রেমিক, কর্ম্মবীর এবং ঐ কালের পূর্ণতায় রণোন্মুখ বিদ্রোহীদলের অধিনায়ক, রুদ্রতুল্য তেজস্বী যতীন্দ্রনাথের অতুলনীয় চরিত্রের কথঞ্চিৎ পরিচয়—আজ তাঁহার জাতির সম্মুখে উপস্থিত

করিয়া আমরা এই স্বর্গগত বীরের স্মৃতি দেশের তরুণপ্রাণে জাগ্রত করিতে চাহিতেছি; —বিদ্রোহ জাগাইবার জন্য নহে, রণহিংসামূলক বীরখ্যাতি প্রচারের জন্য নহে,—বিলাসে, বিভ্রমে, বাঙলার যুবকশক্তির নৈতিক চরিত্রের মেরুদণ্ড যে ক্রমেই বক্রভাব প্রাপ্ত হইতেছে, সেই শোচনীয় অধঃপতনের গতি কথঞ্চিৎ রোধ করিবার জন্য। দেশের সেবায় এমনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, মরণজয়ী, আত্মত্যাগী, সর্ব্বোপরি ভগবদ্ভক্ত সাধক চাই। স্বদেশীয় বীরের স্মৃতি, বীরপূজা যে জাতি ভুলিয়া যায়, সে জাতির অপঘাত মৃত্যু স্বয়ং বিধাতাও রোধ করিতে পারেন না!

বাঙলার যুবকশক্তি যতীন্দ্রনাথপ্রমুখ সাধকের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বদেশী যুগে ভৈরবী-লীলায় মাতিয়াছিল, মরণকে উপহাস করিয়াছিল;—আর আজ সত্যাগ্রহ যুগে বিনম্র দৃঢ়তা সংযত, শুভ্র জীবন লইয়া, বাঙালী যুবক কি আর একবার আত্মশক্তির পরিচয়ে বিশ্বকে বিস্মিত করিবে না? যে বিলাস ব্যসন সমাজের অস্থিমজ্জা চর্ব্বন করিতেছে, সভ্যতার আবরণে সেই ইন্দ্রিয় লালসার প্রতিবাদ কি এ যুগের বাঙালী যুবক করিবে না? জন্মভূমির বন্ধনশৃঙ্খল তখনো যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে— যতীন্দ্রনাথের মুক্ত আত্মার বিজয় মহিমা বাঙালীযুবককে সেই কথাই অবিরত শুনাইতেছে।"

এতৎসহ সেদিনের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছে যতীন্দ্রনাথের বিস্তৃত জীবনী।

পুলিশের বিষদৃষ্টি পড়ল। ১৯২৩ সালের ২৯-সেপ্টেম্বর পত্রিকার আপিসে পুলিশ এসে খানাতল্লাসী করল এবং সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে গ্রেপ্তার করে লালবাজারে নিয়ে গেল।

১৯২৩ সালের ৩০-সেপ্টেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে:

"রাজদ্রোহের অভিযোগে
"আনন্দবাজার" সম্পাদক ও মুদ্রাকর গ্রেপ্তার
কার্য্যালয়ে খানাতল্লাস

গতকল্য বেলা ৪টার সময় কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের দুইজন কর্ম্মচারী আমাদের কার্য্যালয়ে খানাতল্লাসীর ও সম্পাদক এবং প্রকাশক ও মুদ্রাকরকে গ্রেপ্তার করিবার পরোয়ানাসহ উপস্থিত হন। গত ৯ই সেপ্টেম্বর রবিবারের 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' বিপ্লববাদী 'যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চরিত-কথা' প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার জন্যই ১২৪ (ক) ধারা বা রাজদ্রোহের অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। পুলিশ কর্ম্মচারীদ্বয় ঐ 'চরিতকথা'র পাণ্ডুলিপি 'প্রুফসিট' এবং হিসাবের খাতা এবং ঐ তারিখের কয়েকখানি 'আনন্দবাজার' লইয়া গিয়াছেন; তৎসঙ্গে সহকারী-সম্পাদকগণের নাম-ঠিকানাও লইয়া গিয়াছেন।

গ্রেপ্তার

খানাতল্লাসীর পর বেলা ৬টার সময় সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র দাস মহাশয়কে ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদিগকে একখানি মোটরে করিয়া উক্ত পুলিশ কর্ম্মচারীদ্বয় লালবাজার থানায় লইয়া গিয়াছেন।"

১৯২৩ সালের ২-অক্টোবর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে:

"সোমবার দিন চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রক্সবরোর আদালতে, 'আনন্দবাজারের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার ও মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র দাসের পক্ষ হইতে উকীল শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় জামীনের জন্য আবেদন করেন। উকীল বাবুর সহিত কিছুক্ষণ আলোচনার পর আদালত জামীন দিতে অস্বীকৃত


EVALUATION U
Govt. of W
CALCUTTA

হন এবং বলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহারা হাইকোর্টে আপীল করিতে পারেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লবাবু ও অধরবাবুকে প্রেসিডেন্সী জেলে লইয়া যাওয়া হয়। আগামী ৪ঠা অক্টোবর মোকদ্দমার দিন ধার্য্য হইয়াছে।"

১৯২৩ সালের ৫-অক্টোবর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে জানা যাচ্ছে: "পরলোকগত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(ক) ধারার অভিযোগ আসামীদ্বয়ের (প্রফুল্লকুমার সরকার ও অধরচন্দ্র দাস) বিরুদ্ধে আনয়ন করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত প্রবন্ধে নাকি রাজদ্রোহসূচক উক্তি আছে।"

সরকারী পক্ষের উকিল রায়বাহাদুর তারকনাথ সাধু। প্রফুল্লকুমার সরকারের পক্ষে জে. এম. ঘোষ এবং সরোজেন্দুমোহন ঘোষ; অধরচন্দ্র দাসের পক্ষে এন. এন. বসু এবং শৈলেন্দ্রনাথ বসু। ১৯২৩ সালের ৪-অক্টোবর আসামীদ্বয়কে যথাসময়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল।

পরদিন আরেক দফা শুনানী হল। "ডিটেকটিভ বিভাগের গিরিজাশঙ্কর রায় এবং অন্য কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর বিচারক, সম্পাদক শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার এবং মুদ্রাকর বাবু অধরচন্দ্র দাসের নামে ১২৪(ক) ধারা মতে অভিযোগ আনয়ন করেন। উভয় আসামীই অভিযোগ অস্বীকার করেন।" অতঃপর এই মোকদ্দমা সেদিনের মতো স্থগিত রইল।

১৯২৩ সালের ৬-অক্টোবর ম্যাজিস্ট্রেট সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার কিছু বলবার আছে?

প্রফুল্লকুমার বললেন—আমি অপরাধী নই। এই প্রবন্ধ প্রকাশ করে আমি রাজদ্রোহ প্রচার করিনি। আমার তেমন কোনো সঙ্কল্প ছিল না।

ম্যাজিস্ট্রেট অধরচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কিছু বলতে চান?

অধরচন্দ্র বললেন—না।

এই রাজদ্রোহের মামলার উভয় পক্ষের শুনানী শেষ হল ১৯২৩ সালের ৮-অক্টোবর। গভর্ণমেণ্ট পক্ষের উকিল রায়বাহাদুর তারকনাথ সাধু সওয়াল জবাবে বললেন—গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণার উদ্রেক করানোর জন্য প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে।

১৯২৩ সালের ১০-অক্টোবর চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট রক্সফোর্ড মোকদ্দমার রায় দিলেন। বিচারে প্রফুল্লকুমার ও অধরচন্দ্র বেকসুর খালাস পেলেন।

১৯২৩ সালের ৭-অক্টোবর সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক হলেন। প্রথম পৃষ্ঠায় বড়ো অক্ষরে লেখা হল: সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। এবং শেষ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তি—৭১।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৩ সালের ৭-অক্টোবর, লিখেছে: "আনন্দবাজারের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়কে ১২৪(ক) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করায় তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় অদ্য হইতে 'আনন্দবাজারের' সম্পাদক মুদ্রাকর প্রকাশক হইলেন।"

উত্তরকালে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেছেন: "আনন্দবাজার পত্রিকা পদে পদে যে-সময় অর্থাভাব, অনটন ও বহু প্রকার পীড়নের ভেতর দিয়ে চলেছে সেইসময় প্রফুল্লবাবু যে কী অক্লান্ত ধৈর্য সহকারে দিনের পর দিন ওর সেবা করেছেন তা অবর্ণনীয়। আনন্দবাজারের পিছনে তাঁর মতো মানুষ না থাকলে আমি সেদিন সম্পাদকের দায়িত্ব

গ্রহণ করতে পারতাম না।"

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের জন্ম ১৮৯২ সালে। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার ঘারিন্দা গ্রামে। বাবার নাম মহিমচন্দ্র মজুমদার; তিনি কোচবিহার রাজ-সরকারের অধীনে জলপাইগুড়ি জেলায় বোদা চাকলার কাজ করতেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দুরন্ত প্রকৃতির বালক। লেখাপড়ায় তাঁর উৎসাহ ছিল না, কিন্তু মানুষের সেবায় তাঁর উৎসাহের সীমা নেই। মানুষের রোগ-শোক দুঃখ-দুর্দশায় সত্যেন্দ্রনাথ সবসময় তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। নিজেকে তাঁদের সঙ্গে একাঙ্গ করে দেখেছেন।

কিছুকাল পরের কথা। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তখন কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁর সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ। "সত্যেন্দ্রনাথকে তিনি পড়াশুনায় প্রোৎসাহিত করেন এবং রাজা রামমোহনের জীবনী পড়িতে দেন। তাহা ছাড়া, রামমোহনের বিভিন্ন দিক, নিজের দার্শনিক চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক সত্যেন্দ্রনাথকে শোনান। সত্যেন্দ্রনাথের চিত্তলোকে এই ঘটনা বিশেষ সাড়া জাগায় এবং তিনি পড়াশুনা আরম্ভ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই তাঁহার পাঠ্য জীবন আরম্ভ হয়।" সত্যেন্দ্রনাথের ভগ্নিপতির নাম সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক। এইসময়ে তিনি সুরেন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছেন এবং তারই ফলে তিনি কাব্য, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়নের বিশেষ সুযোগ লাভ করেছেন। এখানেই তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং স্বামীজীর বইগুলি পড়েছেন। "তরুণ সত্যেন্দ্রনাথকে স্বামীজীর পত্রাবলী হাতে করিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে দেখা গিয়াছে; সংস্কারাবদ্ধ পাড়াগাঁয়ের বর্ণকৌলীন্য ও মিথ্যা আচার যেখানে নির্বান্ধব অস্পৃশ্য ব্যক্তির শব সৎকারে বাধা প্রদান করিতেছে, তথায় দেখা যাইত 'দাসের' দল লইয়া সত্যেন্দ্রনাথ তার যথাবিধি সৎকার করিয়া ফিরিতেছেন; কখনো বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা তুলিতেছেন, আবার কখনো বা নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের, শাসিতের প্রতি শাসকের অত্যাচারের দুর্বিনয়ের প্রতি রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন।"

সত্যেন্দ্রনাথের দাদার নাম শৌর্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। অতঃপর তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে কলকাতায় নিয়ে এসেছেন। দাদার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে বেলুড় মঠে গিয়েছেন। শেষপর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষিত হয়েছেন। "কিছুদিন পর প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে যখন ভারতের রাষ্ট্রীয় গগনে মহাত্মাজীর উদাত্ত আহবানে সাড়া দেয়, তখন বাঙ্গলাও পশ্চাতে পড়িয়া থাকে নাই। তদানীন্তন নেতৃবৃন্দ ও কর্মিদল লইয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বাধীনতা সংগ্রামে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিলেন। দেশবন্ধুর অন্যতম অনুরাগী সত্যেন্দ্রনাথ দেশবন্ধুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময় দেশবন্ধু দাশের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'নারায়ণ' পত্রিকার তিনি কিছুকাল সহ-সম্পাদকের কর্মভারও গ্রহণ করেন।"

অতঃপর দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে এবং সত্যেন্দ্রনাথ এই পত্রিকায় যোগদান করেছেন।

*

পুজোসংখ্যা বেরল ১৯২৩ সালের ১৪-অক্টোবর, সাধারণ দৈনিক সংখ্যারই ঈষৎ বর্ধিত সংস্করণ, প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা লালকালিতে ছাপানো। কিছু গল্প, কবিতাও আছে। সেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে: "অদ্য ১৪ই অক্টোবর রবিবার হইতে আগামী ২০শে তারিখ রবিবার পর্যন্ত 'আনন্দবাজার' কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। সোমবারে কার্য্যালয় পুনরায় খুলিবে এবং মঙ্গলবার হইতে যথারীতি কাগজ বাহির হইবে

১৯২৩ সালের ১০-নভেম্বরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপিত হল:

"সুসংবাদ !!   অর্দ্ধসাপ্তাহিক !   অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক !   সুসংবাদ !!

আনন্দবাজার পত্রিকা

অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংস্করণ

আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে বাহির হইবে।

সহর ও মফঃস্বলের অনেকেই অনুগ্রহ করিয়া "আনন্দবাজার পত্রিকা"র সাপ্তাহিক ও অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য পত্র লিখিতেছেন। তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমরা বর্ত্তমান "আনন্দবাজার পত্রিকা"র অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংস্করণ বাহির করিতে মনস্থ করিয়াছি।

ইহা প্রতি সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হইবে।

অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজারের বিশেষত্ব—

ইহাতে দৈনিক "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় প্রকাশিত সমস্ত সংবাদ থাকিবে, দৈনিক "আনন্দবাজার পত্রিকা"র অধিকাংশ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, প্যারা, "ঘর্ৎকিঞ্চিৎ", "রঙবেরঙ" প্রভৃতি ইহাতে দেওয়া হইবে। তদ্ব্যতীত অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংস্করণের জন্য বিশেষ প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হইবে। দৈনিক আনন্দবাজারের প্রকাশিত বহু ছবি, ব্যঙ্গচিত্র ইহাতে থাকিবে; নূতন চিত্রাদিও দেওয়া হইবে। যাঁহারা মফঃস্বলে ডাকের অসুবিধা বশতঃ প্রত্যহ "আনন্দবাজার" পাঠের সুযোগ পান না বা অন্য কারণে দৈনিক পত্র পাঠের যাঁহাদের অবসর নাই, তাঁহারা সপ্তাহে দুইবার "আনন্দবাজারে"র অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংস্করণ পাঠে সমগ্র জগতের খবর ঘরে বসিয়া পাইবেন।

ইহার আকার সাধারণতঃ দৈনিক "আনন্দবাজারে"র দ্বিগুণ অর্থাৎ আটপৃষ্ঠা হইবে; প্রয়োজন হইলে কলেবর আরও বর্দ্ধিত হইবে। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ মাত্র ছয় টাকা, ছয় মাসের জন্য তিন টাকা। ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে গ্রাহক হইলে প্রথম এক বৎসরের পত্রিকা পাঁচ টাকায় পাইবেন। ষাণ্মাসিক গ্রাহকেরা এ সুবিধা পাইবেন না। গ্রাহকগণ এখন হইতে মূল্য দিয়া নাম রেজেষ্ট্রী করুন।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

দৈনিক "আনন্দবাজার পত্রিকা'র ন্যায় অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক "আনন্দবাজার পত্রিকা"রও প্রচার খুব বেশী হইবে; বিশেষতঃ মফঃস্বলে ইহার গ্রাহক সংখ্যা খুবই বাড়িবে। অতএব অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংস্করণে বিজ্ঞাপন দিলে ব্যবসায়িগণ যথেষ্ট লাভবান হইবেন। যাঁহারা অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংস্করণে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখন হইতেই "আনন্দবাজার পত্রিকার" ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিয়া বা দেখা করিয়া বিজ্ঞাপনের চুক্তি করুন। বিজ্ঞাপনের দর অন্যান্য সাপ্তাহিক বা অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক কাগজের তুলনায় সুলভই হইবে। যাঁহারা প্রথম হইতে চুক্তি করিবেন, তাঁহাদের সুবিধার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে।

ম্যানেজার—আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ, ৭১।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।"

দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর।

ইতিহাসে আনন্দবাজার

সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পর্ক নিয়ে একখানা স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হতে পারে। হেমন্তকুমার বসু, ১৯৬৮ সালের ১৩ এপ্রিল বলেছেন: "ভারতের কোনো সংবাদপত্র যখন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারেননি, তখন এই পত্রিকা দুটি (আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড) নির্ভীকভাবে নেতাজীকে সমর্থন করেছিলেন।"

কিন্তু 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোড়ার দিকে সুভাষচন্দ্রকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেনি।

সুভাষচন্দ্র, ১৯২৪ সালের ২৪ এপ্রিল, কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৪ সালের ২৫ এপ্রিল, লিখেছে: "গতকল্য কলিকাতা কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত অধিকাংশ সদস্যদের দ্বারা শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা (Chief Executive Officer) নিযুক্ত হইয়াছেন। পাঠকবর্গের নিকট সুভাষচন্দ্রের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। আমরা আশা করি, তিনি বয়সে নবীন হইলেও প্রবীণের কার্যদক্ষতার পরিচয় দিয়া সহরবাসীর অভাব-অভিযোগ দূর করিতে যত্নবান হইবেন।"

সুভাষচন্দ্র, ১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর, গ্রেপ্তার হয়েছেন।

১৯২৭ সালের ১৬ মে দুপুরবেলা গভর্নমেণ্ট সুভাষচন্দ্র বসুকে বিনাসর্তে মুক্তি দিয়েছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৭ সালের ১৭ মে লিখেছে: "আজ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরলোকে—বাঙলাদেশ মনুষ্যহীন! রাষ্ট্রক্ষেত্রে আজ বাঙলা সাম্প্রদায়িক কলহে জর্জরিত হওয়ায় মশকে মূষিকে বিভীষিকা দেখাইতেছে। ভণ্ডের দৌরাত্ম্য এবং ক্ষুদ্রের দম্ভ—জাতীয় মুক্তিযজ্ঞ কলুষিত করিতেছে। এই দুর্দিনে সুভাষচন্দ্রের আগমনের মধ্যে বিধাতার যে কল্যাণেচ্ছার উন্মেষমাত্র দেখা যাইতেছে, তাহার পূর্বাবস্থা কল্পনা করিয়া দেশসেবকগণ আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত হউন।"

৪৩তম ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নির্বাচিত সভাপতি মতিলাল নেহরু, ১৯২৮ সালের ২১ ডিসেম্বর, স্পেশ্যাল ট্রেনে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলেন। তাঁকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করা হল। মিছিলের জন্য সামরিক কেতায় স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত হয়ে আছে ষ্ট্র্যাণ্ড ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে। "দুই

হাজার সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক, ৫ শত মহিলা স্বেচ্ছাসেবক, অশ্বারোহীদল, পদাতিকদল লইয়া এই মিছিল গঠিত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সামরিক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া—প্রেসিডেণ্টের গাড়ীখানা ঐস্থানে পৌঁছিবামাত্র তাঁহাকে সামরিক কেতায় অভিবাদন করেন। অতঃপর মিছিল চলিতে আরম্ভ করে। প্রথমে খাকী পোষাক পরিহিত মোটর সাইকেলারোহী স্বেচ্ছাসেবক দল যায়, তাহাদের পিছনে ছিল সাইকেলারোহী স্বেচ্ছাসেবকগণ; তৎপরে পতাকাবাহী পথ প্রদর্শক সওয়ারগণ ও বিউগেলারগণ যাইতে থাকে। ইহাদের পশ্চাতে একখানা মোটর গাড়ীতে জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিংয়ের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার হাতে একখানা চামড়া বাঁধান ছড়ি ছিল। তিনি সতর্ক দৃষ্টি সহকারে মিছিলের গতির উপর লক্ষ্য রাখিতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে পতাকাবাহী স্বেচ্ছাসেবক-গণ, তৎপশ্চাতে ড্রামারগণ, ড্রামারদের পিছনে ব্যাণ্ড, ব্যাণ্ডের পশ্চাতে পদাতিক দল, তৎপর অশ্বারোহী দল চলে। অশ্বারোহীদলের পশ্চাতে প্রেসিডেণ্টের যান আসিতে থাকে।"

নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের অধিবেশনে, ১৯২৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র আপন অভিভাষণ পাঠ করেছেন। তাঁর 'সংক্ষিপ্ত অথচ চমকপ্রদ অভিভাষণ', 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বিবেচনায়, 'অতি অসার মামুলী কথায় পূর্ণ'।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর, লিখেছে:

"আজ বাঙ্গলাদেশের কাঁচকাঁচা ও তরুণদের উপর সুভাষবাবুর প্রভাব প্রতিপত্তি অপরিসীম। কেবল তরুণেরা নহে, প্রবীণেরাও তাঁহার নিকট অনেকখানি প্রত্যাশা করেন। সুভাষবাবুও কারামুক্তির পর হইতে, দেশের সর্ববিধ আন্দোলনের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া অসীম উৎসাহে কার্য করিতেছেন। কি ছাত্র আন্দোলন, কি যুব-সমিতি, কি কংগ্রেস, কি শ্রমিক-সমস্যা সর্বত্রই তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টা সুবিস্তৃত।...

সুভাষবাবুর মতে—সবরমতী ও পণ্ডিচেরী এই দুই কেন্দ্র হইতে প্রচারিত ভাবধারা যৌবনকে বিপথগামী করিতেছে। একথা তিনি স্পষ্টভাবে এবং কিঞ্চিৎ দাপটের সহিতই বলিয়াছেন। কি গান্ধী, কি অরবিন্দ এই দুই মনীষী সম্পর্কে সমালোচনা পূর্বেও হইয়াছে পরেও হইবে।...ইঁহারা উভয়েই প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যগৌরবে সমুন্নত মহাপুরুষ। ইঁহাদের চিন্তা, চরিত্র এবং কার্যপ্রণালীতে ত্রুটী থাকিতে পারে, সম্ভবতঃ আছেও; কিন্তু তথাপি কোন কোন ভারতসন্তান যদি তাঁহাদের সমালোচনায় অগ্রসর হয়, তবে তাহার যে শ্রদ্ধা লইয়া, যে সতর্কতার সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত, সুভাষচন্দ্র তাহা করেন নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত!

আজ যে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্য পদ্ধতির কথা বলা সুভাষবাবুর পক্ষে সহজ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ঐ সবরমতীর ভাবধারারই ফল, একথা যে কোন উত্তম কারণের জন্যই হউক, সুভাষচন্দ্র বিস্মৃত হইতে পারেন, আমরা পারি না। দুইচার দিনের জন্য এক অস্থায়ী স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘের সর্বপ্রধান পরিচালক হইয়া এবং ইংরাজের নকলে ফিল্ডমার্শালের পোষাক পরিয়া সুভাষচন্দ্রের এমন অভিমান করা উচিত নহে যে, গান্ধী সামরিক শিক্ষার বিরোধী। গান্ধী রাষ্ট্রক্ষেত্রে অভিনয় করিবার বিরোধী!...

আমাদের মনে হয়, কংগ্রেসী উত্তেজনায় অপ্রকৃতিস্থ হইয়া সুভাষবাবু এমন অসংলগ্ন যুক্তিহীন বাক্য দ্বারা একান্ত বালকোচিত ভাবে গান্ধী ও অরবিন্দ সম্পর্কে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।"

নেহেরু রিপোর্ট সমর্থন করে মহাত্মা গান্ধী নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহা সম্মেলনে,

১৯২৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন। এই প্রস্তাব সমর্থন না করে সুভাষচন্দ্র সংশোধক প্রস্তাব এনেছেন যে পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবাসীদের লক্ষ্য, ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করা পর্যন্ত প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হতে পারে না। প্রায় এগারো ঘণ্টা তুমুল তর্কবিতর্কের পর মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের পক্ষে ১৩৫৮ ভোট, সুভাষচন্দ্রের সংশোধক প্রস্তাবের পক্ষে ৯৭৩ ভোট।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৯ সালের ১ জানুয়ারি, লিখেছে:

"আমরা পূর্ণ স্বাধীনতারই পক্ষপাতী। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনরূপে সোনার পাথরবাটী আমরা চাই না...

বাঙ্গলার একদল প্রতিনিধির জিদের ফলেই সুভাষবাবুকে কংগ্রেস তাঁহার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইয়াছিল, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব পূর্ণ স্বাধীনতাবাদীদের নিজেদের দৌর্বল্যের ফলেই কংগ্রেসের আদর্শকে হীন করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে তাঁহার আন্তরিকতা ও দৃঢ়সঙ্কল্পের ফলেই নেহেরু রিপোর্ট সমর্থনকারীদের জয় হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বক্তৃতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতাবাদীদের গরম গরম মুখস্থ করা কথায় তিনি ততটা আস্থাবান নহেন; কেননা, এই পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালাইতে হইলে যে পরিমাণ ত্যাগ, সাহস ও দুঃখবরণের ক্ষমতার প্রয়োজন, তাহা আজিকার পূর্ণ স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই আছে। মহাত্মা গান্ধীর এই কথার যাথার্থ্য কে অস্বীকার করিবে? পূর্ণ স্বাধীনতাবাদীরা যে এইসব গুণের অধিকারী, তাঁহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত,—এর পরিচয় তাঁহারা দিন; তাহা হইলে সমগ্র দেশ তাঁহাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইবে।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৯ সালের ৩০ মার্চ লিখেছে: "এবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সম্মিলনীর নির্বাচিত সভাপতি। সুভাষবাবু রাষ্ট্রক্ষেত্রে চিন্তানায়ক না হইলেও,—তিনি কর্মী। তাঁহার উৎসাহ আছে, ঐকান্তিকতা আছে, সাহসও আছে।"

রঙ্গপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশনে, ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ, সভাপতি সুভাষচন্দ্র অভিভাষণ দিয়েছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৯ সালের ৩১ মার্চ, লিখেছে:

"বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর অভিভাষণ, সময়োচিত হইয়াছে। সুভাষচন্দ্র উচ্চাঙ্গের রাজনৈতিক দর্শন বা আদর্শবাদের সুদীর্ঘ আলোচনা করেন নাই। আজিকার দিনে সে সমস্তের প্রয়োজনাভাব। তিনি কর্মীর মত আমাদের অব্যবহিত লক্ষ্য এবং তাহা সাধনের উপায় সম্বন্ধেই দেশবাসীর সম্মুখে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।...

সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ নীতির পক্ষেই তিনি স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহেন।...বাস্তবক্ষেত্রে বিদেশী পণ্য, বিশেষভাবে বিদেশী বস্ত্র বর্জন, সাম্রাজ্যগর্বী বণিক রাজ্যের দর্পচূর্ণ করিবার অন্যতম প্রধান উপায়। মহাত্মা গান্ধী বর্তমানে এই কার্যপদ্ধতি লইয়াই দেশের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন এবং কংগ্রেসও সেই পথ নির্দেশ করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন—"ভারতবাসী কোন প্রকার শান্তিভঙ্গ না করিয়া যদি বিলাতী পণ্য বর্জন ও অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিতে পারে, তা হইলে এমন অবস্থা আমরা ঘটাইতে পারিব যে, ইংরাজ জাতি আমাদের ষোল আনা দাবী শির নত করিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।"

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে কার্যনির্বাহকসমিতির সদস্য

নির্বাচনকালে, ১৯৩০ সালের ১ জানুয়ারি, সুভাষচন্দ্র ও সমিতির কয়েকজন সদস্য সভা ত্যাগ করে বাইরে চলে গিয়েছেন; বাইরে গিয়ে তাঁরা একটি বৈঠকে স্থির করেছেন যে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে প্রেসিডেণ্ট এবং ডাক্তার আলম ও সুভাষচন্দ্রকে জয়েণ্ট সেক্রেটারি করে কংগ্রেসের মধ্যে 'কংগ্রেস ডেমোক্রাটিক পার্টি' নামে একটি নতুন দল গড়ে তুলবেন। সুভাষচন্দ্রের এই আচরণে আপত্তি জানিয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩০ সালের ৪ জানুয়ারি, লিখেছে: "কিছুদিন পূর্বে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে একদল সদস্য প্রতিবাদ স্বরূপ বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু একটি সুদীর্ঘ বর্ণনাপত্রে বলিয়াছিলেন যে, ঐরূপভাবে সদস্যদের বাহির হইয়া আসা ভাল হয় নাই, তাঁহাদের একটু ধৈর্যধারণ করিয়া সভায় থাকা উচিত ছিল। আজ সেই সুভাষবাবুই দলবলসহ নিখিল ভারত রাষ্ট্র সমিতির অধিবেশন হইতে অনুরূপ অবস্থায় বাহির হইয়া আসিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা বড় ভাল কাজ করিয়াছেন! সুভাষবাবু, ডাঃ আলম প্রভৃতি একটু ধীরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদের আচরণ কিরূপ বিসদৃশ হইয়াছে।"

প্রায় তিনমাস শুনানীর পর আদালত, ১৯৩০ সালের ২৩ জানুয়ারি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে রাজদ্রোহের অভিযোগে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। এখানে বলে রাখা ভালো, এই ঘটনার অল্পকাল আগে কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩০ সালের ২৪ জানুয়ারি লিখেছে: "সুভাষচন্দ্রের মত নিরলস কর্মীর অভাবে কংগ্রেসী আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে সন্দেহ নাই। তথাপি বাঙ্গালীর আজ গৌরব এই যে, আন্দোলনের সূচনাতেই সে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করিল। বাঙ্গলার কংগ্রেসের সভাপতিই সর্বাগ্রে কারাবরণ করিলেন!"

১৯৩১ সালের ৪ জুলাই সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশন হল। সেদিনকার অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছেন—সাম্যবাদের পথেই যে ভারত মুক্তিলাভ করবে, এ-বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। আমার মনে হয়, ভারতের এই সাম্যবাদ ভারতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং আবশ্যকতার অনুযায়ী হবে। সমগ্র জগৎ আজ সাম্যবাদের পথে চলেছে, আমরাই বা কেন চলব না। হয়তো ভারতে যে সাম্যবাদ দেখা দেবে, তা নতুন আকারের হবে, কিন্তু তা সমস্ত জগতের পক্ষে কল্যাণকর হবে।

পরদিন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র সভা স্থগিত রাখার কোনো নোটিশ না দিয়েই অকস্মাৎ কার্যকরী সমিতির সভা থেকে বেরিয়ে গেছেন, গোলমালের জন্য অধিবেশন বন্ধ। কিন্তু সভা শেষপর্যন্ত বন্ধ থাকেনি, এবং সেই সভায়, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে, সুভাষচন্দ্র ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই লিখেছে:

"বড়ই পরিতাপের কথা, সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়কে গোঁসা করিয়া শ্রমিক কংগ্রেসের সভাপতির পদ হইতে পলায়ন করিতে হইয়াছে। বহু তদ্বিরে এ-হেন দুর্লভ পদ মেলে—সে তদ্বির তিনি করিয়াছিলেন। বহু তদ্বিরে এমন পদ রাখা যায়, তাঁহার অভিভাষণের প্রত্যেক ছত্রে তাহা করিয়াছেন। সকলকেই খুসী করিতে গিয়া তাঁহাকে নাকাল হইতে হইল!

ন্যাশনালিজম-কাম-স্যোসালিজম কেহ বুঝিল না! এক অভিনব ভারতীয়

স্যোসালিজমের জন্ম-কথাও কেহ শুনিল না! কেহ ভাবিল না, গোলটেবিল বৈঠক নিদান পক্ষে জেনেভায় যাত্রাপথ প্রশস্ত করিতে হইলে, যাহা যাহা করা আবশ্যক, সুভাষবাবু তাহার প্রত্যেকটাই করিয়াছেন। উদার তিনি, তাই তাঁহার বিরুদ্ধে ভর্ৎসনামূলক প্রস্তাব উপস্থিত করিতে দিলেন এবং ভোটে যখন প্রস্তাব পাশ হয়, তখন অধিকতর উদার হইয়া নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য নিজেই নিজেকে ভোট দিলেন। তাহাতেও শেষ রক্ষা হইল না দেখিয়া, কংগ্রেস হইতে পলায়ন করিয়া বাড়ীতে বসিয়া ঘোষণা করিলেন, কংগ্রেস অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রহিল। কিন্তু কংগ্রেস স্থগিত রহিল না—কি আপশোষের কথা!"

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ১৯৩১ সালের ২৪ এপ্রিল, ময়মনসিংহ গিয়েছেন। রাজনৈতিক কারণে কয়েকজন যুবক সেখানে যতীন্দ্রমোহনের প্রতি অভদ্রোচিত ও দুর্বিনীত ব্যবহার করেছে। তদন্তের জন্য কমিটি হল, যথাসময়ে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। কমিটি সিদ্ধান্ত করেছে যে স্থানীয় জেলা কংগ্রেস কমিটি এবং বি. পি. সি. সি.-র কয়েকজন সদস্যই ওই গুণ্ডামির মূলে ছিলেন। কমিটির রিপোর্টের সূত্রে 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩১ সালের ১৯ জুলাই লিখেছে: "সুভাষবাবুর জ্ঞাতসারেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল, ইহা স্বীকার না করিলেও, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সুভাষবাবুর যাহারা বিশেষ অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি, তাহারাই ঐ কার্যের উদ্যোক্তা ছিলেন এবং নিজেরাই গুণ্ডামির সর্দারী করিয়াছিলেন।"

বি. পি সি. সি. রিলিফ কমিটি, ১৯৩১ সালের ৮ আগস্ট, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে কমিটির প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করেছে। কিন্তু এ-বিষয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সম্মতি নেওয়া হয়নি। কয়েকদিন পরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র খবর পেলেন, কিন্তু তিনি প্রেসেডেণ্ট হতে রাজি হলেন না।

সুভাষচন্দ্র, ১৯৩১ সালের ১৯ আগস্ট, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখেছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ১৯৩১ সালের ২১ আগস্ট, চিঠিখানার দীর্ঘ উত্তর দিয়েছেন। উত্তরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সুভাষচন্দ্রকে লিখেছেন: "তুমি লিখিয়াছ যে, তুমি ভারতবর্ষের সর্বত্র আমাকে প্রেসিডেণ্ট করা হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিয়াছ, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাঙ্গলায় তো সেরকম কিছুই দেখি নাই। একথা যদি সত্য হয় যে আমার অজ্ঞাতসারে এবং আমার সম্মতি না লইয়া আমার নাম ব্যবহার করা হইয়াছে, তবে একথা বলিতে হয় যে, তুমি সৌজন্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছ। মনে হয়, তুমি আমাকে চাও না, আমার নামটাই চাহিয়াছ।"

দীর্ঘ চিঠির শেষাংশে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সুভাষচন্দ্রকে লিখেছেন:

"তুমি একদিকে আমাকে তোমাদের রিলিফের প্রেসিডেণ্ট হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছ, আবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯২২ সালের রিলিফের টাকা আমার দ্বারা অপব্যয়িত হইয়াছে, একথাও বলিতেছ। একই সাথে একবার গালি দেওয়া, আর একবার স্তুতি করায় মনে হয়, তুমি ধমক দিয়া কাজ আদায় করিতে চাও।

আমি তোমাদের কমিটির সভাপতি না হওয়ায় তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ—আমি একবারে দলভুক্ত হওয়ার চরমে গিয়াছি বলিয়াছ। তুমি আমার উপর কলঙ্ক লেপন করিবার কাজে ব্রতী হইয়াছ, তুমি আমার সৃষ্ট একটী অত্যন্ত প্রিয় সংস্থার সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ। আমি খাদি প্রতিষ্ঠানের কথা বলিতেছি। তোমার যাহা খুসী করিয়া যাও, আমি তোমার সহিত বাদানুবাদে নামিব না। তোমার আরোপিত কলঙ্কের হাত হইতে আমার আত্মরক্ষার আবশ্যক নাই। আর যদি কয়েক বৎসর বাঁচি তো আমি আশা করি, দেশবাসীরা আমাকে সহ্য করিবেন, আমাকে মাতৃভূমির সেবার সুযোগ দিবেন। ঈশ্বর পরমকারুণিক। তোমার বয়স কাঁচা আছে। ঈশ্বর

তোমাকে বুঝিয়া চলিবার মত সুবুদ্ধি দিন।"[১]

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩১ সালের ২৩ আগস্ট, মন্তব্য করেছে: "কি দুঃখে, কি ক্ষোভে, অনেক মর্মান্তিক কথা আচার্য বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে? লোকে 'বালক' 'বালক' বলিলেও বস্তুতঃই সুভাষচন্দ্র বালক নহেন। আচার্যের দৃষ্টিতে তিনি যাহাই হউন—ভদ্রব্যক্তি মাত্রেরই এই বয়স্ক বালকের উদ্ধত এবং অশিষ্ট ব্যবহারে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইবার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে।"

বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে, ১৯৩১ সালের ৯ জুন, বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সনির্বন্ধ অনুরোধে একজন সালিশ নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। একমাত্র সালিশ নিযুক্ত হয়ে মধুসূদন আনে ১৯৩১ সালের ১৬ জুলাই কলকাতায় এসেছেন এবং সেদিন বিকেল থেকেই তদন্ত আরম্ভ করেছেন। তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর। সূচনায় মধুসূদন আনে স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—গত ৩।৪ বছর যাবৎ বাঙলার কংগ্রেসের বিশিষ্ট সদস্যবর্গের মধ্যে মতভেদ চলে আসছে, ফলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, একদলের নেতা সুভাষচন্দ্র বসু এবং অন্যদলের নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর, লিখেছে:

"কংগ্রেস দলাদলির মূল ও মুখ্য কারণ নীতিগত হইলেও উহা কেবল মতভেদের সীমাতেই আবদ্ধ থাকে নাই;—কর্মীদের মধ্যে নেতাদের মধ্যে মনান্তর সৃষ্টি করিয়া অতি লজ্জাকর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। কোন ব্যক্তি বা দলবিশেষের অনুষ্ঠিত নিয়মতান্ত্রিক ব্যভিচার ও দলাধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য ভোটসাধ্য অবলম্বন প্রভৃতির সমালোচনা আমরা বহুবার করিয়াছি। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, ভবিষ্যতে কোন দল যাহাতে কর্তৃত্ব করিবার জন্য প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি কুক্ষিগত করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। ক্ষমতাকে কেন্দ্রানুগ করিবার জন্য যে-সকল বিধি-নিয়ম রচিত হইয়াছিল, সেগুলি রদ করিয়া নূতন বিধানে জিলা কংগ্রেস কমিটিগুলির স্বাভাবিক ও সংগত ক্ষমতার পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। নির্বাচনাধ্যক্ষ সম্পর্কেও কেন্দ্র সমিতির যথেচ্ছাচারিতা একেবারেই সংকুচিত করা হইয়াছে এবং বিগত নির্বাচন বাতিল করিয়া পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত,—কংগ্রেসের দুর্নীতি দূর করিবার জন্য যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সংশোধনের যে পন্থা নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটিই গৃহীত হইয়াছে। কলহ ও তৎসংঘর্ষসঞ্জাত গরলরাশিতে ভীত না হইয়া সত্য ও ন্যায়ের জন্য শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের সংগ্রাম জয়যুক্ত হইল দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। দুর্নীতি ও ভোটশাঠ্য হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের এবং তাঁহার সহকর্মীবৃন্দের সাধু প্রচেষ্টা সার্থক হইল দেখিয়া কংগ্রেসকর্মী মাত্রেই আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইবেন।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন,—এই সিদ্ধান্তের পূর্বেই সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবু এবং তাঁহার দলীয় সদস্যগণ কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে পদত্যাগ করিয়াছিলেন। এই পদত্যাগের সহিত তিনি এক ভাবাবেগপূর্ণ বিবৃতিও প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ বিবৃতিতে যে-সকল উচ্চাঙ্গের আত্মবিসর্জনমূলক ভাব ছিল—কেবল সেই ভাবাবেগে চালিত হইয়া যে অভ্যস্ত দুর্নীতি ত্যাগ করিতে সকলে সক্ষম হয় নাই ইহা গত কয়েক বৎসরের বি. পি. সি. সি-র ইতিহাসই প্রমাণ করিবে।...গতিশীল রাজনীতিক্ষেত্রে সুভাষবাবু যদি তাঁহার অতীতকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়া

থাকেন এবং ভবিষ্যতকে উভয় দলের মিলিত শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেখিতে চাহেন, তবে যে অনাবশ্যক তিক্ত সমালোচনার হাত হইতে দেশহিতৈষিগণ অব্যাহতি পাইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

১৯৩২ সালের জানুয়ারিতে গভর্নমেণ্ট বিনা বিচারে সুভাষচন্দ্রকে আবদ্ধ করেছে। বন্দীদশায় সুভাষচন্দ্র আপন প্রদেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছেন, স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে পড়তে লাগল, গভর্নমেণ্ট সুভাষচন্দ্রকে প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে নিয়ে গেছে। বন্দী অবস্থায় সুভাষচন্দ্র শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। গভর্নমেণ্ট শয্যাশায়ী অবস্থা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেয়নি। মুক্তি তো দূরের কথা, ভারতের কোথাও সুভাষচন্দ্রকে কোনোরকম স্বাধীনতা দিতেও গভর্নমেণ্ট অনিচ্ছুক।

দুরারোগ্য ব্যাধি। কয়েকজন বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খরচের দায়িত্ব নিলেন, সুভাষচন্দ্র চিকিৎসার জন্য ইউরোপ পাড়ি দিলেন। পুলিশের তত্ত্বাবধানে সুভাষচন্দ্র, ১৯৩৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি, বোম্বাইতে ট্রিস্টিনো কোম্পানির "গাঙ্গে" জাহাজে উঠেছেন। জাহাজ নোঙর তোলার পর জনৈক পুলিশ কর্মচারী জাহাজে এসে সুভাষচন্দ্রকে জানিয়ে গেছেন যে ১৯৩৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি মুক্ত। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি, লিখেছে: "কালব্যাধি-কবলিত সুভাষচন্দ্র চিকিৎসার জন্য বিদেশযাত্রা করিলেন। দেশসেবায় জীবনের সমস্ত শক্তি ও কামনা নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া যিনি কেবল বাঙ্গলার নহে—সমস্ত ভারতের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন, তিনি সত্বর নিরাময় হউন,—সমগ্র দেশের এই প্রার্থনা ব্যর্থ হইবে না।"

সুভাষচন্দ্র, ১৯৩৩ সালের ২ মার্চ, 'এস. এস. গাঙ্গে' নামক জাহাজ থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশের জন্য একটি বিবৃতি পাঠিয়েছেন:

"প্রায় একবৎসর ধরিয়া আমি আমার প্রদেশ হইতে নির্বাসিত, বন্ধন শৃঙ্খলে আবদ্ধ বলিয়া আমার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গিয়াছে। আমার স্বাস্থ্য যতই ভাঙিয়া আসিতে লাগিল, ততই আমাকে প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে স্থানান্তরিত করা হইতে লাগিল, কিন্তু আমাকে আমার প্রদেশে চিকিৎসিত হইবার জন্য হাসপাতালে কিংবা কোনও চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখিতে দেওয়া হয় নাই। আমি জানি, গবর্নমেণ্ট আমাকে চিকিৎসা করিবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত ছিলেন। বাঙ্গলার কারাগারসমূহ আমার সহস্র সহস্র স্বদেশবাসীর প্রতি সদয়, কিন্তু আমার জন্য উহাদের দুয়ারও বন্ধ ছিল।

আমার কায়িক যন্ত্রণার উপর মানসিক যন্ত্রণায় আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি কারাগৃহের অন্তরাল হইতে বাঙ্গলার দুর্দশার কথা ভাবিয়া অস্থির হইয়া যাইতাম। আর নির্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া দুর্দশাকে বরণ করিয়া লইবার শক্তির জন্য মায়ের নিকট অন্তর দিয়া প্রার্থনা করিতাম।

জীবনের এই সকল বাস্তবতাকে দূরে রাখিয়া দিয়া নিভৃতে একমনে ধ্যান করিতাম। ভারতের জন্য বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেশবন্ধু যে মহান স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যে বিরাট সাধনা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া অপূর্ব আনন্দ লাভ করিতাম। আমি এ প্রকার আনন্দ জীবনে আর কখনো অনুভব করি নাই। এই স্বপ্ন আমার নিকট অমূল্য হইয়া থাকিবে এবং বিশ্বের কোন শক্তিই তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। আমি দিনের পর দিন ধরিয়া ইহাই কামনা করিয়া আসিতেছিলাম।

আমি সেই সম্মিলিত বিরাট বাঙ্গলাকেই স্বপ্ন দেখিতেছি—যে বাঙ্গলা মুসলমান বা হিন্দু, খৃষ্টান বা বৌদ্ধের নয়, উহা সকল বর্ণ, সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলিত বাঙ্গলা।

সেই বাঙগলা একদিন সমগ্র ভারত তথা মানব সভ্যতার জন্য নিজকে বিলাইয়া দিবে। এই স্বপ্ন আমার দিবসের চিন্তা, নিশীথের স্বপ্ন, জীবনের আনন্দ।

এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করা আমার জীবনের সাধনা ও সংকল্প। ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আমাদের তনুমন অর্পণ করিতে হইবে, ইহাকে জয়যুক্ত করিতে হইলে কোনও ত্যাগই শ্রেষ্ঠ নয়, কোন নির্যাতনই চরম নয়। বন্ধুগণ! সম্মিলিত বাঙগলাগঠন করিবার জন্য আপনারা কি সাড়া দিবেন না? আপনারা বাঙগলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বংশধর। কার্যে এবং চিন্তায় যখন আপনারা মহৎ হইবেন, তখনই আপনারা আপনাদের দেশকে মহান করিতে সমর্থ হইবেন। আজিকার এই দিনে আমি আপনাদের নিকট বিনীত ভাবে আবেদন করি—"তুচ্ছ ঝগড়া বিবাদ ভুলিয়া যান। ব্যক্তিগত বিভেদ ও বৈষম্য ভুলিয়া যান। বাঙগলাকে সম্মিলিত ও মহান করিবার জন্য সচেষ্ট হউন। বাঙগলার মহত্ত্বই আমাদের গৌরব। যদি বাঙগলা বাঁচে তবে কে মরিবে এবং যদি বাঙগলা মরে তবে কে বাঁচিবে?"

এই বিবৃতিটি ১৯৩৩ সালের ১১ মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছে। এবং তৎসহ প্রকাশিত হয়েছে সুভাষচন্দ্রের একখানা ছবি, ছবিখানার নিচে সুভাষচন্দ্র স্বহস্তে লিখে দিয়েছেন:

Yours sincerely,
Subhas C. Bose,
S. S. Gange,
1.3.33."

'এস. এস. গাঙ্গে' নামক জাহাজ থেকে সুভাষচন্দ্র, ১৯৩৩ সালের ১ মার্চ, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদককে চিঠি লিখেছেন:

"বন্ধুবরেষু—

অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর ২৩শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই হতে রওনা হলাম। শেষ যন্ত্রণা পেলাম বোম্বাই পুলিশের দ্বারা। এ পর্যন্ত আমরা কোথাও থামি নাই—আগামীকল্য একেবারে Port Said-এ (পোর্ট সৈয়দ) গিয়া থামব। সেখান থেকে রওনা হয়ে Venice (ভেনিস)-এ পৌঁছিব, ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ করেছি যে প্রথমে Venice যাব। সেখানে ডাক্তারদের মতামত নিয়ে নিজের কর্তব্য ও গন্তব্য স্থির করব।

এপর্যন্ত পথে বিশেষ কোনও অসুবিধা হয় নাই—কেবল দুইদিন Aden (এডেন)-এর কাছে একটু গরম বোধ হয়েছিল। শীত এখনও পড়ে নাই, তাই খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী পরে এখনও চালাচ্ছি। Port Said-এর পর বোধ হয় আর চলবে না।

সারাদিন এবং রাত্রে প্রায় ১১টা পর্যন্ত ডেক-এর উপর পরে থাকি। সমুদ্রের অসীম নীলত্বের শোভা উপভোগ করি—বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করি ও আকাশ-পাতালের কথা ভাবি। পেটের যন্ত্রণা এখনও প্রত্যহ কষ্ট দিচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল বোধ করছি। সহযাত্রীরা বলেন যে, আমার চেহারা পূর্বাপেক্ষা ভাল দেখাচ্ছে। এ জাহাজের খাওয়া দাওয়া খুব ভাল এবং খাতির যত্ন খুব বেশী করে। pro জাহাজে এ রকম খাতির যত্ন করে না, তা সত্ত্বেও আমাদের দেশবাসীরা এখন pro-র মায়া কেন ছাড়তে পারলেন না—আমি মোটেই বুঝতে পারি না।

বিষাদভরা মন নিয়ে দেশ থেকে বেরিয়েছি। পিতামাতা ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হল না। এ ছাড়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রভুরা এত যন্ত্রণা দিয়েছে যে, বোম্বাই থেকে যে রওনা হতে পারব—এ বিশ্বাস ছিল না যে পর্যন্ত জাহাজ না ছেড়েছে।

বাঙগলার আকাশ বাতাস—বাঙগলার দিগন্তব্যাপী ঢেউ খেলান শ্যামল দৃশ্য ও বাঙগলার নদনদীর অপূর্ব সৌন্দর্যের জন্য এক বৎসর ধরে আমার প্রাণ কাঁদছে। কবে

আবার বাঙলার বুকে ফিরে যাব—সেই কথা কেবল ভাবি।

এক বৎসরের ভিতরে আমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, মন অনেক বেশী প্রশান্ত ও হৃদয় অনেক বেশী উদার হয়েছে। নিজের গন্তব্য পথ পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি—কর্তব্য পথ সম্বন্ধে মনের মধ্যে আর কোনও সন্দেহ নেই এবং যদি একাকীও নিঃসঙ্গ হয়ে বন্ধুর পথে চলতে হয় তাতেও পশ্চাদপদ হব না। এসব সত্য কিন্তু কাজ করবার জন্য নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পাব কিনা—তা বলতে পারি না, যা হোক ভাবনা আর করি না—

"তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ
করুণাময় স্বামী"

প্রীতি সম্ভাষণ গ্রহণ করবেন।

ইতি
ভবদীয়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু"

চিঠিখানা ১৯৩৩ সালের ১২ মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছে।

ভিয়েনা থেকে সুভাষচন্দ্র বসু, ১৯৩৩ সালের ১২ এপ্রিল, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে লিখেছেন:

"প্রিয়বরেষু,—

আমি এখানকার স্বাস্থ্যনিবাসে সম্পূর্ণ একমাসকাল বাস করিয়াছি। এখন এখানে আসার পর আমার স্বাস্থ্যের যে উন্নতি হইয়াছে তাহার একটা হিসাব নিকাশ লওয়া যাইতে পারে। আমি যে মোটের উপর পূর্বাপেক্ষা ভাল বোধ করিতেছি সেবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যেরূপ আশা করিয়াছিলাম আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি ততটা সন্তোষজনক হয় নাই। তলপেটের বেদনা মোটের উপর পূর্ববৎই আছে। তবে দৈহিক তাপ কমিয়াছে এবং ওজন কিছু বাড়িয়াছে। তলপেটের বেদনা যে পর্যন্ত আরোগ্য না হইবে সে পর্যন্ত দ্রুত স্বাস্থ্যলাভের কোন আশা নাই। এখন আমাকে নিজেই স্থির করিতে হইবে, বর্তমান রক্ষণশীল চিকিৎসাধীনই থাকিব (তাহাতে দীর্ঘ সময় লাগিবে) না অস্ত্রোপচার করাইব। মুস্কিল এই যে, অস্ত্রোপচার করাইলেও ভবিষ্যতে বেদনা হইতে রক্ষা পাইব কিনা সেবিষয়ে চিকিৎসকগণ কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। এই সপ্তাহে আমি আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কর্তব্য স্থির করিব।

কিছুদিন পূর্বে মিঃ সূর্য সেনা নামক সিংহলের একজন কলাবিদ ভিয়েনায় ভারতীয় ও সিংহলী সঙ্গীতে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। মিঃ সেনার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীও ছিলেন; তিনিও একজন চমৎকার সঙ্গীতজ্ঞা। ভিয়েনার জনসাধারণ এই সঙ্গীত খুব উপভোগ করিয়াছে। কিছুদিন পর ভিয়েনার হিন্দুস্থান একাডেমিক এসোসিয়েসন মিঃ ও মিসেস সেনার সম্মানার্থ একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করেন। ভিয়েনার কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলা এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মিঃ ও মিসেস সেনা এখানেও তাঁহাদের সঙ্গীতে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

মুক্তির পর হইতেই কলিকাতার স্থানীয় দলাদলি ব্যাপারে আমি নিজেকে অত্যন্ত অসুখী বোধ করিতেছি। আমার দৃঢ় মত এই যে আমরা যখন এই সব দলাদলির অবসান করিতে পারি না তখন ইহা হইতে আমাদের দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া জনসাধারণকে মুক্তকণ্ঠে বলা উচিত যে, আমরা এই সব দলাদলির অনুমোদন করি না। আমি দল গঠনের বিরোধী নহি। বস্তুতঃ আমার মত এই যে, দল গঠন না করিয়া কোনরূপ রাজনৈতিক কাজ করাই সম্ভবপর নহে। কিন্তু কংগ্রেসদল যখন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

হইয়া প্রত্যেক শ্রেণীই দাবী করিতেছে যে, তাহারা কংগ্রেসের প্রতিনিধি, তখন এই ব্যাপারে আমি এমন কোনও নীতি দেখিতে পাই না যাহার ফলে দুইটি স্বতন্ত্র শ্রেণী গঠনের সংগতি থাকিতে পারে। এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট এবং একমাত্র পন্থা হইতেছে এই সব দলাদলি হইতে দূরে থাকিয়া একটি কর্মীদল গঠন করা, যাহারা স্বদেশের মুক্তির জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিবে। আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, কলিকাতায় যে দলগত বিরোধ চলিয়াছে আমাদের মফঃস্বলের সহকর্মীদের তাহাতে কোনও স্বার্থ বা তাহার সঙ্গে কোনও সহানুভূতি নাই। কলিকাতার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমূহের প্রতি আমার অনুরোধ, তাহারা অনুমোদন করেন কিনা সংবাদপত্রের মারফতে তাহা একে একে ব্যক্ত করিবার জন্য আহ্বান করুন। আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, এরূপ করিতে আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে, যেখানে নীতির কোনও সম্পর্ক নাই এবং যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত বা দলগত প্রাধান্য বলিয়াই মনে হয়, সেখানে বাংলার জনমত কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন দল বা শ্রেণী গঠনের বিরোধী।

ভবদীয়—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।"

চিঠিখানা ১৯৩৩ সালের ৭ মে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছে।

ভিয়েনা থেকে সুভাষচন্দ্র, ১৯৩৩ সালের ১৯ এপ্রিল, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে লিখেছেন:

"প্রিয়বরেষু,

গত সপ্তাহের পর আমার স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই, গাত্রতাপের অবস্থা সন্তোষজনকই রহিয়াছে এবং ওজনও কিছু বাড়িয়াছে। ফলে ভিয়েনায় আসার পর আমার ওজন যে পরিমাণে কমিয়াছিল সে পরিমাণে আমি তাহা পুনরায় লাভ করিয়াছি কিন্তু আমার প্রধান পীড়া অর্থাৎ আহারের পর পেটের বেদনা পূর্ববৎই রহিয়াছে এবং ভারতবর্ষে থাকিতে যেরূপ ছিল সময় সময় তাহা তদপেক্ষাও বাড়িয়া যায়। এই সপ্তাহে আমাকে কিছু কালের জন্য ঘরের বাহিরে আসিয়া স্বাস্থ্যনিবাস-সংলগ্ন উদ্যানে কিছুক্ষণ বেড়াইতে দেওয়া হইয়াছিল।

ভারতীয় ছাত্রগণ ও ভিয়েনার জনসাধারণ আমার প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহাদের গুণে আমি যে বিদেশে আছি সেকথা মনে করিতে হয় না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভ্যগণও আমার প্রতি খুব সদয়। সংবাদপত্রসেবী, লেখক, শিল্প সমালোচক, রাজনীতিবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষক ও সমাজসেবী সব শ্রেণীর লোকেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছেন। সুতরাং আমি যাহাদের সঙ্গে দেখা করিতে চাই নিজে যাইয়া তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতে না পারিলেও কিয়ৎ পরিমাণে আমার সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি। সেদিন ভিয়েনার অধ্যাপক গেলডার্ণের সঙ্গে হরাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর খনন সম্বন্ধে আলাপ হয়। তিনি বলেন যে, আর্যদের ভারত আক্রমণের সময় সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করিতেছেন। প্রত্নবিদ্যা ও সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে আমাদের পণ্ডিতগণ যেসব কাজ করিয়াছেন অধ্যাপক গেলডার্ণ তাহার সহিত সুপরিচিত। ডাঃ সুনীতি চাটুজ্যের কাজ সম্বন্ধে তিনি উচ্চ অভিমত প্রকাশ করেন।

ভারতীয় শিল্পকলা ও সভ্যতা সম্বন্ধে ইউরোপের এই অংশের জনসাধারণের বেশ ঔৎসুক্য আছে। সম্প্রতি ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধেও এখানে খুব আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও স্যার জগদীশ বসুর নামই এখানে সবচেয়ে বেশী পরিচিত। আমি স্যার জগদীশ বসুর আত্মীয় কিনা এ সম্বন্ধে আমাকে লোকে প্রশ্ন করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, ভারতবর্ষ ও ইউরোপের এই অংশের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা বিষয়ে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

এই উদ্দেশ্যে এখানকার ভারতীয় অধিবাসীগণ হিন্দুস্থান একাডেমিক এসোসিয়েসন নামে একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। এই কার্যের সাহায্যার্থ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের উচিত বিভিন্ন বিষয়ের ইউরোপীয় মনীষিদিগকে ভারতবর্ষে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা। আমার এরূপ মনে করিবার কারণ আছে যে, খুব বেশী টাকা ব্যয় না করিয়াও সহজেই ইহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন নির্বিকার চিত্তে সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয় করিবার সময় আসিয়াছে। এ উদ্দেশ্যে আমাদের প্রথম কর্তব্য হইতেছে গভর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে কোনপ্রকার সম্মানজনক মীমাংসার সমস্ত আশা পরিত্যাগ করা। বর্তমান অবস্থায় অপরের মনে মিথ্যা আশার সৃষ্টি করা বা মিথ্যা আশায় নিজেকে ভুলাইয়া রাখা গুরুতর অপরাধ। পৃথিবীর সর্বত্র প্রবল প্রতিক্রিয়ার প্রবাহ চলিয়াছে এবং আরও কিছুকাল তাহা চলিবে। সুতরাং কংগ্রেসকর্মীদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, গবর্ণমেণ্ট যেমন কংগ্রেসকে ধ্বংস করিতে পারে নাই, কংগ্রেসও তেমনই গবর্ণমেণ্টকে জাতীয় দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য করিতে পারে নাই। অপর কথায়, কংগ্রেসকর্মীদিগকে সাহস ও সাধুতার সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, কংগ্রেসের বর্তমান কার্যপ্রণালী যথেষ্ট নহে। একথা স্বীকার করিয়া লইলে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয় করা শক্ত হইবে না।

কবি, সম্পাদক, ঔপন্যাসিক প্রভৃতিদের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে, ইহার নাম পি-ই-এন ক্লাব। ইহার প্রধান কেন্দ্র লণ্ডনে। এই ক্লাব প্রতি বৎসর একটি করিয়া সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন এবং প্রত্যেক দেশ পর্যায়ক্রমে সম্মেলন আহ্বান করে। ইউরোপের প্রত্যেক দেশে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা আছে, কিন্তু শিল্প ও কৃষ্টি জগতে ভারতের যথেষ্ট অবদান সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতে উহার কোন শাখা নাই। আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উহার অন্যতম অবৈতনিক সদস্য, কিন্তু এই আন্তর্জাতিক প্রতিঠানে ভারতের আর কোন প্রতিনিধি নাই। আমি এই বিষয়ে আমাদের মনীষিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি এবং আমাদের দেশে একটি শাখা খোলার জন্য প্রস্তাব করিতেছি। ইহা করা হইলে ভারতবর্ষ আমাদের দেশে সম্মেলন আহ্বান করিবার সম্মানলাভ করিবে।

ভবদীয়—

সুভাষচন্দ্র বসু

পুনঃ। শ্রীযুক্ত প্যাটেল অদ্য (১৯শে মে?) সন্ধ্যায় লণ্ডন হইতে এখানে পৌঁছিয়াছেন, তাঁহাকে দুর্বল দেখাইতেছে এবং একটি স্বাস্থ্যনিবাসে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছে। তাঁহার পুরাতন অসুখের পুনরাক্রমণ হইয়াছে।

আপনি "আনন্দবাজার" (দৈনিক সংস্করণ) একখানি করিয়া পাঠান না কেন?"

চিঠিখানা ১৯৩৩ সালের ১৪ মে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছে।

'কণ্টেভার্ডে' জাহাজে সুভাষচন্দ্র বিদেশ থেকে স্বদেশের দিকে যাত্রা করেছেন, এদিকে গবর্ণমেণ্টও প্রস্তুত, বোম্বাইয়ে জাহাজ থেকে অবতরণের সংগে সংগেই সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হবে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৬ সালের ৮ এপ্রিল, লিখেছে: "সুভাষচন্দ্র শাসকগণের প্রতিদ্বন্দ্বী। ভয়ে লোভে মোহে শাসকবর্গের দাসত্বকে তিনি নিয়মতান্ত্রিক উন্নতির সোপান বলিয়া বিবেচনা কোনদিনই করেন নাই। ইহাই যদি সুভাষচন্দ্রের অপরাধ হয়, তাহা হইলে সে অপরাধের বহু দণ্ড,

বহু লাঞ্ছনা, অন্যান্য জননায়ক ও দেশকর্মীর মত তিনি উন্নত শিরেই সহ্য করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও সহ্য করিবেন, গবর্ণমেণ্টের হাতে প্রচুর ক্ষমতা আছে, বিবিধ আইন উদ্যত হইয়াই আছে এবং তাহা সামান্য অছিলায় প্রয়োগ করিবার মত উৎসাহী নিমকহালাল কর্মচারীরও অভাব নাই...।"

১৯৩৬ সালের ৮ এপ্রিল সকালবেলা জাহাজ থেকে সুভাষচন্দ্র বোম্বাইয়ে অবতরণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের হাতে বন্দী হলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা,' ১৯৩৬ সালের ৯ এপ্রিল, লিখেছে: "কেহ কেহ সুভাষচন্দ্রকে বিদেশে অপেক্ষা করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু যে সকল কারণে সে পরামর্শ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহাও তিনি দেশবাসীর নিকট খুলিয়া বলিয়াছেন। ইউরোপে তাঁহাকে ভারত-গবর্ণমেণ্ট কোন সাহায্য করেন নাই, চিকিৎসা ও অবস্থানের ব্যয়ের জন্য তাঁহাকে বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপে ভারত-বিরোধী প্রচারকার্য ব্যাহত করিবার জন্য উপযুক্ত অর্থসাহায্য তিনি পান নাই। স্বর্গীয় বিঠলভাই প্যাটেল বিদেশে প্রচারকার্যের জন্য যে অর্থ সুভাষচন্দ্রের নামে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা যাহাতে সুভাষচন্দ্র না পান, সেজন্য বোম্বেওয়ালারা আইনের ফ্যাকড়া তুলিয়া বিরোধিতা করিয়াছেন। বলিতে লজ্জা হয়, ইহার মধ্যে কংগ্রেসের পার্লামেণ্টীয় নেতা মিঃ ভুলাভাই দেশাইও আছেন। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ অনুরুদ্ধ হইয়াও সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রচারকার্যে কোন নিয়োগপত্র দেন নাই। এই সকল কারণের সহিত অর্থাভাবে ও কর্মের অভাবে বিব্রত ও বিষণ্ণ সুভাষচন্দ্র উপায়ান্তরহীন হইয়া পুনরায় দেশবাসী ও দেশ-নায়কগণের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও কর্তব্যজ্ঞানের অভাব কতটুকু তাহা দেশবাসী বিচার করিবেন, আমাদের লজ্জিত লেখনী সে কলঙ্ক উদ্ঘাটন করিতে স্বতঃই সঙ্কুচিত হইতেছে।"

কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯৩৬ সালের ১০ মে 'সুভাষ দিবস' পালনের জন্য ভারতের জনসাধারণকে আহ্বান করেছেন। নিখিল ভারত 'সুভাষ দিবসে' দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের সহযোগিতা কামনা করে 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৬ সালের ৯মে লিখেছে: "বাঙলার গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বিনাবিচারে বন্দী সুভাষচন্দ্রের প্রতি জাতির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ব্যক্ত হোক এবং যতদিন সুভাষচন্দ্র মুক্ত না হবে এবং দেশব্যাপী দমননীতি প্রত্যাহৃত না হয়, ততদিন আমরা নিরস্ত হইব না—এই দৃঢ়সঙ্কল্প গৃহীত হোক।"

১৯৩৬ সালের ১০ মে ভারতের সর্বত্র 'সভাষ দিবস' পালিত হল। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মারফৎ দেশবাসীর কাছে বাণী প্রেরণ করেছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র জন্য বিশেষভাবে প্রদত্ত সেই বাণী ১৯৩৬ সালের ১২ মে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছে:

"অনেক দুঃখ অনেক নামে রূপে সমস্ত দেশ জুড়ে জমে উঠেছে। সে দুঃখ দরিদ্রের দুঃখ, অক্ষমের দুঃখ, তার মধ্যে কেবলি আছে শোচনীয়তা। এমন কিছু নেই যা আজকের দিনে পৃথিবীর বড়ো বড়ো সমস্যার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে।

জটিল অর্থনৈতিক কারণে অন্য দেশে অর্দ্ধাশন একটা অনভ্যস্ত বড়ো সংখ্যায় পোঁছিবামাত্র বহু ক্ষমতাশীল চিন্তাশীল হৃদয়বান মানুষের দিন ও রাত্রিকে ক্ষুব্ধ করে তুলেচে। কর্ম্ম অভাবে অন্ন অভাব অনিবার্য্য হবেই, এ কথা সেসব দেশে নিঃশব্দে স্বীকৃত হয়নি। সে দেশের মানুষ পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকবার অধিকারী, উপবাসের কৃশ-মূর্তি দেখা দেবামাত্র এ কথাটা গর্জিত হয়ে উঠেচে সেখানে। সে দেশে মানুষের মূল্য আছে।

আমাদের দেশে অর্ধাশন অনশন দেশেকালে পরিব্যাপ্ত। তার বেদনা ঘরে ঘরে। কিন্তু ক্রন্দনধ্বনি ঘরের বাইরে পেঁছিবার মতো কণ্ঠ দেশের নেই। আমাদেরও যে বাঁচতে হবে এমন দাবী নেই মানব সমাজের কাছে। পিপাসার জল নেই, অন্ন নেই, আরোগ্যের ব্যবস্থা নেই। মরে যাচ্ছি দ্রুতবেগে, বেঁচে থাকচি আধমরা হয়ে, এর প্রতিকার তো নেই-ই, যথেষ্ট পরিমাণে পরিতাপ নেই মানবের মনে।

সাংঘাতিক রোগের ক্ষেত্র, বিস্তীর্ণ হয়ে চলল চারদিকে। নূতন ও পুরাতন মূর্তিতে মারী জীর্ণ করচে সমস্ত দেশের অস্থিমজ্জা, মনকে করচে নিশ্চেষ্ট, আশা ভরসা মিলিয়ে দিচ্ছে ধুলোয়। এর উপরে নিরক্ষরতায় মূর্খতায় এখানে মানুষের মূল্য এসে ঠেকেচে শূন্য। জগতে এর উদ্বেগ অতি ক্ষীণ, এর নালিশের কোনো জায়গা নেই।

এই সঙ্গেই এই বাঙলা দেশে হাজার হাজার নরনারী আজ বন্দিশালায়। বিচারের দাবী করচিই, সেই দাবীর পিছনে দুঃখ আছে দুঃসহ, কিন্তু তার জোর নেই। বিনা বিচারে যারা দণ্ডভোগ করচে অপরিমিত কাল ধরে, তাদের মধ্যে দেশের যে বেদনা আছে, তার চেয়ে অনেক বড়ো করে আছে, দেশের অসম্মান। বিচারের অধিকারে আছে মনুষ্যত্বের সম্মান। তার থেকে আমরা বঞ্চিত। কেননা, আমরা বিশ্বের গোচর নই, আমাদের মূল্য নেই। এই দেশব্যাপী অভিসম্পাতের আক্রমণ হতে যদি কোন দিন নিজেদের রক্ষা করতে পারি তাহলেই আমাদের প্রত্যেক অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হবে দেশে বিদেশে।

সেদিনের পূর্বে ব্যর্থ বিলাপ ঘোষণা করবার জন্যে সম্পাদকের আমন্ত্রণ স্বীকার করবার উৎসাহ আমার নাই। ইতি ২৬শে বৈশাখ, ১৯৪৩ সাল।”

গভর্নমেণ্ট ১৯৩৭ সালের ১৭ মার্চ সুভাষচন্দ্রকে বিনাসর্তে মুক্তি দিয়েছে। সুদীর্ঘ পাঁচবছর পর সুভাষচন্দ্রের বন্দীজীবনের অবসান হল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৭ সালের ১৮ মার্চ লিখেছে: “নূতন শাসনতন্ত্র ও আইনসভার মোহে ভুলিয়া কংগ্রেস তাহার প্রধান লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতার আহ্বানও ভুলিতে বসিয়াছে। চারিদিকের এই আত্মবিশ্বাসহীন সংশয় ও দৌর্বল্যের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের মত স্থিরবুদ্ধি, দৃঢ়সঙ্কল্প, অক্লান্ত কর্মীর যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? বিশেষতঃ নেতৃহীন বাঙলাদেশ তাঁহার মত যোগ্য কর্ণধারের জন্যই এতদিন প্রতীক্ষা করিতেছে। তিনি বাঙলার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার জাতীয় জীবনকে ঠিক পথে পরিচালনা করিবেন, এই আশাই আমরা করি।”

১৯৩৭ সালের ৬ এপ্রিল শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বিরাট জনসভায় অর্ধলক্ষাধিক নরনারীর সমাবেশে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে সদ্যমুক্ত সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করা হল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৭ সালের ৭ এপ্রিল, লিখেছে: “সুভাষচন্দ্র মনে করেন যে, অতঃপর আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির সংগ্রাম ক্ষেত্র প্রধানতঃ সর্বভারতীয় হইবে; সুতরাং এই সর্বভারতীয় ব্যাপারে পূর্বাপেক্ষা অধিক সময় নিয়োগ করাই তাঁহার অভিপ্রায়। অবশ্য বাঙলার কর্মক্ষেত্রকে তিনি যে উপেক্ষা করিবেন তাহা নহে; কিন্তু এই সম্বন্ধে তিনি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা বাঙলার কংগ্রেসপন্থীদের আমরা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। যে দলাদলি ও তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম পারস্পরিক ঈর্ষা-বিদ্বেষে কংগ্রেস বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, দুর্বল, তাহাতে সুভাষচন্দ্রের মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। তিনি চাহেন বাঙলার রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে এই কলুষ দূর করিতে। যদি বাঙলার কংগ্রেস-কর্মীরা দলাদলি ও আত্মপ্রাধান্যের দুর্নীতি ত্যাগ করিয়া একই কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হইতে পারেন, দল ও উপদল অপেক্ষা দেশকেই বড় বলিয়া বুঝেন, তবেই সুভাষচন্দ্র

বাঙলা কংগ্রেসের কার্যে সহযোগিতা করিতে পারেন।"

স্বাস্থ্যলাভের জন্য পাঁচমাস পাঞ্জাবে কাটিয়ে সুভাষচন্দ্র, ১৯৩৭ সালের ৭ অক্টোবর, কলকাতায় ফিরে এলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৭ সালের ৮ অক্টোবর, লিখেছে: "শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু গতকল্য বৃহস্পতিবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। গত পাঁচ মাসকাল ডালহৌসীতে থাকিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার চিকিৎসক ডাঃ ধরমবীরের মতে, কোন স্বাস্থ্যকর পার্বত্য অঞ্চলে যাইয়া তাঁহার আরও কিছুকাল বিশ্রাম করা প্রয়োজন; নতুবা তিনি পূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভ করিতে পারিবেন না। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, চিকিৎসকের এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া সুভাষবাবু শীঘ্রই কার্সিয়াং-এ যাইবেন।

সুভাষবাবুর নেতৃত্বের জন্য সমগ্র বাঙলা দেশ উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছে। বাঙলার কংগ্রেসে যে বিশৃঙ্খলা ও কর্মহীনতা দেখা দিয়াছে, সুভাষবাবুর পরিচালনায় তাহা দূরীভূত হইবে এবং নিখিল ভারত কংগ্রেসে বাঙলা আবার তাহার যোগ্য আসন লাভ করিবে,—এই আশাই আমরা করি। বহুদিন পরে কলিকাতায় নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইতেছে, সুভাষবাবু সেই অধিবেশনে যোগ দিলে উহার শক্তি বৃদ্ধি এবং বাঙলার মর্যাদা রক্ষা হইবে। কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সুভাষবাবুই সভাপতি নির্বাচিত হইবেন, ইহা একপ্রকার স্থির। সুতরাং সেজন্যও সুভাষবাবুকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আমরা প্রার্থনা করি, শ্রীভগবানের কৃপায় সুভাষবাবু পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া পুনরায় কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিবেন।"

স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র, ১৯৩৭ সালের ১৮ নভেম্বর, ইউরোপের দিকে পাড়ি দিয়েছেন। কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি আচার্য কৃপালনী, ১৯৩৮ সালের ১৮ জানুয়ারি, ঘোষণা করেছেন যে সুভাষচন্দ্র হরিপুরে কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সুদূর বিদেশ থেকে সুভাষচন্দ্র, ১৯৩৮ সালের ২৪ জানুয়ারি, কলকাতায় ফিরে এসেছেন।

বিঠলনগরে, ১৯৩৮ ফেব্রুয়ারি, সুভাষচন্দ্র ভারতীয় রাষ্ট্র-মহাসভার এক-পঞ্চাশৎ অধিবেশনে অভিভাষণ দিয়েছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি, লিখেছে: "যে সংগঠন শক্তি এবং যে সংগঠন-প্রতিভা শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভ হইতে তাঁহাকে বিশেষত্ব দিয়াছে এবং লোকসেবার কর্মক্ষেত্রে তাঁহাকে প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা দিয়াছে, হরিপুর কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে সেই সংগঠন-প্রতিভারই পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইতেছি। জাতির পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়কের পদে বৃত হইয়াও "কর্মী সুভাষচন্দ্রই অধিকতর এবং উজ্জ্বলতর গৌরবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তরুণ বয়সে কঠোর কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যে আদর্শের সাধনায় জীবনের শ্রেষ্ঠভাগ অতিবাহিত করিয়াছেন, বহু ত্যাগস্বীকার ও বহু দুঃখদহনের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে যে আদর্শ তাঁহার চিন্তায় ও ধ্যানে ক্রমশঃ প্রস্ফুটতর ও পরিপূর্ণতর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই আদর্শই আজ তিনি দেশ ও জাতির সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। দীর্ঘকালের স্বপ্ন আজ বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে!"

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রথম স্টাফ রিপোর্টার সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকালে বলেছেন:

"১৯৩৮ সালে সুভাষবাবু কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হলেন। তার আগে থেকেই আমরা ওঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছি। সেটা জলপাইগুড়ি কংগ্রেস। উনি যাবার আগে আমাকে বললেন,

---

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ অগাস্ট ১৯৩১।

আমার মনে হচ্ছে এবার আমি হয়তো প্রেসিডেন্ট হব। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। সময়মতো ঔষধগুলো খাওয়াবে যেন কেউ না জানতে পারে।

সুভাষবাবু সেসময় থেকে রুগ্ন ছিলেন। রোজ তাঁকে ঔষধ খেতে হত। তবুও, কোনদিন সামান্য সময়ের জন্য তাঁকে ক্লান্ত হয়ে কাজ থেকে অবসর নিতে দেখিনি। যখনই গেছি, দেখি উনি কাজ করে চলেছেন। আমি সন্ধ্যা ৭টায় যেতাম, সব সময় দেখতাম উনি কাজ করছেন। ১৯৩৮ সালে সুভাষবাবু কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর, খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর প্রতি আমাদের নজর ও তাঁর কাছে আমাদের যাতায়াত আরো বেড়ে গেল। কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষবাবুকে ডিসমিস করে যখন রাজেন্দ্র-প্রসাদকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট করা হল তখন থেকেই বস্তুত সেই ঘটনার পর থেকেই আনন্দবাজার সেন্ট পারসেন্ট সুভাষবাবুর পক্ষ নিলেন।

সুভাষবাবুর সঙ্গে আনন্দবাজারের সম্পর্ক গোড়া থেকেই খুব ঘনিষ্ঠ এবং প্রীতিপ্রদ। কাগজ প্রথম প্রকাশের দিকেও তাঁর উৎসাহ ও সহযোগিতার কথা শুনেছি। আমি ১৯৩৭ সালের পর থেকে বলতে পারি, আনন্দবাজার সর্বতোভাবে সুভাষবাবুকে সমর্থন করেছে এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসের ঘটনার পর সুভাষবাবুর পক্ষ নিয়েছে। আনন্দবাজার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। সেসময় কোন একটি দৈনিক ইংরেজি কাগজের উক্তি হচ্ছে, 'আনন্দবাজার সুভাষবাবুর মাউথপিস।' ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর আনন্দবাজার এবং সুভাষবাবু পরস্পরের কাছে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। সেসময় বহুবার তাঁকে আনন্দবাজারে আসতে দেখেছি। তাঁর বহু লেখা আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছে।"[২]

১৯৩৮ সালের ২০ মার্চ উত্তর কলকাতার অধিবাসীবৃন্দের পক্ষ থেকে উত্তর কলকাতা রাষ্ট্রীয় সমিতি সুভাষচন্দ্রকে মানপত্রদান ও অভ্যর্থনার আয়োজন করেছে, ত্রিশহাজার নরনারী সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য জ্ঞাপনের জন্য সমবেত হয়েছেন, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলন নতুন প্রণালীতে পরিচালনা করার প্রস্তাব ও নির্দেশ দিয়েছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৮ সালের ২২ মার্চ, লিখেছে: "কংগ্রেসের মর্যাদা রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য সুভাষচন্দ্র-নির্দেশিত সংস্কার অবিলম্বে সাধিত হওয়া উচিত বলিয়াই আমরা মনে করি।"

১৯৩৯ সালের জানুয়ারিতে সুভাষচন্দ্র আবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত, পট্টভী সীতারামিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়েছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৯ সালের ৩০ জানুয়ারি, সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করে লিখেছে: "ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতি নির্বাচনে সাফল্যলাভে আমরা শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে অভিনন্দন জানাইতেছি। গর্বান্ধ উপদলীয় প্রভুত্ব, সুখসাধ্য নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি-বিলাস এবং ভারত শাসন আইনে পরিকল্পিত সর্বজননিন্দিত যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে অনিচ্ছুক ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপাইবার গোপন চক্রান্ত পর্যুদস্ত হইল বলিয়া আমরা আন্তরিক আনন্দিত।"

কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী একটি বিবৃতি দিয়েছেন, স্পষ্টাক্ষরে তিনি ঘোষণা করেছেন—সুভাষচন্দ্রের জয়লাভে আমারই পরাজয় ঘটেছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, লিখেছে:

"রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে গান্ধীজীর বিবৃতি পাঠ করিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। সহসা মর্মান্তিক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া সমগ্র কংগ্রেসপন্থীদের হতবুদ্ধি ও বিহ্বল করিয়া ফেলিবার এক আশ্চর্য শক্তি মহাত্মাজীর আছে। চৌরীচোরা হইতে

২। সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।

আইন অমান্য আন্দোলন বর্জন পর্যন্ত অনেকবার তিনি এমনিভাবে দেশশুদ্ধ লোককে অপ্রস্তুত করিয়াছেন। আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যখন সরকারী দমননীতির অতর্কিত আঘাতেও কংগ্রেস কর্মীরা প্রাণপণে প্রতিরোধ নীতি আঁকড়াইয়া থাকিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যখন গণ-আন্দোলন কিষাণ-শ্রমিক জাগরণের মধ্য দিয়া রূপান্তরের পথে পদার্পণ করিয়াছে—ঠিক সেই সময় গান্ধীজী আচম্বিতে দুর্নীতির অপবাদ দিয়া আন্দোলন বন্ধ করিলেন, কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছেদন করিলেন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিহার করিয়া হরিজন আন্দোলনের নামে ভারতের পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কারারুদ্ধ, নির্বাসিত, পর্যুদস্ত নেতা ও দেশকর্মীরা, মহান নেতার এই দুর্বোধ্য আচরণে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। আজিকার বিবৃতি পাঠ করিয়া তাঁহার সেই 'দুর্নীতি-ভীতি' এবং স্ববিরোধী আচরণের কথা প্রথমেই মনে পড়িল। তবে এবার গান্ধীজীর আচরণ দুর্বোধ্য হইলেও, তাঁহার অভিপ্রায় অস্পষ্ট নহে।

গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনে ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার রোষজনিত আক্ষেপ বিবৃতির প্রত্যেক ছত্রে প্রকাশিত। ইহাতে বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই। বহু বর্ষ পূর্বে স্বরাজ্য দলপতি দেশবন্ধু-মতিলালের আচরণে ক্ষুব্ধ গান্ধীজী বিবৃতি-মুখে নিজেকে "অবনমিত ও পরাজিত" বলিয়া উষ্মা প্রকাশ করিলেও, কয়েক মাস পরে তিনি স্বরাজীদের সহিত আপোষ করিয়া 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' লিখিয়াছিলেন,—"আমি স্তন্যপানরত শিশুর মত স্বরাজ্য দলের বক্ষে বিরাজ করিব।" আপোষ-রফায় গান্ধীজী অদ্বিতীয়। কাজেই আজ তিনি সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার সমর্থকদের উপর খড়্গহস্ত হইলেও, পুনরায় 'স্তন্যপানরত শিশুর' মত সরল হইবেন, ইহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। তাঁহার অতীত জীবনে এরূপ নজীর আছে।

বর্তমান কংগ্রেস গান্ধীজীর সৃষ্টি। বিশ বৎসরের গান্ধী-কংগ্রেসের প্রত্যেক রূপান্তরে, প্রত্যেক স্তরে, মূলে, শাখায় সর্বত্র তাঁহার অঙ্গুলীর ছাপ। তাঁহার নির্দেশ, পরামর্শ কংগ্রেস অবনত শিরে পালন করিয়া আসিতেছে। দীর্ঘকালের সাহচর্য ও আনুগত্য দ্বারা যাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ, তাঁহারাও বিবিধ মণ্ডলী রচনা করিয়া কংগ্রেস পরিচালনা করিতেছেন। ইঁহাদের কার্যপদ্ধতির ফলে, গণতন্ত্র অপেক্ষা ভক্তিবাদ অধিক প্রশ্রয় পাইয়াছে। এই ভক্তমণ্ডলীর আচরণ কংগ্রেসপন্থীদের পক্ষে বিরক্তিকর ও আপত্তিকর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই তাঁহাদের সুপারিশসম্বল ডাঃ পট্টভীকে পরাজিত হইতে হইয়াছে। কংগ্রেস হইতে গণতন্ত্রকে নির্বাসিত করিবার অসংযত অবিবেচনা পরম্পর প্রদর্শন করিয়া সরদার বল্লভভাই ও তাঁহার সহকর্মীরা কংগ্রেসপন্থীদের অপ্রীতি অর্জন করিয়াছেন। ভোটের ফল তাহারই পরিণতি। গান্ধীজী এই দিক দিয়া কিছু আলোক নিক্ষেপ করিলে আমরা আশা পাইতাম। কিন্তু তিনি উত্তাপ দিয়াছেন বেশী; আলোক দিয়াছেন কম।

গান্ধীজী তাঁহার নিজস্ব নৈতিক মাপকাঠিতে বিচার করিয়া ভূয়া সদস্য, ভূয়া প্রতিনিধির প্রাবল্যে শঙ্কিত হইয়াছেন। সদস্য সংগ্রহ ও প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে কিছু কারচুপি, কিছু ভোটশাঠ্য চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। কংগ্রেসের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে উহাতে বিশেষ ক্ষতি ও কাজের ব্যাঘাত হয় না। সে যাহা হউক, বিশেষ করিয়া সুভাষচন্দ্র ভূয়া ভোট পাইয়াছেন এবং ডাঃ পট্টভী খাঁটি ভোটগুলি পাইয়াছেন, —গান্ধীজীর এই ইঙ্গিতের প্রতিবাদ আমরা দুঃখের সহিত করিতে বাধ্য হইতেছি। দুর্নীতির কথা তুলিলে আমাদের মতে অপরের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তার করাও দুর্নীতি। কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র অথচ কংগ্রেসের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষায় আগ্রহান্বিত গান্ধীজীর সৃষ্ট (১) নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ, (২) হরিজন সেবা সঙ্ঘ, (৩) গান্ধী সেবা সঙ্ঘ, (৪) গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘ—পরস্পরের সহিত ঐক্য ও যোগ

রাখিয়া যেভাবে কংগ্রেসের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া দক্ষিণপন্থী দলকে ধারণ করিয়া আছে—তাহাও একপ্রকার বলপ্রয়োগ এবং সুনীতি নহে।

গান্ধীজী তাঁহার অনুগামীদিগকে কংগ্রেসের কার্যপ্রণালী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ না করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই অসহযোগ ভীতি প্রদর্শন তিনি কাহার বিরুদ্ধে করিয়াছেন? যদি ইহা সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে হয় তাহা লজ্জার। সুভাষচন্দ্র নেতৃত্ব লইয়া গান্ধীজীর প্রতিদ্বন্দ্বী নহেন। তিনি বামপন্থী হইয়াও গান্ধীজীর পরামর্শ মত, কংগ্রেসের সকল দলের অভিপ্রায় মত কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি পরিচালন করিতে ইচ্ছুক। "এতদিন যাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন", এখনও তাঁহারা তাহাই আছেন। বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের তাড়াইয়া দিয়া কংগ্রেস 'ক্যাপচার' করিতে চাহে না;—বরং দক্ষিণপন্থীরাই বামপন্থীদের কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করিতে চাহেন। হরিপুর কংগ্রেসে সরদারজীর দম্ভভরা ভীতিপ্রদর্শন আমরা ভুলি নাই; তাহার পর কথায় কথায় হিংসার প্ররোচনা দানের অভিযোগ তো আছেই। গান্ধীজীর নীতি ও কর্মপদ্ধতি হইতে দূরে সরিয়া যদি নবীনগণের রাজনৈতিক কর্ম ও চিন্তাধারা ক্ষেত্রান্তরে প্রবাহিত হয়, সেজন্য দায়ী গান্ধীপন্থীরা—তাঁহারাই ঝটিকাকে উত্তরীয় প্রান্তে বাঁধিয়া রাখিবার স্পর্ধা প্রকাশ করেন এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনকে স্বীকার করেন না। বল্লভাচারী দলের এই দৌরাত্ম্য ও সংকীর্ণ দৃষ্টিই আজ গান্ধীজীকে পরাজয়ের বেদনায় বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনে তাঁহার এত বিরাগ কেন, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। ডাঃ পট্টভী যদি তাঁহার মনোনীত প্রার্থীই ছিলেন, তাহা হইলে সে কথা তিনি স্বয়ং প্রচার না করিয়া কার্যকরী সমিতির কতিপয় সদস্যকে সুপারিশ-পত্র প্রচার করিতে দিলেন কেন? যিনি দেশ ও জাতির প্রতি সুগভীর অনুরাগবশতঃ নির্লিপ্ত থাকিবার কথা মুখে বলিলেও কার্যতঃ পারেন না, তাঁহার পক্ষে সরলভাবে সবখানি কথা খুলিয়া বলাই সঙ্গত। সুভাষচন্দ্রকে তিনি কেন অযোগ্য মনে করেন? গত এক বৎসর তাঁহার বা বল্লভাচারী দলের এরূপ অভিযোগ করিবার কোন সুযোগ সুভাষচন্দ্র দেন নাই; কার্যকরী সমিতির পরামর্শক্রমেই তিনি কংগ্রেসের কার্য নির্বাহ করিয়াছেন। কাজেই সুভাষচন্দ্রের প্রতি গান্ধীজীর বিরাগ, আকস্মিক আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভ মাত্র।

তাঁহার বিবৃতির শেষ অংশে তিনি 'সুভাষচন্দ্র দেশের শত্রু নহেন' বলিয়া যে নেতিবাচক আশীর্বাণী দিয়াছেন, তাহা অতিমাত্রায় কার্পণ্যদোষদুষ্ট দেখিয়া আমরা লজ্জিত। তাঁহারই আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের বিকাশ ও পরিণতির জন্য সর্বাগ্রে যিনি গর্বপ্রকাশ করিবেন,—সেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাত্মাজীর মহান হৃদয়ে সুভাষচন্দ্রের জন্য স্নেহের পরিবর্তে বিরক্তিই উদ্রিক্ত হইয়াছে. এ চিন্তা কত ক্লেশকর!

গান্ধীজীর এই স্ববিরোধী ও চমকপ্রদ বিবৃতি ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে মত ও আদর্শ লইয়া যদি বিরোধই দেখা দেয়, তবে সে বিরোধকে স্বীকার করিবার মত সৎসাহস ও নৈতিক শক্তি কংগ্রেসের মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। গান্ধীজীর ইঙ্গিত ভবিষ্যতের নানা সম্ভাবনায় পূর্ণ। ডাঃ পট্টভীর পরাজয়কে তিনি কেবল ব্যক্তিগত পরাজয় বলেন নাই—তাঁহার "নীতি ও কর্মপদ্ধতি"র পরাজয়ও বলিয়াছেন,—এই কথার সূত্র ধরিয়া কংগ্রেসপন্থীরা বর্তমান ও ভবিষ্যতের দায়িত্ব বিশেষভাবে চিন্তা করিবেন।"

কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র, ১৯৩৯ সালের ৬ মার্চ, অসুস্থ শরীরে ত্রিপুরীতে এলেন। শরীরে ১০৩° ডিগ্রী জ্বর অতএব শোভাযাত্রা বাতিল হল। ইতিপূর্বে কংগ্রেসের ইতিহাসে-সভাপতির শোভাযাত্রা কখনো

বাদ পড়েনি।

ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশন আরম্ভ হল ১৯৩৯ সালের ১০ মার্চ। এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণ সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৯ সালের ১১ মার্চ, লিখেছে: "রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল এবং কোথাও চিন্তার জড়তা নাই। সহজ, সরল এবং সুস্পষ্টভাবে তিনি তাঁহার বলিষ্ঠ কর্মপন্থা দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। সেই কর্মপন্থায় যেমন দূরদৃষ্টির অভাব নাই, তেমনি বাস্তববাদেরও অভাব নাই। বস্তুতঃপক্ষে বলিষ্ঠ আদর্শবাদের সহিত স্থিরবুদ্ধিপ্রসূত বাস্তববাদের এই আশ্চর্য সমন্বয় তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছে।"

ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ত্রিপুরী কংগ্রেস একটি কলঙ্কিত অধ্যায় সংযোজিত করেছে। মহাত্মা গান্ধী ত্রিপুরীতে আসেননি, কিন্তু তাঁর একান্ত অনুরক্ত ও অন্তরঙ্গ ভক্তেরা মহাত্মা গান্ধীর বকলমে "সত্য ও অহিংসার অস্ত্রে ঘন ঘন শান" দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের প্রতি আক্রোশবশত তাঁরা গান্ধীভক্তির আবরণে গণতন্ত্র বিসর্জন দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছেন। এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁদের অন্ধ গুরুবাদই জয়ী হল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র অন্ধ গুরুবাদে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেননি, ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁর নির্ভীক চরিত্রে কণামাত্র অগৌরবের চিহ্ন পড়েনি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৯ সালের ১২ মার্চ, লিখেছে : "কর্তব্যের আহ্বানে এবং দেশসেবার প্রেরণায় নিজের স্বাস্থ্য বিপন্ন করিয়াও সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী গিয়াছিলেন।...প্রার্থনা করি, সুভাষচন্দ্র সত্বর নিরাময় হইয়া উঠুন। ত্রিপুরী কংগ্রেসে এই পরিচয় তিনি দিয়াছেন যে, বাধা তাঁহার পথরোধ করিতে পারে না, গুরুভার বহনে তিনি ভীত নন এবং অন্ধ গুরুবাদ তাঁহাকে নাবালক করিয়া রাখে নাই। ত্রিপুরী কংগ্রেস আর যাহাই করুক তাঁহার বর্তমান গৌরবময় এবং ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়াছে সে বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় নাই।"

সুভাষচন্দ্র, ১৯৩৯ সালের ২৯ এপ্রিল, কংগ্রেসের সভাপতি পদ ত্যাগ ঘোষণা করেছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৯ সালের ৩০ এপ্রিল, লিখেছে : "কংগ্রেসের মধ্যে যে জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে, রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্মধারায় যে অনিশ্চিত অস্পষ্টতা প্রবেশ করিয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি প্রাণপণ প্রয়াসে চেষ্টা করিয়াছেন। সাময়িক ত্রুটি বা ভুল সত্ত্বেও তিনি কংগ্রেসের ঐক্য ও শক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য বল্লভাচারীদলের সমস্ত ক্রূরতা ও ষড়যন্ত্রের আঘাত, লাঞ্ছনা অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন। দক্ষিণপন্থীরা রাষ্ট্রপতিকে অপদস্থ করিতে গিয়া নিজেরাই অবনমিত হইলেন এবং দেশবাসীর চিত্তে এবং জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের আসন সগৌরবে অক্ষুণ্ণ রহিল। একনায়কতন্ত্র এবং বর্তমান সমস্যার অনুপযোগী আধ্যাত্মিক-কাম নৈতিক দুর্বোধ্য কর্মপদ্ধতির বন্ধন হইতে কংগ্রেসের মুক্তির দিন আসন্ন হইল। দীর্ঘকাল পর দুঃসাহসী সুভাষচন্দ্র আধ্যাত্মিক মোহজাল ছিন্ন করিয়া নিয়মতান্ত্রিক ক্রমাবনতির স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিলেন। নব্য ভারতের রাজনীতি এইবার আধ্যাত্মিকতার শূন্য হইতে বাস্তবের ভূমিতে নামিয়া আসিবে।"

অতঃপর 'ফরোয়ার্ড ব্লকে'র কথা এসে পড়ে। 'ফরোয়ার্ড ব্লকে'র কর্মশক্তি ত্রিধা-বিভক্ত : কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী শক্তিসমূহের সংহতি, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নবপ্রেরণার সঞ্চার এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সম্প্রসারণ।

সুভাষচন্দ্র, ১৯৩৯ সালের ৩ মে, বলেছেন—সাধারণত দল বলতে যা বোঝায়, 'ফরোয়ার্ড ব্লক' বলতে তা বোঝাবে না। যাঁরা এই ব্লকের কার্যক্রম অনুমোদন ও গ্রহণ করবেন, 'ফরোয়ার্ড ব্লক' শব্দে তাঁদের মিলনক্ষেত্র বোঝাবে। তাছাড়া কংগ্রেসের অন্তর্গত অসংহত প্রগতিপন্থী দলসমূহ এবং বর্তমান বামপন্থী দলসমূহের সকলেই অবাধে

এই 'ফরোয়ার্ড ব্লকে' যোগ দিতে পারবেন।

কিন্তু 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে আলাদা দল হলে কংগ্রেসে ভাঙন আরম্ভ হবে না? এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র, ১৯৩৯ সালের ৩ মে, বলেছেন—গান্ধী সেবা-সঙ্ঘ গঠনে কি কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে, 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠনেই বা তা হবে কেন?

হাজরা পার্কের জনসভায় সুভাষচন্দ্র, ১৯৩৯ সালের ৬ মে, জানিয়েছেন—কংগ্রেসের মধ্যে থেকে এই 'ফরোয়ার্ড ব্লক' সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৯ সালের ৮ মে, লিখেছে : "পদত্যাগের পর সুভাষচন্দ্রের নূতন কর্মপন্থার সূচনা দেখা যাইতেছে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠনে।...সুভাষচন্দ্রের এই নূতন উদ্যম একদিকে যেমন এক পক্ষের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি অনেকের আশার স্থল হইয়াছে। নিয়মতান্ত্রিকতার বাঁধা পথের নিশ্চিন্ত বিচরণের প্রলোভনে ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যে মডারেট মনোবৃত্তির ক্রমশঃ প্রসার হইতেছে, তাহার গন্তব্যস্থল কোথায় হইতে পারে ভাবিয়া ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী একটা উদ্বেগের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। সেই উদ্বেগের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আবার নূতন সংগ্রামের ক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইবার জন্য মানুষের মনে একটা অধীরতাও জাগিয়াছে। ঠিক সেই কারণেই সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ জনসাধারণের চিত্তে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে। 'ফরোয়ার্ড ব্লকে'র অভ্যুদয়ের সহিত সেই আশার সাফল্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।"

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ও কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৯ সালের ৮ জুলাই, লিখেছে : "আনন্দবাজার পত্রিকা অবগত হইয়াছেন যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি হিসাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদককে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে 'সত্যাগ্রহ' সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিয়া আগামী ৯ই জুলাই কলিকাতায় একটি জনসভা আহ্বান করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।"

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ও কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ করে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তার প্রতিবাদে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে, ১৯৩৯ সালের ৯ জুলাই, এক বিপুল জনসভা হয়। কেবলমাত্র কলকাতায় নয়, একই দিনে একই উদ্দেশ্যে ভারতের সর্বত্র জনসভা হয়েছে: মাদ্রাজে, পাটনায়, পুণায়, বোম্বাইতে। "বোম্বাইয়ে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে যে বিরাট জনসভা হয়, তাহাতে সভাপতি শ্রীযুক্ত বসু বৃটিশ সরকারকে চরম পত্র দেওয়ার কল্পনার কথা পুনরায় উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে যে ঝোঁক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বাধা না দিলে কংগ্রেস আর সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান থাকিবে না। এই সম্পর্কে তিনি কংগ্রেসের নীতি ও কার্যক্রম নূতন করিয়া নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন।"

সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালের ১০ জুলাই, বলেছেন—কংগ্রেসের গতি বিপ্লবের পথে ঘুরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই 'ফরোয়ার্ড ব্লক' সৃষ্ট হয়েছে। বামপন্থী শক্তি এখন সঙ্ঘবদ্ধ নয় বলে কংগ্রেস তাদের বিপর্যস্ত করে দিতে পারে, তাই বামপন্থী শক্তিনিচয়কে সংহত করার উদ্দেশ্যেই 'ফরোয়ার্ড ব্লকে'র সৃষ্টি।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, ১৯৩৯ সালের ১১ অগাস্ট, ঘোষণা করেছে যে গুরুতর নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পদের অযোগ্য এবং ১৯৩৯ সালের অগাস্ট মাস থেকে তিন বছরের জন্য তিনি কোনো

নির্বাচিত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হতে পারবেন না। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৯৩৯ সালের ১২ অগাস্ট লিখেছে: "সুভাষচন্দ্রকে যেদিন অশোভনীয় ধৃষ্টতার সহিত রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল,—সেদিন নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির বল্লভাচারী সদস্যদের চোখে-মুখে যে আনন্দের দীপ্তি দেখিয়াছিলাম,—তাহা কংগ্রেসের গৃহদাহের অনলশিখার প্রতিচ্ছবি। ত্যাগে, নিরলস দেশসেবায়, কর্মগৌরবে যে সুভাষ-চন্দ্র দীর্ঘকাল বৃটিশ শাসকগণের দুশ্চিন্তার স্থল—কারাগারে, নির্বাসনে, দেশান্তরে প্রেরণ করিয়াও শাসকবৃন্দ যাঁহার মেরুদণ্ড বক্র করিতে পারেন নাই, আজ তিনি কংগ্রেসের জাতীয় স্বাধীনতাকামী নেতৃবৃন্দের দুশ্চিন্তার স্থল এবং তাঁহাকে দেশ-বাসীর সম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করিতেই হইবে!! ইতিহাসে অন্যত্র রাজনীতিক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল না হইলেও,—পরাধীন বিজিত জাতির অল্পদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে ইহা এক বর্বরসুলভ নির্লজ্জ অভিনয়। অহিংসা ও সত্যের নামে শপথকারী নেতাদের দুর্মতি আজ ছিন্নবল্গা অশ্বের মত আত্মঘাতী গতিবেগে পতনের গহবর লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে,—ইহার গতিরোধ করিবার মত শক্তি আর কতদিন জাতির বাহুতে প্রসুপ্ত হইয়া থাকিবে!"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৯ সালের ১৪ অগাস্ট, লিখেছে: "মানবজীবনের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ কামনা, মহৎ সাধনা তাহা দিয়া আমরা কংগ্রেসকে মহীয়ান করিয়াছি; অতএব কংগ্রেসের প্রতি আমাদের মমত্ববোধ, আনুগত্য এবং অনুরাগকে প্রশ্ন করিতে পারেন, সন্দেহ করিতে পারেন, এমন স্পর্ধা যিনি বা যাঁহারা দেখাইবেন তাঁহাদের চৈতন্য সঞ্চারের শক্তিও আমরা রাখি। তাই আজ আমরা যেমন ভীত হইব না, তেমনি চঞ্চলও হইব না। আমাদের স্বাধীনতালাভের অনিবার্য আকাঙ্ক্ষাকে কর্মের মধ্যে, চিন্তা ও চরিত্রের মধ্যে রূপান্তরিত করিবার জন্য দুঃসাধ্য উদ্যমে ব্রতী সুভাষচন্দ্রকে আজ আমরা সপ্রেম আনুগত্য দ্বারা প্রবলের লাঞ্ছনা এবং বল্লভাচারী দলের পাটোয়ারী বুদ্ধির অমর্যাদা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব এবং জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রত্যেক সদস্য যে চেষ্টায় বাঙলা এবং ভারতের পথপ্রদর্শক হইবেন।"

রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে ওয়ার্কিং কমিটি এক অধিবেশনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে অপসারিত করেছে। বঙ্গীয় কংগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব নির্মূল করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। ওয়ার্কিং কমিটির এই জুলুমের বিরুদ্ধে সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে, ১৯৩৯ সালের ১৮ অগাস্ট, কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে বিরাট জনসভা হয়েছে।

সেই সভায় সুভাষচন্দ্র বলেছেন—আজ আমি প্রকাশ্যভাবে বলছি, মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির উদ্দেশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করা। গুরুত্ব উপলব্ধি করেই একথা বলছি। নানারকম খবর ও প্রমাণ পাওয়ার পর আমি একথা বলছি এবং বলবার সময় তার গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছি। এ অবশ্য গুরুতর অভিযোগ। জেনেশুনেই এই অভিযোগ করছি। প্রকৃতপক্ষে এরকম উদ্দেশ্য সামনে রেখে তাঁরা যদি কাজ না করতেন তাহলে আজ কংগ্রেসে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার নামে যে স্বেচ্ছাচারিতা চলছে তার প্রয়োজন হত না।...আজ ক্ষমতার খানিকটা আস্বাদ পাওয়ায় তাঁরা সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ-রফার পথে চলেছেন! তাই পথের বাধা দূর করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়েছেন। মানুষের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। ক্ষমতালোলুপ হলে মানুষ সব কিছু করতে পারে। সংবাদপত্রে দেখি—হিটলার তাঁর বিরোধী দলের সঙ্গে কীরকম নির্মম ব্যবহার করেছেন। স্ট্যালিন, চিয়াং-কাইশেকের ব্যবহারের কথাও আপনারা জানেন। অন্য দেশের সম্বন্ধে সংবাদপত্রে

যা পড়েছি নিজের দেশে তা স্বচক্ষে দেখছি। এখানে অবশ্য নীতি অহিংস। কংগ্রেসীদের ব্যবহার যতই নির্মম হোক না কেন তা অহিংস।

সেদিন সুরেশচন্দ্র মজুমদার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছেন—সুভাষচন্দ্রের চেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করতে হলে তাঁকে শক্তিদান করা প্রয়োজন। যদিও তাঁর মধ্যে প্রাদেশিকতার লেশমাত্র নেই তথাপি বাঙলাদেশকে কেন্দ্র করেই আন্দোলন সুরু করতে হবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির পদ থেকে সুভাষচন্দ্রকে তিন বছরের জন্য অপসারিত করা হয়েছে। পদত্যাগপত্র দাখিল করার সামান্য সম্মান পর্যন্ত তাঁকে দিতে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ রাজি নন। বাঙলাদেশে বত্রিশটি জেলা সমিতি এবং বহু মহকুমা ও প্রাইমারী কংগ্রেস কমিটি আছে। তাঁদের নির্বাচিত সভাপতিকে সভাপতির পদ থেকে অপসারিত করা কি তাঁরা সহ্য করবেন? তাঁর শূন্য পদে আর কেউ সভাপতি হোন, তা কি আপনারা ইচ্ছা করেন? যদি মনে করেন, তাঁর শূন্য সিংহাসন অধিকার করার লোক নেই তাহলে একথা জানিয়ে দিন, কংগ্রেসের ভিতরে কি বাইরে তাঁর শূন্য সিংহাসনে কাউকে বসতে দেবেন না, বাঙলাদেশে বেসুরো বাঁশি তো বেজেই আছে। ত্রিপুরী থেকেই সেই আওয়াজ উঠেছে। সোদপুরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এবং কলকাতার দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে সুভাষবাবু ওয়ার্কিং কমিটির ১৪।১৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩ জন বামপন্থীকে নেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁরা তাতেও রাজি হননি। তখন আমরা মনে করেছিলাম বাঙলাদেশে এমন লোক পাওয়া যাবে না যারা ওয়ার্কিং কমিটিতে যেতে রাজি হবে। লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় বাঙলাদেশের মধ্য থেকে সেখানে লোকের অভাব হয়নি, তাঁরা হচ্ছেন—ডাঃ বিধান রায় ও ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ।...এটা গুরুতর বিষয় যে এঁরা বাঙলার প্রতিনিধিস্বরূপ ওয়ার্কিং কমিটিতে আছেন। কোনো কোনো সংবাদপত্রে বড়ো-বড়ো হরপে বেরিয়েছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় এঁরা নিরপেক্ষ ছিলেন। যদি তাঁরা অংশগ্রহণ না করবেন তবে ওয়ার্কিং কমিটিতে গিয়েছিলেন কেন? যদি তাঁরা মনে করতেন সুভাষচন্দ্রের উপর অন্যায় হয়েছে তবে তাঁরা চুপ করে বসেছিলেন কেন? ওয়ার্কিং কমিটির বাঙলার সদস্য হিসেবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার জন্য আমি তাঁদের দায়ী করি। তাঁরা বুঝিয়ে দিন কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাব্লিক পার্কে এসে তাঁরা বারোজন লোকের সামনেও উপস্থিত হতে সাহস করেন না কেন? এই ধরনের প্রতিনিধি থাকলে বাঙলার আশা-ভরসা কোথায়? উত্তর কলকাতার কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন আসন্ন। এমন লোককে কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত করুন যাঁরা সুভাষচন্দ্র ও ফরোয়ার্ড ব্লককে শক্তিশালী করবেন। কে কী করছে লক্ষ্য করলে ঝুটা খাঁটি বুঝতে পারবেন।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৯ সালের ২০ অগাস্ট, লিখেছে: "সুভাষচন্দ্র নামে সভাপতি থাকুন আর নাই থাকুন, তাহাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। কেননা, সম্মিলিত বল্লভাচারী দলের এমন শক্তি নাই যে, তাঁহাকে আজ বাঙ্গলার কংগ্রেসের প্রধান নেতার পদ হইতে অপসারিত করিতে পারেন। কোন পদে না থাকিয়াও যাঁহারা জনমত ও গণ-আন্দোলন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন, সুভাষচন্দ্র সেই অল্পসংখ্যক নেতার অন্যতম।"

১৯৩৯ সালের ১৯ অগাস্ট 'মহাজাতি সদনে'র ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। 'মহাজাতি সদনে'র সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের নাম অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত। এই বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের উৎসাহ ও উদ্যমের কথা স্মরণ করে 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৯ সালের ২০ অগাস্ট, লিখেছে: "বাঙ্গলার স্বাধীনতা-আন্দোলনকারীরা বহুদিন হইতে একটি অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছেন। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়—"ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা

আপ্রাণ চেষ্টা এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করে আসছেন, তাঁরা অনেকদিন থেকে একটি অভাব বোধ করে আসছেন; সে অভাব একটা গৃহের, যেখানে তাঁদের যাবতীয় সেবাকার্য আশ্রয় পেতে পারে এবং যেটা তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও আদর্শের একটা বাহ্য প্রতীকস্বরূপ হতে পারে।" ইতিপূর্বেও বাঙলার নেতা ও কর্মীরা এইরূপ একটি জাতীয় ভবন প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের চেষ্টা সফল হয় নাই। সুভাষচন্দ্র যে নূতন উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া পুনরায় সেই কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, এজন্য তিনি জাতির ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার উদ্যম সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করুক, সকলেই এই কামনাই করিবে।"

১৯৪০ সালের ৩ মার্চের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে: "শনিবার (২ মার্চ ১৯৪০) তুফান মেলে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে সাতরায় যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে তাঁহারা মোটরযোগে মথুরা এবং যুক্তপ্রদেশের আরও কয়েকটি স্থানে সফর করিবেন।"

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কয়েকদিন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যুক্তপ্রদেশে যাপন করেছেন। 'যুক্তপ্রদেশে সাতদিন' নামে একটি রচনায় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ও সুভাষচন্দ্রের এই ভ্রমণের ইতিহাস জীবন্ত করে রেখেছেন। রচনাটি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ১৯৪০ সালের ১১—১৪ মার্চ প্রকাশিত হয়েছে।

তারপর রামগড় কংগ্রেসের কথা। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে আপোষ প্রচেষ্টার পক্ষপাতী। কিন্তু সুভাষচন্দ্র আপোষ-বিরোধী। রামগড়ে, ১৯৪০ সালের ১৯ মার্চ, কংগ্রেস ও আপোষবিরোধী সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশন হল। একদিকে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। আরেকদিকে নিখিল ভারত আপোষবিরোধী সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন সুভাষচন্দ্র।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ, লিখেছে:

"রামগড়ের জঙ্গলে কয়দিনের জন্য মজহরপুরী ও কিষাণনগর এক অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। একদিকে মহাত্মা গান্ধী কি জয় এবং অপরদিকে সুভাষচন্দ্র কি জয় শব্দে সেখানকার এতদিনের নিস্তব্ধ আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সভাপতি-দ্বয়ের মিছিলে, নেতৃবৃন্দের অভ্যাগমে, প্রতিনিধি ও দর্শকগণের কর্মব্যস্ততায় রামগড়ের আবেষ্টন রাতারাতি বদলাইয়া গিয়াছিল।...

রাজনৈতিক ঊর্ধলোকের দেবতাবৃন্দ স্বভাবতঃই সুভাষচন্দ্রের উপর প্রীত নহেন؛ সুভাষচন্দ্রকে তাঁহারা অপাংক্তেয় এবং জাতিচ্যুত করিয়াছেন। তাঁহার কংগ্রেসে আসিবার উপায় নাই। ত্রিপুরীতে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে তাঁহারা সমবেতভাবে যে নাজেহাল করিয়াছিলেন, শাস্তিবিধানের কল্যাণে সুভাষচন্দ্রের সাধ্য নাই রামগড়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থাকিয়া সেই আচরণের প্রতিদান দেন। কিন্তু তথাপি নিষ্কৃতি নাই। কংগ্রেসের বাহির হইতে জনমতমাত্রসম্বল সুভাষচন্দ্র যে তাঁহাদের কতখানি উষ্মা ও উত্তেজনার কারণ হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার উত্তাপ হইতে সহজেই অনুমান করা যায়।

পণ্ডিতজী সুভাষচন্দ্র অথবা স্বামী সহজানন্দের নামোল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু "যাঁহারা অবিলম্বে এবং আজই সংগ্রাম চাহেন" তাঁহাদিগকে "বিপ্লববিরোধী", "রাজনৈতিক সুবিধাবাদী" "সন্ত্রাসবাদী" "একগুঁয়ে" প্রভৃতি বিবিধ মুখরোচক আখ্যায় অভিহিত করিয়া মনের ঝাল মিটাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেসের প্রস্তাবের পরে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার অবকাশ রহিল না؛

"মুষ্টিমেয়" একদল বিপথগামী লোক অতিরিক্ত উৎসাহে নিজেদের জিদে চলিতে গিয়া সৈন্যবাহিনীতে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া থাকে। "এই শ্রেণীর উৎসাহী লোকেরা বিপ্লব-বিরোধী ও বিদ্রোহী।" ইহাদের ভাগ্যান্বেষী বলিলেই সংগত হয়। ইহারা সন্ত্রাসবাদী অপেক্ষা কোন অংশে উন্নত নয় এবং যুক্তি অপেক্ষা সস্তা ভাবালুতার দ্বারাই বেশী চালিত হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ইহারা শুধু চীৎকারের সাহায্যেই ভারতের জটিল সমস্যাজাল ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

পণ্ডিতজীর এই সুতীক্ষ্ণ শরজাল যে কাহাদের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও বোঝা যায়। সুভাষচন্দ্র ও পণ্ডিতজীর মধ্যে যে মতভেদ আছে তাহা সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতাতেও অস্পষ্ট নয়। তাই বলিয়া সুভাষচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতার কোথাও প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিবার জন্য এই শ্রেণীর অশোভন বিশেষণের সাহায্য লন নাই। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিত কোথায় তাঁহার মতভেদ এবং সেই মতভেদেরই বা কারণ কি, যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে তাহাই তিনি সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকদের নিকট বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু কোথাও কাহারও প্রতি কটূক্তি বর্ষণ বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। "ভারতের উচ্চস্তরের বুদ্ধিবৃত্তির যে খ্যাতির" জন্য পণ্ডিতজী গর্ব অনুভব করিয়াছেন, আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা সেই খ্যাতি অনেকখানি ম্লান করিবে। বোঝা যাইতেছে, প্রতিপক্ষকে কাবু করিবার কার্যে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁহার "ইনটেলেক্টের" উপর ভরসা করিতে না পারিয়াই এই সুলভ এবং সনাতন পন্থার আশ্রয় লইয়াছেন।

আমরা জানি, মহাত্মাজী ইহার ঊর্ধ্বে। তাঁহার উক্তি সাধারণতঃ স্পষ্ট এবং শান্ত: যে শান্তি এবং যে স্পষ্টতা তাঁহার অন্তরলোক উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজিত, তাহাই তাঁহার বাক্যেও প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই দ্বিতীয়বার তাঁহাকেও অধৈর্য ও উত্তপ্ত হইতে দেখা গেল। প্রথমবার দেখিয়াছিলাম, সুভাষচন্দ্রের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর যখন তিনি ডাঃ সীতারামিয়ার পরাজয়কে নিজের পরাজয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়বার দেখিলাম, রামগড় কংগ্রেসে। রামগড়ের বক্তৃতায় যে উত্তাপ এবং আত্মপ্রচারের প্রয়াস দেখা গিয়াছে তাহা আর কখনও দেখা যায় নাই।

ভারতের জনগণের তিনিই যে অধিনায়ক একথা কে কবে অস্বীকার করিয়াছে? এমন কি "বিদ্রোহী" ও "ভাগ্যান্বেষী" সুভাষচন্দ্রও কোনদিন সেকথা বলেন নাই। তিনি জনগণের অধিনায়ক বলিয়াই ত তাঁহার উপর এত চাপ? সেইজন্যই ত মজহরপুরীর পাশে কিষাণনগর বসিয়াছে। সুভাষচন্দ্র ত তাঁহার সিংহাসন কাড়িয়া লইতে চাহেন না, তাঁহারই অধীনে সামান্য সৈনিক হইয়া কাজ করিতে চাহেন। তাঁহাদের বলিবার কথা, দেশ প্রস্তুত। ইহা নিশ্চয়ই বিদ্রোহ নয়, ভাগ্যান্বেষণও নয়। ইহা নিশ্চয়ই বিপ্লবের বিরোধিতা নয়, সন্ত্রাসবাদও নয়। ইহার মধ্যে অশ্রদ্ধারই বা চিহ্ন কোথায়?

কংগ্রেসের দেবতাবৃন্দ তথাপি তাঁহার উপর প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। তাঁহারা শ্রদ্ধা চান নাই, চাহিয়াছেন অকুণ্ঠিত আত্মসমর্পণ (যাহা নিশ্চয়ই উচ্চাঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক নয়)। কংগ্রেসেরই একান্ত সন্নিকটে আর একটা সম্মেলনের সাফল্য যে কংগ্রেসের সাফল্যকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। যাঁহাকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে, জনতার কাছে তাঁহার সমাদর চক্ষে লাগে। যে সম্মেলন একটা বনিয়াদী সম্মেলনের ভিত্তিকে পর্যন্ত এমন জোরে নাড়া দিতে পারে, তাহাকে অস্বীকার করা যায় না, উপেক্ষাও করা যায় না। মনের মধ্যে তাহা যে উত্তাপের সৃষ্টি করে, তাহাতে মনের স্থৈর্য রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। মহাত্মাজী এবং পণ্ডিতজীর বক্তৃতায় তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।"

উত্তরকালে হেমন্তকুমার বসু বলেছেন: "সুভাষচন্দ্রের যে সংগ্রাম, তার শেষার্ধে আনন্দবাজার তাঁকে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছে। সুরেশদার সঙ্গে সুভাষবাবুর

ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে অনেকেই নাচানাচি করেছেন, কিন্তু এরকম নীরব সমর্থণ ও সহযোগিতার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল।"[৩]

সুভাষচন্দ্র বসু, ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ লিখেছেন: "আনন্দবাজার পত্রিকা এবার ১৯শ বর্ষে পদার্পণ করিল। ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। আনন্দবাজার চিরকাল জাতীয়তাবাদের সমর্থক ও প্রচারক। দেশবাসীর নিকট আনন্দবাজার স্বাধীনতার বাণী যেরূপ নির্ভীকতার সহিত প্রচার করিয়া আসিতেছে তাহা বাঙ্গালীর এবং বাঙ্গালীর সাংবাদিকের পক্ষে খুবই গৌরবের কথা। প্রবল বাধাবিঘ্ন এবং রাজরোষের ভ্রূকুটি—কিছুতেই আনন্দবাজার বিচলিত হয় নাই। সম্পাদক কারারুদ্ধ হউন অথবা টাকা বাজেয়াপ্ত হউক—তাহাতে আনন্দবাজারের চিন্তার ধারায় কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সংবাদপত্র হিসাবেও আনন্দবাজার যে সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের মধ্যে আনন্দবাজারের প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এতটা সাফল্য এবং এতটা প্রতিষ্ঠা এইজন্য সম্ভব হইয়াছে যে বাঙ্গালীমাত্রই আনন্দবাজারকে ভালবাসে। আনন্দবাজার তাই আজ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। আমি এই পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করি এবং আশা করি দেশসেবায় আনন্দবাজার পূর্ব্ববৎ ঐকান্তিক নিষ্ঠা, দৃঢ়সঙ্কল্প ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিবে।"[৪]

১৯৪০ সালের ২ জুলাই সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন। "গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী কমিশনার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ও নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার এলগিন রোডস্থ ভবনে ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারানুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়াছেন।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৪০ সালের ৩ জুলাই লিখেছে:

"সুভাষচন্দ্রকে সহসা এইভাবে আটক করিবার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। হলওয়েল মনুমেণ্টরূপে ঐতিহাসিক মিথ্যাকে অদূরদর্শী সাম্রাজ্যবাদীরা গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বিজিত জাতির চিত্তে হীনতাবোধ এবং বিজয়ীর শ্রেষ্ঠত্ব মহিমা জাগ্রত করিবার এইরূপ আরও অনেক স্তম্ভ, মূর্তি ইত্যাদি বিগত যুগের ইংরাজ শাসকেরা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন যাহার জন্য অবশ্যই অদ্যকার দিনের ইংরাজ শাসকগণ দায়ী নহেন। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের মন যখন বদলায় তখন এই সকল দর্প দম্ভের ও জাতীয় অবমাননার স্মৃতি নেপথ্যে সরাইয়া ফেলাই ভালো। হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের আন্দোলন সত্যাগ্রহের আকারে দেখা দেয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। ঐ সময় কয়েকজন কংগ্রেসীকর্মী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তারপর নানা কারণে আন্দোলন নিভিয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমানের মিলিত দাবী প্রত্যাহৃত হয় নাই: গত দুই তিন বৎসর হইল এই বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছে। বাঙ্গলার আইনসভাতেও ইহা লইয়া প্রশ্নোত্তর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডল দাবীর বৈধতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও টালবাহানা করিয়া সময়ক্ষেপ করিতেছিলেন। এই সময় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ও সমর্থনে স্মৃতিস্তম্ভটি অপসারণের আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করা হয়।... এই আন্দোলনের অতীত ও বর্তমান ব্যাপারগুলি পর্যালোচনা করিয়া সুভাষচন্দ্রের যুক্তি সর্বসাধারণের নিকট সমীচীন মনে হইবে।

আমাদের এখনও মনে হয় যে-সমস্যার সমাধান সহজ ও সরলভাবে করিলে শোভন হইত,—তাহার জন্য সুভাষচন্দ্রের ন্যায় জননায়ককে গ্রেপ্তার ও আটক করিয়া দেশব্যাপী একটা অসন্তোষ জাগ্রত করা কোনোক্রমেই উচিত ছিল না। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই দেশের আমলাতন্ত্র সর্বদাই সাধারণ মানববুদ্ধির দুরধিগম্য উপায়ে সকল সমস্যাকেও

৩। হেমন্তকুমার বসুর সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
৪। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ মার্চ ১৯৪০।

জটিল করিয়া তোলেন। প্রধান মন্ত্রী হক্ সাহেব যদি অতিরিক্ত পুলিশী উৎসাহ সংযত করিয়া সহৃদয়ভাবে সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহেন তাহা হইলে অবিলম্বে সুভাষবাবুকে মুক্তি দিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করাই শ্রেয়ঃ। আমরা এইরূপ সম্ভাবনার জন্য প্রতীক্ষা করিব।"

সুভাষচন্দ্র, ১৯৪০ সালের ২৯ নভেম্বর থেকে, প্রেসিডেন্সি জেলে অনশন ধর্মঘট করেছেন। জেল থেকে মুক্তি পেলেন ১৯৪০ সালের ৫ ডিসেম্বর; জেলগেটের বাইরে এসে অনশন ভঙ্গ করলেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য সুভাষচন্দ্র অ্যাম্বুল্যান্সে করে এলগিন রোডের বাড়িতে এলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৪০ সালের ৬ ডিসেম্বর, লিখেছে:

"শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মুক্তির সংবাদে দেশে আনন্দের সাড়া পড়িবে। গত ২রা জুলাই হলওয়েল মনুমেণ্ট সত্যাগ্রহের সময় তিনি ধৃত হন। এখনও তাঁহার নামে দুইটা মামলা ঝুলিতেছে। কারাগারে তাঁহার অসুস্থতার সংবাদে দেশে, বিষম উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছিল। আমরা আশা করি, পূর্ণ বিশ্রামের পর শীঘ্রই তিনি তাঁহার হৃত স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবেন এবং পুনরায় দেশের কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারিবেন। শেষোক্ত সম্ভাবনা অবশ্য তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত মামলা দুইটির ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছে।"

সরোজকুমার সেন তখন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অন্যতম সাংবাদিক। উত্তরকালে তিনি বলেছেন:

"রাত তখন তিনটে। সুরেশচন্দ্র মজুমদার আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি, তিনি বসে আছেন, ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় চুরুটে টান দিচ্ছেন হাওড়া ফরোয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারি হরেন্দ্রনাথ ঘোষ। সুরেশবাবু আমাকে বললেন— আজ আমি এখনি একটা চাঞ্চল্যকর খবর দেব। আপনি নিজে খবরটি লিখে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কম্পোজ করাবেন। সুরেন চন্দকে বলবেন হিন্দুস্থানে ইংরেজী করে দিতে।। প্রুফটাও আপনি দেখে দেবেন। খবরের বিষয় কাউকে কিছু বলবেন না। আমি একটা টেলিফোনের জন্য অপেক্ষা করছি। টেলিফোনটা এলেই খবরটা পেয়ে যাবেন।

কিছুক্ষণ পরে সুরেশবাবু আমাকে সংবাদটি দিলেন। সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগের সংবাদ। সুরেশবাবু যেমন বললেন আমি তেমনি লিখে নিলাম। সুরেশবাবু লেখাটি দেখলেন, অনুমোদন করলেন, আমি প্রেসে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লেখাটি কম্পোজ করালাম।"[৫]

১৯৪১ সালের ২৭ জানুয়ারির (সোমবার) 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পঞ্চম পৃষ্ঠায় 'শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু অপ্রত্যাশিতভাবে গৃহত্যাগ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে:

"গত রবিবার অপরাহ্ণ হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার বাসভবনের কক্ষে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনবর্গের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি দিবারাত্র এই কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন।

সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গত কয়েকদিন যাবৎ তিনি সম্পূর্ণ মৌনাবলম্বন করেন এবং সকলের সহিত এমন কি আত্মীয়স্বজনের সহিতও দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া ধর্মচর্চায় সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া উদ্বেগের মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোন ফল হয় নাই এবং সংবাদ ছাপিতে দেওয়ার

৫। সরোজকুমার সেনের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।

সময় পর্যন্ত তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন নাই বলিয়া জানা গেল।"

সেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' ছাড়া আর কোথাও সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগের সংবাদ প্রকাশিত হয়নি।

'অমৃতবাজার পত্রিকা', ১৯৪১ সালের ২৮ জানুয়ারি, লিখেছে: In any event the Calcutta public knew nothing of the disappenrance till they read of it the following morning in the two party papers of Srijut Bose. We had no information about it, not, we believe, any other paper. The news appeared only in the *Hindusthan Standard* and the *Ananda Bazar Patrika*."

'ফরোয়ার্ড', ১৯৪১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, লিখেছে:

"In spite of the fact that in recent years, ours and Subhas Babu's political principles have been as poles asunder, we share the grief of his relatives and friends. But the manner in which the news of the first discovery of the disappearance was disseminated does not warrant much seriousness being attached to the incident. Were Subhas Babu's people taken very much by surprise by the discovery, news would be published through agencies other than the two family organs."

উত্তরকালে ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় বলেছেন: "সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সময়ও সুরেশ মজুমদার মশাই সক্রিয় দায়িত্ব পালন করেছেন"[৬]

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সুরেশচন্দ্রের নিবিড় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে হেমন্তকুমার বসু, ১৯৫৮ সালের ১২ অগাস্ট বলেছেন: "নেতাজীর ভারত ত্যাগের কালে যাঁরা তাঁকে অর্থদান করেছিলেন, তন্মধ্যে সুরেশচন্দ্র অন্যতম। তদানীন্তন সরকারও উপলব্ধি করেছিলেন, নেতাজীর অন্তর্ধানের মূলে ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু ও সুরেশচন্দ্র মজুমদার।"

সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগের কিছুকাল পরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৪১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি, সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজী সম্পর্কিত একটি তাৎপর্যময় সম্পাদকীয় রচনা প্রকাশ করেছে। উক্ত রচনা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি:

"বর্তমান আন্দোলনে বাঙ্গলা যাহাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে পারে, তাহার জন্য সুভাষচন্দ্র বাঙ্গলার গৃহবিরোধ মিটমাট করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন, ডিক্টেটার হওয়ার পর মহাত্মাজী অতি সহজেই তাহা মিটমাট করিয়া ফেলিবেন। শেষ পর্যন্ত যখন মৌলানা আবুল কালাম আজাদের শৃঙ্খলার স্টীম রোলার দ্বিগুণ উদ্যমে গড়াইতে লাগিল এবং মহাত্মা নীরব থাকিয়া প্রকারান্তরে তাহা সমর্থনই করিতে লাগিলেন, তখন মিটমাটের আশা কমিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু হতাশ হন নাই। তারপরও তিনি বিনাসর্তে, সমস্ত মতানৈক্য সত্ত্বেও, বর্তমান আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য যেভাবে মহাত্মাজীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই মত কর্মযোগীর পক্ষেই সম্ভব।...

যাঁহাকে দমন করিবার জন্য মহাত্মাজী এবং তাঁহার অনুরক্ত পার্ষদেরা কংগ্রেসের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই, তিনি আজ নিগ্রহ অনুগ্রহের বাহিরে।

৬। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।

আজ ভাবিবার বিষয় শুধু এই যে, ডিক্টেটারীর মোহে মহাত্মাজী কংগ্রেসকে যে অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, তাহার ফল কংগ্রেসের পক্ষে শুভ হইবে, কি অশুভ হইবে। নেতৃত্বরক্ষার জন্য যেখানে একমাত্র কার্য মহাত্মার নিকট নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করা, সেখানকার আবহাওয়া আত্মশ্রদ্ধা জাগ্রত করার পক্ষে কতখানি অনুকূল তাহাও ভাবিবার বিষয়। বস্তুতঃ মহাত্মার অবর্তমানে নোঙরবিহীন নৌকার মত অবস্থা ঘটাও কংগ্রেসের পক্ষে আশ্চর্যজনক নয়। মহাত্মার অনুগ্রহে তাঁহার ছত্রচ্ছায়াতলে বসিয়া কোন প্রকার দায়িত্বের বোঝা না লইয়া এবং কোন প্রকার মৌলিক চিন্তার আয়াস স্বীকার না করিয়া যাঁহারা রাজপদে মন্ত্রিপদে বিরাজিত আছেন, তাঁহাদের পক্ষেও সেদিন চক্ষে অন্ধকার দেখা বিচিত্র নয়। ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মাজীর দানের তুলনা নাই; তাঁহার কাছে ভারতের ঋণ আজ পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসের এই মর্যাদা, এই প্রতিষ্ঠা এবং এই কর্মশক্তি,—ইহাও তাঁহারই সৃষ্টি। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, তাঁহার এই বিরাট সৃষ্টির অভ্যন্তরে তিনি নিজেই ইহার ধ্বংসের বীজও বপন করিয়া যাইতেছেন।"

সুভাষচন্দ্রের সূত্রে অনিবার্যভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা এসে পড়ে। মনে রাখা দরকার, আজাদ হিন্দ ফৌজের রণসঙ্গীত 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' সর্বাগ্রে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। উত্তরকালে হরিপদ মহলানবীশ লিখেছেন: "আজকাল ভারতবর্ষে এমন শিক্ষিত নরনারী নাই যিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের রণসঙ্গীত 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' শোনেন নাই: সেই অবিস্মরণীয় সঙ্গীত সর্বপ্রথম আনন্দবাজার পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।"

ইতিহাসে আনন্দবাজার

আবার আগের কথায় ফিরে যাই।

১৯২৪ সালের ৯-ফেব্রুয়ারি (২৬ মাঘ ১৩৩০) 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "অদ্য ২৬শে মাঘ শনিবার শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। সেজন্য আগামী কল্য ২৭শে মাঘ রবিবারে কাগজ প্রকাশিত হইবে না। মঙ্গলবার আবার আনন্দবাজার পত্রিকা যথারীতি বাহির হইবে।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৪ সালের ১২ মার্চ, লিখেছে: "বাঙ্গলাদেশের কোন না কোন স্থান হইতে প্রায় প্রত্যহ নারী-নিগ্রহের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্ত জঘন্য ও কুৎসিত অত্যাচারের কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে মর্ম্মান্তিক বেদনাদায়ক; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা আমাদের করিতে হয়—অত্যাচারীর অত্যাচারকাহিনী লোক-সমাজে প্রচার করিবার জন্য; সমাজের কুৎসিত গ্লানি ও ক্ষত, নিশ্চিন্ত সমাজপতিদের অলস চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার জন্য। পাপ ও অত্যাচারকে যতই গোপন করা যায়,—ততই তাহার শক্তি আরও বাড়িয়া যায়।"

১৯২৪ সালের ২১-মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'দোল সংখ্যা' প্রকাশিত হল। আট পৃষ্ঠার পত্রিকা, প্রথম, দ্বিতীয়, সপ্তম ও অষ্টম পৃষ্ঠায় লাল রঙের কাগজ; তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় কমলা রঙের কাগজ। সেদিন বিজ্ঞাপিত হল: "দোল-লীলা উপলক্ষে অদ্য শুক্রবার আমাদের ছুটী থাকিবে। সুতরাং আগামী কল্য শনিবার আমাদের কাগজ বাহির হইবে না।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৪ সালের ৪ মে, বিজ্ঞাপিত করেছে: "আগামী মঙ্গলবার, ৬ই মে মুসলমান পর্ব্ব—ইদলফেতর উপলক্ষে "আনন্দবাজার পত্রিকা" বাহির হইবে না। বুধবার ৭ই মে আবার যথারীতি পত্রিকা প্রকাশিত হইবে।"

অতঃপর সন্তোষকুমারী গুপ্তাকে কেন্দ্র করে একটি বেদনাদায়ক ঘটনা আছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৪ সালের ২৪-সেপ্টেম্বর (বুধবার), লিখেছে:

"সুসংবাদ

সন্তোষকুমারীর পুত্র প্রসব

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, সুপ্রসিদ্ধা শ্রমিকনেত্রী, "শ্রমিক"—

সম্পাদিকা এবং স্বরাজ্যদলের সাম্রাজ্ঞী শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তা গত শুক্রবার একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। আমরা নবজাত শিশুর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।"

কিন্তু এই সংবাদটি নির্ভুল নয়। পরদিনই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ভুল সংশোধন করেছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৪ সালের ২৫-সেপ্টেম্বর, লিখেছে: "গতকল্য শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তার নবকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আমরা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমরা ভাবিতেছিলাম, আজই কাশীপুর-চিৎপুরে ডাক্তার গুপ্তের বাড়ী হাজির হইয়া সন্দেশ আদায় করিব। কিন্তু হরি! হরি! এখন জানিতে পারিলাম যে, সংবাদটী অমূলক। শ্রীমতী সন্তোষকুমারী ও ডাঃ গুপ্তের পুত্রমুখ দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই। অগত্যা আমাদের মনের আশা মনেই পোষণ করিতে হইল।"

এই ভুল সংশোধন সত্ত্বেও 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা দুরভিসন্ধি আবিষ্কার করে কুশ্রী ভাষায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নিন্দা করেছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৪ সালের ২৬-সেপ্টেম্বর, লিখেছে:

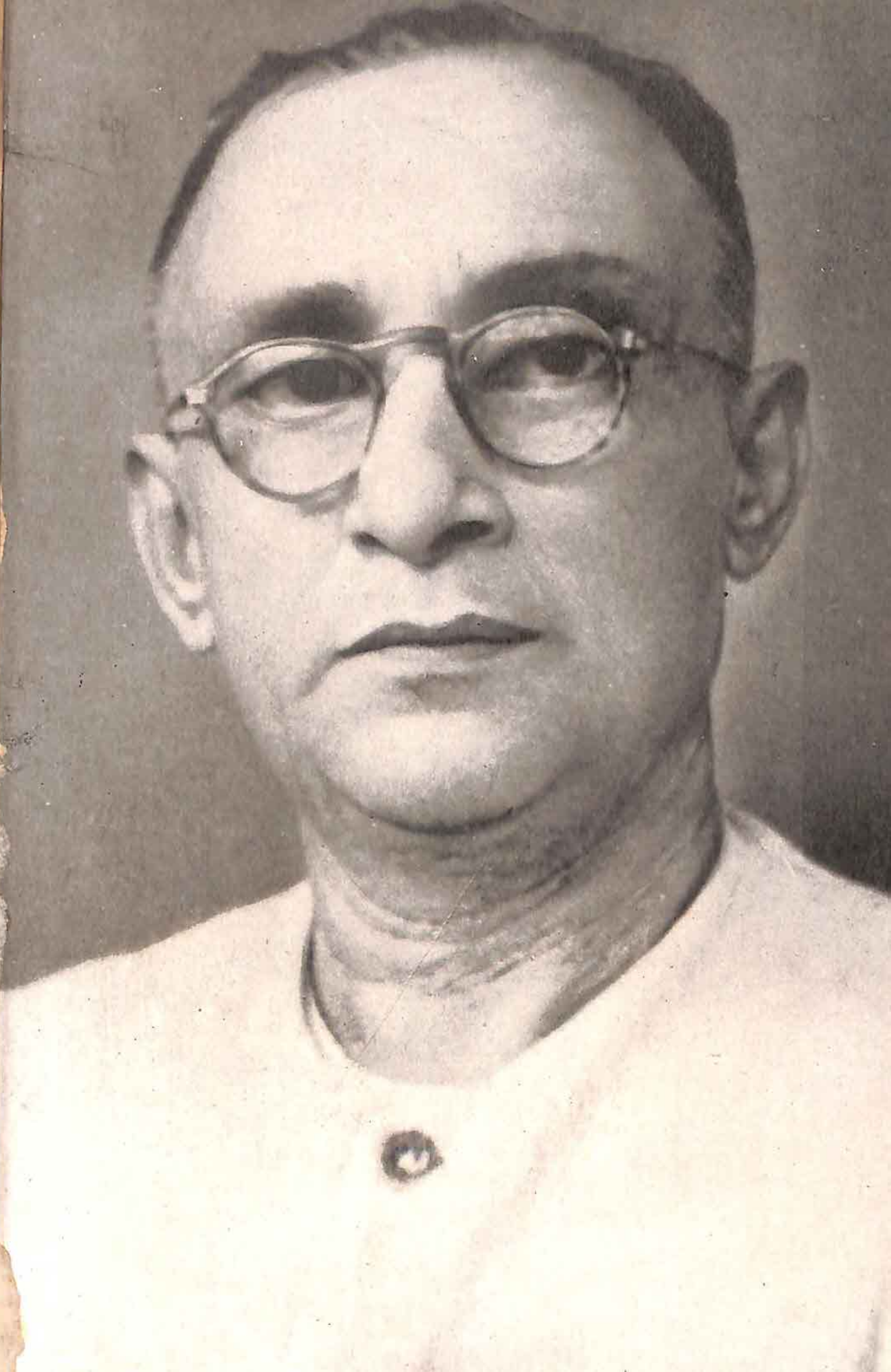
"সম্পাদকীয় বিভাগের অনবধানতাপ্রযুক্ত শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তা মহাশয়ার পুত্র হওয়ার সংবাদ গত বুধবারের "আনন্দবাজারে" প্রকাশিত হইয়াছিল। সংবাদটী অমূলক ইহা ঐ দিন রাত্রেই শ্রীমতী গুপ্তার ভ্রাতা আমাদিগকে বলিয়া যান। যেভাবে ঐ সংবাদ "আনন্দবাজারে" স্থান পাইয়াছে, তাহা তাঁহার নিকট আমরা খুলিয়া বলিয়াছি এবং গতকল্য ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি এবং এ সংবাদ শ্রীমতী গুপ্তের মনোবেদনার কারণ হইয়াছে জানিয়া আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত। একথা বলিয়া আমরা সংবাদ-প্রকাশের দায়িত্ব অস্বীকার করিতেছি না, বাচনিকও করি নাই; কেননা, তাহা করা সঙ্গত নহে।

কিন্তু "ফরোওয়ার্ড" পত্রিকা এই সংবাদটি প্রকাশের পশ্চাতে শ্রীমতী গুপ্তাকে লোকচক্ষে অপদস্থ করিবার হীন চেষ্টা আবিষ্কার করিয়াছেন ও তজ্জন্য আমাদিগকে ইতর ভাষায় গালি দিয়াছেন। আমরা "ফরওয়ার্ডে"র এই আচরণে স্তম্ভিত হইয়াছি। সাধারণে সুপরিচিতা কোন সধবা ভদ্রমহিলার সন্তান হওয়ার সংবাদ প্রকাশ অন্যায় বা অসঙ্গত নহে; আর তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক—তাহার মধ্যে দুরভিসন্ধি আরোপ করিবার হেতু কি?..."

ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়নি। প্রতিপক্ষ সেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত করেছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৯২৪ সালের ২৭-সেপ্টেম্বর, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লিখেছেন:

"শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তার পুত্র হওয়ার সংবাদ 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' বাহির হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার তরফ হইতে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। বুধবার দিন 'আনন্দবাজার পত্রিকার' অতিরিক্ত একখানি সিট দেওয়া হয়; ঐ সিট রাত্রে ছাপা হয়। কিভাবে ঐ সংবাদটী তাহাতে স্থান পাইল, তাহা আমি অনুসন্ধান করিয়াও বাহির করিতে পারি নাই। সংবাদপত্রে যাহা বাহির হয়, তাহার দায়িত্ব সম্পাদকের হইলেও সব সম্পাদকের লেখা নয় এবং সকল সময়ে সব সংবাদ সম্পাদকের পক্ষে দেখিয়া দেওয়াও সম্ভবপর হয় না। যাহা হউক, তৎপরি দিবস রাত্রে একজন ভদ্রলোক 'আনন্দবাজার' কার্য্যালয়ে আসিয়াছিলেন। তখন আমি উপস্থিত ছিলাম না। উক্ত ভদ্রলোক, অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল বাবুর নিকট নিজেকে শ্রীমতী গুপ্তার ভাই বলিয়া পরিচয় দিয়া বলেন যে, ঐ সংবাদ মিথ্যা।



শ্রীযুক্ত প্রফুল্লবাবু, অনবধানতাবশতঃ ঐ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার জন্য যথোচিত দুঃখ প্রকাশ করিয়া কি ভাবে প্রতিবাদ লিখিলে শ্রীমতীর মনোবেদনা দূর হয়, তাহা উক্ত ভদ্রলোকের নিকট জিজ্ঞাসা করেন। এবং উক্ত ভদ্রলোকের কথিতমত ভাবে পরদিবস প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। বৃহস্পতিবারে 'ফরওয়ার্ডে' দেখিলাম, ঐ সংবাদ প্রকাশের জন্য আমাকে নৈতিক আদালতে অভিযুক্ত করিয়া জনসাধারণকে প্রহার করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। সেই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া কিনা জানি না, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত নামক জনৈক উকীল ও ১৫।২০ জন লোক সহ শ্রীমতী সন্তোষকুমারী আমাদের কার্য্যালয়ে আসিয়া ইংরাজী ভাষায় 'সম্পাদক কে', জিজ্ঞাসা করেন। আমি আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহাকে ধীরভাবে আমার কথা শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন, তিনি আমাকে মারিতে আসিয়াছেন, কথা শুনিতে আসেন নাই। আমি বলিলাম, আপনি প্রহার করিবেন, করুন—কিন্তু অগ্রে আমার কথা শুনুন। কিন্তু তিনি উচ্চৈঃস্বরে অতি অভদ্রোচিত ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অনুচরগণ দ্বারা পরিবেষ্টিতা হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং সত্যসত্যই গালাগালি করিতে করিতে অকস্মাৎ চপেটাঘাত করিলেন। আমি একজন ভদ্রমহিলার এইরূপ বিস্ময়কর আচরণে হাসিয়া বলিলাম, 'আপনি স্ত্রীলোক—মাতৃজাতি—কি আর বলিব! কিন্তু আপনি এ কি করিলেন?' তিনি সমানভাবে অবিশ্রান্ত গালাগালি করিতে লাগিলেন, কোন কথা শুনিলেন না। তাঁহার সঙ্গীয় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত দ্বিতীয় দিবসের প্রতিবাদটীও অন্যায় হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিলেন। আমরা বলিলাম, উহাতে আমাদের বিশ্বাসমত দোষের কিছুই নাই। শ্রীমতী গুপ্তা এভাবে লোকজন লইয়া আসিয়া আমাকে বড়ই সংকটে ফেলিয়াছিলেন। আমাকে অতিকষ্টে একজন মহিলার সম্মুখে অপ্রীতিকর ঘটনা যাহাতে না ঘটে, তাহার জন্য আমার বন্ধুবর্গকে ও প্রেসের কর্ম্মচারীদিগকে সংযত করিতে হইয়াছিল। কেননা, আমি শ্রীমতী গুপ্তার অপরিসীম ঔদ্ধত্যের পশ্চাতে একটী বিষয় বুঝিয়াছিলাম। তিনি আমাকে অপমান করিবার জন্য আসেন নাই, অপমানিতা হইবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাহা হইলেই স্বরাজ্যদলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কার্য্যালয়ে জনৈকা মহিলা তাঁহার অভিযোগ জানাইতে গিয়া অপমানিতা হইয়াছেন, ইহা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিবার সুযোগ পাওয়া যাইত। গতকল্য 'ফরওয়ার্ড', 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সম্পাদককে শ্রীমতী স্বহস্তে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন!

গতকল্য লিখিয়াছি, আজও বলিতেছি,—আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই আমার নিকট রহস্যময় এবং পূর্ব্ব হইতে চিন্তা করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। রাজনীতিক্ষেত্রে মতভেদ লইয়া প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করিবার জন্য, একজন নারীকে সম্মুখে রাখিয়া এমন কুৎসিত ঘটনার অবতারণা করা যাইতে পারে, ইহা আমাদের ধারণাতেও আইসে নাই। তবে মনে পড়িতেছে, যখন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক ছিলেন, তখন সুকীয়া ষ্ট্রীটের সমিতির কার্য্যালয় দখল লইবার জন্য স্বরাজ্যদলের কতিপয় কর্ম্মীও কয়েকজন মহিলাকে সম্মুখে করিয়াই তথায় গিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রীমতী গুপ্তার অভিযোগ সম্পর্কে আমি কোন নৈতিক কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছি, এমন কথা এখনো মনে করিতে পারিতেছি না, এবং ইহাও ভাবিতে অক্ষম হইতেছি যে, প্রতিপক্ষের একজন অপরিচিত যুবককে অতি অন্যায়রূপে অপদস্থ করিবার ষড়যন্ত্রে একজন ভদ্রমহিলা কেমন করিয়া, কি মনোবৃত্তি লইয়া নিজেকে ক্রীড়নকরূপে ব্যবহৃতা হইতে নিরাপত্তিতে সম্মতা হয়েন?"

১৯২৪ সালের ২৬-সেপ্টেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপিত হল: ১৮ই

আশ্বিন ৪ঠা অক্টোবর শনিবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হইয়া পূজার জন্য বন্ধ হইবে। ১৯শে আশ্বিন রবিবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র একটী অতিরিক্ত সংখ্যা (পূজা সংখ্যা) প্রকাশিত হইবে। উহাতে নানারূপ ব্যঙ্গচিত্র, নক্সা, গল্প ইত্যাদি থাকিবে। যাঁহারা ঐ বিশেষ সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ম্যানেজারের সঙ্গে ৩রা অক্টোবর শুক্রবারের মধ্যে সাক্ষাৎ করিয়া অথবা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিবেন।"

যেমন কথা ছিল, ১৯২৪ সালের ৫ অক্টোবর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'পূজার সংখ্যা' প্রকাশিত হল, সাকুল্যে বারো পৃষ্ঠার কাগজ, প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা লাল কালিতে ছাপানো। সেদিনের পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হল: "শ্রীশ্রী শারদীয়া পূজা উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রচার আগামী কল্য ৬ই অক্টোবর সোমবার হইতে ১৩ই অক্টোবর সোমবার পর্য্যন্ত অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বন্ধ থাকিবে। ১৪ই অক্টোবর মঙ্গলবার পুনরায় দৈনিক আনন্দবাজার এবং ১৬ই তারিখে বৃহস্পতিবার অর্দ্ধ সাপ্তাহিক আনন্দবাজার প্রকাশিত হইবে।"

১৯২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে একটি বিশেষ বিজ্ঞাপন উদ্ধার করি: "আনন্দবাজার পত্রিকা" চিরদিনই গণতন্ত্রবাদী, জনসাধারণকে সেবা করাই তাহার মুখ্য লক্ষ্য; সুতরাং "আনন্দবাজার পত্রিকা" যাহাতে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্য অদ্য হইতে কলিকাতা ও সহরতলীতে উহার নগদ মূল্য এক পয়সা মাত্র করা হইল। এতদ্ব্যতীত সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র "আনন্দবাজার পত্রিকার" বার্ষিক, ষাণ্মাসিক ও ত্রৈমাসিক মূল্য হ্রাস করা হইল। আশা করি, ইহার ফলে বাঙ্গলার জনসাধারণকে সেবা করিবার আরও অধিক সুযোগ আমরা পাইব। ইহাই আমাদের পরম লাভ; ইহারই জন্য সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমরা নবোদ্যমে আবার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম।"

১৯২৪ সালের ২১-ডিসেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপিত হয়েছে: "রবিবারের "আনন্দবাজার পত্রিকা" ছয় পৃষ্ঠা থাকে; সুতরাং রবিবারের পত্রিকার মূল্য সহরে আমরা পূর্ব্ববৎ দুই পয়সা রাখিলাম। সপ্তাহের অন্যান্য দিন সহরে "আনন্দবাজার পত্রিকা" নগদ এক পয়সা মূল্যেই বিক্রীত হইবে।"

১৯২৫ সালের ২৮-জানুয়ারি (বুধবার) 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বিজ্ঞাপিত করেছে: "আগামী বৃহস্পতিবার শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিস বন্ধ থাকিবে। সুতরাং শুক্রবারে আনন্দবাজার পত্রিকা বাহির হইবে না। আগামী শনিবারে আবার যথারীতি পত্রিকা প্রকাশিত হইবে।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৫ সালের ২০-ফেব্রুয়ারি, লিখেছে: "সংবাদপত্র সকল দেশেই জনমতের ধারক ও বাহক। পরাধীন দেশে সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আরও বেশী; কেননা, দুর্ভাগ্য পরাধীন দেশে একদিকে যেমন সংবাদপত্রকে লোক হৃদয় বিরুদ্ধ মতামতকে প্রকাশ করিতে হয় অন্যদিকে তেমনি স্বাধীনতার সংগ্রামে অনেকস্থলে তাহাকে পথ দেখাইয়া চলিতে হয়। তাই পরাধীন দেশে স্বেচ্ছাচারী শাসক সম্প্রদায় চিরকালই সংবাদপত্রের উপর খড়্গহস্ত, তাহার কণ্ঠরোধ করিবার জন্য সর্ব্বদাই তাহারা ব্যগ্র। ভারতবর্ষেও এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই; এখানকার দেবতা ও উপদেবতারা সর্ব্বপ্রকারে সংবাদপত্রের চরণে শৃঙ্খল পরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কণ্ঠরোধ করিবার জন্য নূতন নূতন আইনের ফাঁস রচনা করিয়াছেন।..."

১৯২৫ সালের ১০ মার্চ দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই উপলক্ষে অনেকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছেন: "ভাষার লালিত্য ও তেজস্বিতা, উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব

ও তৎসাধনে নির্ভীকতা "আনন্দবাজার পত্রিকা"র বিশেষত্ব।"

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন:

"আনন্দবাজার" জাতীয় কল্যাণ ও অভ্যুদয়ের জন্য যে ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহাতে রাজনীতিক আতস বাজীর ফুৎকার না থাকিলেও স্থায়ী মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে। যাহাতে এদেশে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া একটা পূর্ণাঙ্গ জাতির সুপ্রতিষ্ঠা হয়, ইহাই আমাদের সকলের লক্ষ্য ও আদর্শ। কিন্তু এই আদর্শকে কল্পনার পরব্যোম হইতে কিরূপে পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ করান যায়, সেই প্রণালী ও পদ্ধতি সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ। এ সম্বন্ধে সকল দেশ-সেবকের মধ্যে ঐক্যমত হইবে ইহা সম্ভব নয়—বাঞ্ছনীয়ও নয়।

যে যাঁহার আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিয়া জাতীয় জীবনপথে অগ্রসর হউন, ইহাতে আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু ঐটুকু দাবী করিবার বোধ হয় সকলেরই অধিকার আছে যে, লোক-শিক্ষা ও লোকমত সংগঠন জন্য যাঁহারা সংবাদপত্রের পরিচালনা করিবেন, তাঁহাদের প্রযত্ন ও প্রচেষ্টা যেন সত্যাপেত হয়—যেন সংবাদপত্র হটকারী না হইয়া ধীর ও মতসহিষ্ণু হয়। "আনন্দবাজারের" সকল মতের আমি অনুমোদন করি না; কিন্তু এ কথা আমি অন্তরের সহিত বলিতে পারি যে "আনন্দবাজার" নিজের আদর্শ কোনরূপে ক্ষুন্ন করে না—কখনও ভাবের ঘরে চুরি করে না।"

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "আপনাদের পত্রিকা চতুর্থবর্ষে পদার্পণ করিবে জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আপনাদের এই শুভ অনুষ্ঠানের সহিত আমার যোগ সবসময়ে আছে, ইহা আমি মনে করি। এই উপলক্ষে আমার শুভকামনা আপনাদিগকে জানাইতেছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত-সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন: "আনন্দবাজার পত্রিকা" (নব পর্যায়) চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিতেছে, ইহাতে আমি পরম আনন্দিত। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইহা কিরূপ প্রতিকূলতা, বাধাবিঘ্ন ও বিপত্তির সহিত অবিরত যুদ্ধ করিয়া আপন স্বাতন্ত্র্য ও প্রভাব অক্ষুন্ন রাখিয়াছে দেখিলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। নির্ভীকভাবে জনমত ঘোষণা, দেশসেবা ও জাতীয়তার উচ্চতম আদর্শ প্রচার করাই ইহার গৌরবের অন্যতম কারণ।"[২]

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কুমিল্লা অভয়াশ্রম থেকে আশীর্বাদ পাঠালেন: "যেদিন হইতে "আনন্দবাজার পত্রিকা" জন্মলাভ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই আমি ইহা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেছি। যাহাতে আমাদের দেশাত্ববোধ জাগ্রত হয়, সে বিষয় এই পত্রিকা অগ্রণী এবং মহাত্মা গান্ধীর বাণী প্রচারের জন্য ইহা প্রধান মুখপাত্র। অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন, হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি-সংস্থাপন ও খদ্দর প্রচারকল্পে ইহা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। "আনন্দবাজার পত্রিকা"র নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদীত্ব আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়—ব্যক্তিবিশেষকে খাতির করিতে যাইয়া অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে এই পত্রিকা কুণ্ঠিত হন না। দেশের এই দুর্দ্দিনে দেশে এই প্রকার একখানি পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, "আনন্দবাজার পত্রিকা" দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।"

মহাত্মা গান্ধী বরকলা (দক্ষিণ ভারত) থেকে আশীর্বাদ করেছেন: "যে পত্রিকা অহিংসা, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, সুতাকাটা, খদ্দর এবং অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সমর্থন ও প্রচার করে, সে সকল সময়েই আমার আশীর্ব্বাদের পাত্র।"[৩]

১৯২৫ সালের ১০-মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'দোলপূর্ণিমা সংখ্যা' প্রকাশিত হল। সেদিন পত্রিকার আয়তন আট পৃষ্ঠা, আদ্যন্ত লালরঙের কাগজ। সেদিনের পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন: "দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে অদ্য "আনন্দবাজার পত্রিকা" কার্য্যালয়

বন্ধ থাকিবে। সুতরাং আগামী কল্য বুধবার পত্রিকা বাহির হইবে না। বৃহস্পতিবারে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আবার যথারীতি বাহির হইবে।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৫ সালের ১০-মার্চ, নিবেদন করেছে:

"দেখিতে দেখিতে তিনটী বৎসর কাটিয়া গেল। অদ্য 'আনন্দবাজারে'র বর্ষারম্ভ।... তিন বৎসরের নানা ঝড়ঝাপ্‌টার মধ্যেও এই শিখাটুকু নিভে নাই,—অতীতের দিকে চাহিয়া মনে হয়, এই গাঢ় তিমিরময়ী রজনীতে এই ক্ষুদ্র দীপশিখারও প্রয়োজন আছে; আমরা আজ স্পর্দ্ধা না করিয়াও বলিতে পারি,—

'হই না ক্ষুদ্র, তবুও রুদ্র
ভীষণ-ভয়,
আমার দৈন্য, সে মোর সৈন্য
তাহারি জয়!'

আমরা প্রভুত্ব-প্রয়াসী নেতা নহি, গর্ব্বোদ্ধতশির কর্ম্মী নহি, আভিজাত্য গৌরব-লোভী ধনী নহি—কোন অসংগত আত্মস্বার্থ সাধনের দুরাশায় ক্ষিপ্ত হইয়া দশের সহিত যশের যুদ্ধে আমরা ব্রতী নহি! দেশ ও কালের ব্যবধানে যে সমস্ত মনীষী মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া জাতীয় জীবনে সত্যের মঙ্গল রূপকে জীবন সাধনায় মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের বিচিত্র ভাব-সমষ্টির সমন্বয়ে জাতীয় সাধনা যে বিশিষ্ট আকারে জাতীয় জীবনে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে—তাহারই ধারক, বাহক ও প্রচারক দুরূহ কর্ত্তব্য পালনে আমরা যথাসাধ্য করিয়াছি এবং করিতেছি!...

সমষ্টি-মুক্তির যে আন্দোলন দেশের রাষ্ট্র ও সমাজে দেখা দিয়াছে—তাহার অনুকূল ভাবধারা বহন করাই 'আনন্দবাজারের' মুখ্য লক্ষ্য। মহাত্মা গান্ধীর উপদেশে ভারতের রাষ্ট্রীয় মহা-সমিতি যে উপায়কে রাজনৈতিক মুক্তি-সাধনা বা স্বরাজ-লাভের জন্য গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা চারি বৎসর পর, রাষ্ট্রীয় মহা-সমিতি হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। মহাত্মাজী কারারুদ্ধ হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বড় বড় রাষ্ট্রবীরগণ আদর্শকে রক্ষা করিবার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়া কার্য্যতঃ কি করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহার শোচনীয় পরিণাম, অত্যন্ত স্থূলদৃষ্টিতেও প্রত্যক্ষ। আদর্শ বিপর্য্যয়ের এক শোচনীয় পরিনামকে অপমানিত জাতি পরাজয়ের গ্লানির বেদনা বক্ষে চাপিয়া নত শিরে বহন করিয়া চলিয়াছে—এমন করুণ দৃশ্য জগতে বিরল! বিদ্রোহ-বিপ্লব সমস্ত শৃঙ্খলা চূর্ণ করিয়াছে। 'স্বাধীন মতের দোহাই দিয়া এক অতি উচ্ছৃংখলের ব্যক্তিত্বের স্বেচ্ছাচার জাতির সমষ্টিবদ্ধ ক্ষুদ্র শক্তিটুকু বহু অংশে খণ্ডিত ও বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে! এই সমস্ত বিভক্ত শক্তিগুলি ছিন্নবল্গা অশ্বের মত কোথায় যে ছুটিয়া চলিয়াছে, দিশাই পাইতেছি না। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীগণের চিন্তায় ও চরিত্রে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। এই ক্ষুব্ধ, বিপর্য্যস্ত অবস্থার মধ্য হইতে সুনিশ্চিত কর্ম্মপদ্ধতি কবে আবির্ভূত হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। অনেকের চিত্ত সংশয়ে আচ্ছন্ন, অনেক কর্ম্মী কর্ম্মহীন নৈরাশ্যে এলাইয়া পড়িয়াছেন, বড় বড় রাষ্ট্রবীরগণ ক্ষেত্রান্তরে দাঁড়াইয়া, ইংরাজের কৃপাদত্ত তর্কসভার একপ্রান্তে অতিকষ্টে স্থান সংগ্রহ করিয়া অলীক প্রত্যাশার নেশায় ঝিমাইতেছেন—জাগ্রত জাতির মুক্তিসাধনার পথে এই মতিভ্রম—ক্ষোভের, লজ্জার, মনস্তাপের। ইহা সত্যকে জীর্ণ করিতে না পারিয়া অজীর্ণ-জনিত দুদণ্ডের স্বপ্ন! এই দুঃস্বপ্নের প্রলাপের সহিত আমরা কণ্ঠ মিলাইয়া চীৎকার করিয়া ক্ষণিকের খেলাকে প্রশংসা করিতে পারি নাই,—পারিব না। আমরা নিশ্চিত জানি, সত্যাগ্রহ—অহিংস অসহযোগ—নিরুপদ্রব প্রতিরোধ,—দেশের বর্ত্তমান অবস্থার একমাত্র উপায়...। রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইহাপেক্ষা আর কোন সুলভ ও সহজ পথ নাই। যাহা অদ্য আমরা দেখিতেছি—তাহা বিকারের আক্ষেপ, প্রক্ষেপ মাত্র। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় মহাপুরুষ, এক একটা জাতির জীবনে বহুদিন পর আবির্ভূত

হন এবং ইঁহারা পৃথিবীতে ছেলেখেলা করিতে আসেন না। মহাত্মাজীও তাঁহার অহিংসাত্মক উপায় লইয়া ভারতবাসীর সহিত ছেলেখেলা করেন নাই। শতাব্দী-সঞ্চিত চিন্তার জড়ত্ব বুদ্ধির ক্রীতদাসত্ব, পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য ধূর্জ্জটীর ন্যায় দুর্জ্জয়রূপ লইয়া যে ঈশান বিষাণধ্বনি করিয়াছিলেন, সেই নটরাজ আজ তাঁহার তাণ্ডব সংযত করিলেও, যে কোন মুহূর্ত্তে, তাঁহার চরণ-প্রহারে প্রলয় দুলিয়া উঠিবে—সেই দারুণ শুভদিনের কঠোর কল্যাণকেই আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি!

এই শুভদিনের আভাষ আমরা পাইতেছি সমাজজীবনে! বাঙলার হিন্দুসমাজের নানাস্তরে সামাজিক-সমুন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। 'পতিত' 'অনাচরণীয়' 'অস্পৃশ্য' এই সমস্ত শব্দের ভোজবাজীতে মোহগ্রস্ত 'গণ-নারায়ণ' আর নিদ্রিত নহেন। গণ-বিগ্রহের এই জাগরণের আগমনী 'আনন্দবাজার' যথাশক্তিতে গাহিয়াছে। পুণ্যশ্লোক স্বামী বিবেকানন্দের মহতী স্বপ্ন, মহাত্মা গান্ধীর আকুল আগ্রহ—বুঝিবা সফল হইতে চলিয়াছে। অপমানিত মনুষ্যত্ব অবজ্ঞার নিঃশব্দ দাহে জ্বলিয়া জ্বলিয়া আগ্নেয়গিরির মত যে-কোন মুহূর্ত্তে বিদীর্ণ হইয়া এক ভয়াবহ সমাজবিপ্লব সৃষ্টি করিতে পারে—এই দুর্দ্দিন বাঙলার সমাজ-জীবনে আসিতে দেওয়া উচিত নহে। ঝুটা আভিজাত্যের গর্ব্বে আত্মহারা তথাকথিত উচ্চজাতীয়দের চেতনা সঞ্চারের জন্য এই আশঙ্কা আমরা নির্ভয়ে ব্যক্ত করিয়াছি। মানুষের সহিত মানুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপনের যে মহাবাণী বিঘোষিত হইয়াছে—সেই নবযুগধর্ম্মের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা তথাকথিত সমাজ-নায়কদের নিকট তিক্ত হইলেও আমাদিগকে দুঃখের সহিত পুনঃ পুনঃ বলিতে হইবে। দুর্ব্বল, পতিত, অজ্ঞ, মূর্খ, দীন, দরিদ্রের পক্ষ সমর্থন করিতে 'আনন্দবাজার' কখনো বিমুখ নহে।

রাষ্ট্রে ও সমাজে সমষ্টি মুক্তির এই দুই আদর্শকে অনুসরণ করিতে গিয়া নিজেদের জ্ঞান-বিশ্বাস মত অনেক অপ্রিয় সত্যকথা বলিতে হইয়াছে;...সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়াও আমরা ক্ষুদ্রশক্তিতে দেশ ও জাতি-সেবার যে যৎকিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইয়াছি, 'আনন্দবাজারে'র পাঠক-পাঠিকাগণের সাদর সহানুভূতিতে তাহা সার্থক হউক,—এই আশা লইয়াই আমরা চতুর্থবর্ষে পদার্পণ করিলাম।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৫ সালের ৩১-জুলাই, লিখেছে: "জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে গবর্ণমেণ্ট, শাসক-সম্প্রদায় এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যাবলীর সমালোচনা করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার সংবাদপত্রের আছে, এরূপ একটা প্রবাদ শুনা যায় বটে, কিন্তু তাহা কেবল কথার কথা, আসলে স্বেচ্ছাচারী আমলাতন্ত্রের খেয়ালের উপরেই সংবাদপত্রের জীবন-মরণ নির্ভর করে। পরাধীন দেশে অন্য দশটা আধিব্যাধির ন্যায় এই আধিভৌতিক উপদ্রবের জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কস্মিনকালেও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'কে সুনজরে দেখেনি। অত্যন্ত স্বাভাবিক। এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সেজন্য প্রস্তুত থেকেছে।

অতঃপর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় আরেকটি দুঃসাহসী উদ্যোগ দেখা গেল। দেশবাসীর সহানুভূতি, উৎসাহ ও শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আয়তন বিস্তারের উদ্যোগী হল।

১৯২৫ সালের ৫-জুলাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপিত হয়েছে:

"সুসংবাদ! সুসংবাদ!! সুসংবাদ!!!

বাঙলা সংবাদপত্র জগতে

অপূর্ব্ব ব্যাপার!

বাঙলার ঘরে ঘরে জাতীয়তার বাণী প্রচারক

আনন্দবাজার পত্রিকা

আগামী ১০ই অগস্ট সোমবার (২৫শে শ্রাবণ) হইতে দৈনিক ১৬ পৃষ্ঠা আকারে বাহির হইবে।

ইহাতে প্রতিদিন ৪০ কলম হইতে ৫০ কলম পর্য্যন্ত পঠিতব্য বিষয় থাকিবে।

দেশী ও বিদেশী তারের সংবাদ, বাঙগলার সহর ও মফঃস্বলের সংবাদ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদ, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সংবাদ, সাহিত্য ও সামাজিক প্রসঙ্গ, খদ্দর, পল্লীসংগঠন ও জাতীয় আন্দোলনের সংবাদ, দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, জগতের বিবিধ বিচিত্র বার্ত্তা সমস্তই থাকিবে। "আনন্দবাজার পত্রিকা"র বিশেষত্ব—সরস ও ভাবপূর্ণ প্রবন্ধ, বৎকিঞ্চিৎ, টীপ্পনী রংবেরং প্রভৃতি প্রত্যহ পাঠকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিবে।

নগদ মূল্য ১৬ পৃষ্ঠা দুই পয়সা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।

গ্রাহকগণের জন্য :—

	সহর	মফঃস্বল
বার্ষিক	১০৲	১৪৲
ষাণ্মাসিক	৫৲	৭৲
ত্রৈমাসিক	৩৲	৪৲
মাসিক	১।০	১॥০

বিজ্ঞাপনের হার ও মফঃস্বলের এজেন্সীর নিয়মাবলীর জন্য নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড
৭১।১, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।"

১৯২৫ সালের ১০ অগষ্ট 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বর্ধিতাকারে প্রকাশিত হল। সেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নিবেদন করেছে:

বর্তমান আন্দোলনে বাঙগলা যাহাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে পারে, তাহার "প্রায় চারিবৎসর পূর্ব্বে দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া "আনন্দবাজার পত্রিকা" নূতন জন্মলাভ করিয়াছিল। এই চারি বৎসরে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার নানা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, জাতি স্বরাজলাভের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় সংঘর্ষ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া অনেক পথ অতিক্রম করিয়াছে। "আনন্দবাজার পত্রিকা"ও জাতির সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি ও সামর্থ্য লইয়া যোগ দিবার চেষ্টা করিয়াছে। হয়ত অনেক স্থলে আমাদের পদস্খলন হইয়াছে, দেশসেবার মহান্ আদর্শের অনুসরণ করিতে গিয়া আমরা সময়ে সময়ে ভ্রম প্রমাদ করিয়াছি, কিন্তু সকল স্থানে, সকল অবস্থায় দেশের কল্যাণকেই লক্ষ্য করিয়া আমরা অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছি, একথা আজ দৃঢ়ভাবেই বলিতে চাই।...

স্বাধীন দেশে সংবাদপত্র শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান...পরাধীন দেশে সংবাদপত্রের সেরূপ ক্ষমতা না থাকিলেও, তাহাদের দায়িত্ব কিছুমাত্র কম নহে। এখানে সংবাদপত্র যে কেবল জনমতের অনুসরণ করে তাহা নহে, তাহাকে অনেক সময় জনমত গড়িয়া তুলিতে হয় এবং তাহাকে লক্ষ্যের পথে ঠিকমত পরিচালিত করিতে হয়। সুতরাং এদেশে সংবাদ-পত্র কেবল ব্যবসাদারী বা ক্ষমতালাভের বাহন নহে, ইহা দেশসেবার সাধন। এখানে সংবাদপত্র-সেবা দারিদ্র্যব্রত ও আত্মোৎসর্গের নামান্তর। ইহা ছাড়া রাজ-ভয়, আমলা-ভয় ও জেলখানার ভয় তো আছেই। গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাঙগলাদেশে যে সমস্ত মহাপ্রাণ লোক সংবাদপত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার লোভে এই কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হন নাই, জন্মভূমির নীরব সেবা করিবার জন্যই তাঁহারা দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।...

সংবাদপত্রের সাধনা যে একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে, তাহাও নহে। পূর্ব্বে ২।৪ খানি বাঙগলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র মাত্র ছিল, এখন কয়েকখানি বাঙগলা দৈনিক পত্রও চলিতেছে।

এই সমস্ত বাঙ্গলা দৈনিক পত্রের প্রায় কাহারও আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে, কিন্তু তবু নানা বিঘ্ন ও বিপদের মধ্য দিয়াও তাহারা আত্মরক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যপালন করিতেছে: যাঁহারা ইংরাজী সংবাদপত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া বাঙ্গলা সংবাদপত্রগুলিকে ঈষৎ অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন, তাঁহাদেরই উৎসাহের অভাবে বাঙ্গলা কাগজগুলির এই দুর্দ্দশা। কোন্ স্বাধীন দেশের লোকে মাতৃভাষা ছাড়িয়া বিদেশী ভাষায় লিখিত সংবাদপত্র পড়িতে ভালোবাসে?

বাঙ্গলা সংবাদপত্র পাঠকদের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য "আনন্দবাজার পত্রিকা" এখন হইতে বর্দ্ধিতাকারে প্রকাশিত হইবে; ইহাতে প্রতিদিন ১৬ পৃষ্ঠা এবং পঠিতব্য বিষয় পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় তিনগুণ অধিক থাকিবে। আমাদের এই চেষ্টা নিতান্তই দুঃসাহস তাহা আমরা বুঝি। কিন্তু দেশবাসী, মিত্র, সুহৃৎ, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের সহানুভূতি, উৎসাহ ও শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়াই আজ আমরা এই দুঃসাধ্য ব্রতে প্রবৃত্ত হইলাম।..."

১৯২৫ সালের ১০ অগাস্ট থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'নাট্যপ্রসঙ্গ' নামে নাট্যাভিনয় সম্পর্কিত একটি সাপ্তাহিক বিভাগ আরম্ভ হয়েছে। সেদিনের 'নাট্যপ্রসঙ্গ' থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করি: "বাঙ্গলা রঙ্গালয়ের সত্যই নূতন যুগ আসিয়াছে। ষ্টার থিয়েটারে 'কর্ণার্জ্জুনে'র দ্বিশততম অভিনয় এবং নাট্যমন্দিরে 'সীতার' শততম অভিনয়ই তাহার প্রমাণ। পূর্ব্বে বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চে অনেক নাটক ও গীতিনাট্য বহুবার অভিনীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু একাদিক্রমে একশত বা দুইশত রাত্রি কোন নাটকেরই অভিনয় হয় নাই। এ যুগের নবীন অভিনেতাদের অভিনয়কৌশল ও নাট্যকলার সমধিক উন্নতিই ইহার কারণ।" ইতিপূর্বে নাট্যাভিনয় সম্পর্কে কোনো নিয়মিত বিভাগ না থাকলেও একাধিকবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় নাট্যাভিনয় আলোচিত হয়েছে। 'নাট্যপ্রসঙ্গ' দীর্ঘায়ু হয়নি।

১৯২৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বিজ্ঞাপিত করেছে: "আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার "আনন্দবাজারের" শারদীয়া বিশেষ সংখ্যা বর্দ্ধিত আকারে বাহির হইবে। উহাতে পূজা সম্বন্ধে নানাবিধ প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, রঙ্গব্যঙ্গ ও অজস্র ব্যঙ্গচিত্র থাকিবে। মোটের উপর ২৪ পৃষ্ঠা কাগজ বাহির হইবে। মূল্য পূর্ব্ববৎ দুই পয়সাই থাকিবে।"

যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছে এই 'শারদীয়া সংখ্যা'। কিন্তু এই 'শারদীয়া সংখ্যা'কে স্বতন্ত্রভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'শারদীয়া সংখ্যা' গণ্য করা সঙ্গত হবে না, কারণ এই 'শারদীয়া সংখ্যা' দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র চতুর্থ বর্ষের ১৬৮শৎ সংখ্যা হিসেবে চিহ্নিত।

১৯২৫ সালে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যোগ দিয়েছেন। উত্তরকালে তিনি বলেছেন: "আনন্দবাজার তখন নতুন কাগজ, কলেজ স্কোয়ারে বিখ্যাত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের বাড়িতে অফিস। সেখানেই একতলাতে কাগজ ছাপা হয়। দোতলায় অফিস এবং আড়াই তলায় সম্পাদকীয় দপ্তর। কলেজ-স্কোয়ারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় সেই ঈষৎ হলুদ রঙের বাড়িটা, বাইরে থেকে দেখলে হঠাৎ মনে হয় সাধারণ বাঙালীর মেসবাড়ির মতো। কিন্তু সেই বাড়িটাই ক্রমে বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম মর্মকেন্দ্র হয়ে উঠল।"[৪]

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ মার্চ ১৯২৫
২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ মার্চ ১৯২৫
৩। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ মার্চ ১৯২৫
৪। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার'

ইতিহাসে আনন্দবাজার

বিশেষজ্ঞের বিবেচনায় আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৯২৬ সালের আগে যথার্থ ও সুসম্পূর্ণ দৈনিক সংবাদপত্রের চরিত্র অর্জন করেনি। বিধুভূষণ সেনগুপ্ত লিখেছেন: "তখনও যথার্থ 'সংবাদপত্র' বলতে যা বোঝায়, আনন্দবাজার বা কোন বাংলা দৈনিক পত্রই তা ছিল না। বিখ্যাত ইংরেজী পত্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত তাদের। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আনন্দবাজার পত্রিকাই প্রথম ভেঙে যথার্থ 'সংবাদপত্রের' গৌরব অর্জন করে। ১৯২৬ সালের কলকাতা মহানগরীতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়, তখনকার নানা দুর্দৈব ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ এবং সংবাদের সংগ্রহ, শিরোনাম ও পরিবেশনের ওপর এই পত্রিকা জোর দিতে থাকে। বাংলা ভাষায় এই সময় আনন্দবাজার পত্রিকার মধ্য দিয়ে যথার্থ ও সুসম্পূর্ণ একটি দৈনিক সংবাদপত্রের জন্ম হয়।।"[১]

আবার গভর্ণমেন্ট আদালতে ফৌজদারী মামলা দায়ের করেছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৬ সালের ৮ অক্টোবর লিখেছে: "আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে গবর্ণমেন্ট দুইটী ফৌজদারী অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। গতকল্য চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে দুইটী অভিযোগ হইতেই সম্পাদক বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। এজন্য যে সমস্ত বন্ধুবর্গ ও হিতৈষীগণ আমাদিগকে অভিনন্দন করিয়াছেন তাহাদের সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আনন্দবাজার পত্রিকা স্বদেশ ও স্বজাতির সেবার জন্য কোন প্রকার বিঘ্নবিপদকে গ্রাহ্য করে নাই। আইন আদালতের জন্য জয় পরাজয়কে সে চিরদিনই অবিচলিত ভাবে গ্রহণ করিয়াছে ও করিবে।"

১৯২৬ সালের ৯ অক্টোবর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বিজ্ঞাপিত করেছে: "আগামীকল্য রবিবার ১০ই অক্টোবর "আনন্দবাজার" পত্রিকার পূজার সংখ্যা বাহির হইবে। ইহার আয়তন ৫৬ পৃষ্ঠা হইবে এবং দেশপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও মনীষীগণের লিখিত প্রবন্ধ. নিবন্ধ, গল্প প্রভৃতি ইহার গৌরব বর্দ্ধন করিবে। বহু রসরচনা, ব্যঙ্গ কবিতা, ব্যঙ্গচিত্র নক্সা, প্রভৃতিও থাকিবে।"

যথাসময়ে, ১৯২৬ সালের ১০ অক্টোবর, প্রকাশিত হয়েছে এই 'অতিরিক্ত শারদীয়া সংখ্যা' কিম্বা 'পূজার সংখ্যা'। এবং স্বতন্ত্রভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রথম 'শারদীয়া সংখ্যা'র মর্য্যাদা এই 'শারদীয়া সংখ্যার'ই প্রাপ্য।

এই 'শারদীয়া সংখ্যা'র কয়েকজন লেখকের নামোল্লেখ করি: আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়; যদুনাথ সরকার; জলধর সেন; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; বিমানবিহারী মজুমদার; নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত; রবীন্দ্রনাথ মৈত্র; বিনয়কুমার সরকার। দাম দু-আনা।

উত্তরকালে পাতিরাম পারিজা বলেছেন: "বই আকারে আনন্দবাজারই প্রথম পুজো সংখ্যা বার করে।... এগুলো মাখনবাবুর উৎসাহে হয়েছিল। তার আগে পুজোর সময় পত্রিকার সঙ্গে কয়েকটা পাতা বাড়িয়ে দেওয়া হত মাত্র।"

১৯২৮ সালের ৬ মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করল। সেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "আনন্দবাজার পত্রিকা কোনদিনই ধনীর কাগজ নয়, নিছক ব্যবসা হিসাবে পরিচালিত হয় নাই; ইহার পিছনে বড়লোকের রক্ষাকবচ বা মন্ত্রপূত মাদুলী নাই। ইহা চিরদিনই দেশের সেবক, জনসাধারণের কাগজ, নির্ভীকভাবে লাভক্ষতি বিবেচনা না করিয়া স্পষ্ট সত্য বলিতে সর্ব্বদাই ইহা চেষ্টা করিয়াছে। সেজন্য ইহাকে আঘাত এবং দুঃখ সহিতে হইয়াছে বিস্তর। কিন্তু কোনরূপ দুঃখ কষ্ট ঝড় ঝঞ্ঝা বিপদ, দারিদ্র্য, আর্থিক ক্ষতির ভয়েই আমরা কোনদিন বিচলিত হই নাই। কেন না দেশসেবাই আমাদের একমাত্র কাম্য এবং স্বাধীনতার বার্ত্তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করাই আমাদের ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনে আমরা হয়ত—শক্তির অভাবে, নানা প্রতিকূল ঘটনার সমাবেশে সব সময়ে কৃতকার্য্য হই নাই। কিন্তু সেই মহান আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই আমরা দুর্গম পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়াছি এবং ভবিষ্যতেও শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে সে আদর্শ হইতে স্খলিত হইব না, এ ভরসা রাখি।"

১৯২৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপিত হল: "গত বৎসর আনন্দবাজারে কংগ্রেস সংখ্যা বাহির হইবার পর এক ঘণ্টা মধ্যে নিঃশেষে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। পরে অনেকে আমাদের আফিসে আসিয়াও কাগজ পান নাই। এ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই মূল্য জমা লওয়া হইতেছে। যাঁহারা মূল্য জমা রাখিবেন তাঁহারা নিশ্চিত কাগজ পাইবেন। মূল্য আট আনা মাত্র, মফঃস্বলে ডাকমাশুলসহ দশ আনা।"

১৯২৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'কংগ্রেস—বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশিত হল।

১৯২৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সত্যেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হলেন। পরদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "গতকল্য রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কলিকাতার সি-আই-ডি পুলিশ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে খানাতল্লাস করে এবং ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে। 'আনন্দবাজারে'র কংগ্রেস সংখ্যার 'বাঙলায় স্বাধীনতার চেষ্টা—বিপ্লবের পথে' শীর্ষক প্রবন্ধের জন্যই এই অভিযোগ। সম্পাদক জামীনে খালাস আছেন।..."

১৯২৯ সালের ২০-মার্চ পুলিশ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে খানাতল্লাসী করল, কতিপয় পুঁথিপুস্তক চিঠিপত্র নিয়ে গেল। অথচ ওয়ারেণ্টে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে খানাতল্লাসীর কোন নির্দেশ ছিল না। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৯২৯ সালের ২১ মার্চ, লিখেছে: "আমরা জানিতে চাই, ওয়ারেণ্টে নির্দ্দেশ না থাকিলেও, কোন অধিকারবলে পুলিশ "আনন্দবাজার পত্রিকা" অফিস খানাতল্লাসী করিল এবং সেখান হইতে কাগজপত্র লইয়া গেল?"

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কংগ্রেস বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাঙলায় স্বাধীনতার চেষ্টা—বিপ্লবের পথে', শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের নামে রাজদ্রোহের মামলা দায়ের হল। চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট রক্সবার্গের আদালতে।

সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—মহাত্মা গান্ধী প্রচারিত অহিংসানীতির জন্য 'আনন্দবাজার

পত্রিকা' সুপরিচিত। গবর্ণমেণ্টের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ অথবা অসন্তোষ প্রচারের উদ্দেশ্যে আমি প্রবন্ধটি প্রকাশ করিনি। বিশেষ সংখ্যায় ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রকার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস প্রদত্ত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অরঞ্জিত ভাবে বিবৃত করা হয়েছে—অসন্তোষ উদ্রেক করা বা বিপ্লবীদের সহিংসানীতি কোথাও সমর্থন করা হয়নি। পক্ষান্তরে প্রবন্ধটির মধ্যেই এমন সমস্ত ইঙ্গিত আছে যদ্দারা বোঝা যায় যে প্রবন্ধকার সহিংসনীতি অসমর্থন করেছেন।

বিচারক রায় দিলেন—সম্পাদকের হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে একমাস সশ্রম কারাদন্ড। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৯২৯ সালের ২৭ মার্চ, লিখেছে: "বিশেষ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার জন্য—"আনন্দবাজার পত্রিকা"র নামে যে রাজদ্রোহের অভিযোগ হইয়াছিল, তাহাতে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সম্পাদককে দোষী সাব্যস্ত করিয়া একহাজার টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন। ইহার জন্য আমরা প্রস্তুতই ছিলাম, কেননা রাজদ্রোহ আইনের অর্থ যেরূপ ব্যাপক ও চারিদিকে দমননীতির যেরূপ প্রসার দেখা যাইতেছে, তাহাতে উহার বেড়াজাল হইতে আমরা সহজে মুক্তি পাইব মনে করিতে পারি নাই।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা' অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করল ১৯২৯ সালের ২৪ মার্চ: সেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "দেখিতে দেখিতে সাতটী বর্ষ চলিয়া গেল। দিনে দিনে দিন গণিয়া চলিয়াছি। একদিন কমলাকান্তরূপী ঋষি বঙ্কিমও ১২৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে দিন গণিয়াছিলেন—দিন গণিয়া গণিয়া শুভদিনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়াও তিনি দিনের নাগাল পান নাই। দায়স্বরূপপ্রাপ্ত সেই অসমাপ্ত কাজ দেশসেবা-ক্ষেত্রের নগন্য সেবকরূপে আমরা গ্রহণ করিয়াছি। দিন গণিব, কেননা, আমাদের ভরসা আছে। দিন গণিব, কেননা, পুনরুত্থানের আভাষ আজ সুস্পষ্ট। দিন গণিব, কেননা, বিঘ্নবহুল ক্ষুরধার নিশিত দুর্গমপথের যাত্রীদের পদধ্বনি কালের বক্ষে কাণ পাতিয়া নিত্য শুনিতেছি। দিন গণিব, কেননা শুভদিন আসিবেই।"

আশা ব্যর্থ হয়নি। শুভদিন এসেছে।

১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পুলিশ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে খানাতল্লাসী করেছে এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কংগ্রেস সংখ্যার অবিক্রিত সংখ্যাগুলি নিয়ে গেছে।

বেঙ্গল-গভর্ণমেণ্টের সমসাময়িক নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে: Proscription. Issuing a notfication under section 99A of the Criminal Procedure Code forfeiting all copies of the Congress Special number of the "Ananda Bazar Patrika" in Bengali, dated the 29th December 1929, and fowarding Copies of the notification to the Government of India, Director General of Post and Telegraphs, all Local Governments and Administrations and all local officers of this Governcent."

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩০ সালের ১৬ মার্চ, নবম বর্ষে পদার্পণ করে লিখেছে: "আনন্দবাজার দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার সহিত অটলোন্নত শিরে যুদ্ধ করিয়াছে,—স্বদেশী ও বিদেশী প্রবলগণের রোষরক্তিম দণ্ডাঘাত সহ্য ও উপেক্ষা করিয়াছে। কোন ক্ষয়ক্ষতি

তাহাকে আদর্শভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। দেশের জাতিবর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে গণ-নারায়ণের পূজা-মন্দিরের দীন পূজারীরূপে, "আনন্দবাজার" চিরদিনই দীন দুর্ব্বল, পতিত অসহায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছে।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩০ সালের ১ মে, লিখেছে: "নূতন প্রেস অর্ডিন্যান্স আমাদের মাথার উপর শাণিত খড়্গের মত ঝুলিতেছে, কখন নিপতিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান অর্ডিন্যান্স সহ্য করিয়া কোন জাতীয় সংবাদ পত্রের পক্ষে দেশ ও জাতির নিকটে কর্ত্তব্য পালন করা অসম্ভব। সুতরাং যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের হয়ত কার্য্যক্ষেত্র হইতে কিছুদিনের জন্য বিদায় লইতে হইতে পারে। আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক বর্গকে এই কথাটা আজ দুঃখিত অন্তঃকরণে জানাইয়া রাখিতেছি।"

সরকারী দৌরাত্ম্যে ১৯৩০ সালের ২ মে থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বন্ধ থেকেছে। উত্তরকালে পাতিরাম পারিজা বলেছেন: "সুরেশবাবু আর মাখনবাবু এই সরকারী আদেশ দেখে চটে গেলেন। বললেন, 'আমার কাগজ যদি আমার দেশের মানুষের কথা স্বাধীনভাবে বলতে না পারে তবে আর কাগজ করে লাভ কি? তার চেয়ে ছ'মাস বন্ধ থাকাও ভালো, তবুও সরকারী আদেশ মেনে কাগজ বার করব না।' অতএব, সব কাগজ সেই আদেশ মেনে নিলেও, আনন্দবাজার তা মেনে না নেওয়ায় ছ'মাস বন্ধ থাকল।[৪]

পত্রিকা ছ'-মাস বন্ধ, কিন্তু কর্মীরা কি বেতন পাননি? হেমন্তকুমার বসু, ১৯৫৯ সালের ১৪ এপ্রিল, বলেছেন: "এক সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকার রচনায় ভীত হইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়ের উপর বাধানিষেধ আরোপ করেন এবং উহা প্রকাশের পূর্বে সরকারী অনুমোদনের নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রতিবাদে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রায় ছয়মাসকাল বন্ধ থাকে। প্রফুল্লকুমার ও সুরেশচন্দ্র কর্মীদের বসাইয়া রাখিয়াও ঐ সময়ের বেতন দিয়া গিয়াছিলেন।"

১৯৩০ সালের ১ নভেম্বর থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক হয়েছেন মাখনলাল সেন।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩০ সালের ১ নভেম্বর, লিখেছে: "আজ আমরা দেশবাসীকে অভিবাদন করিয়া, যাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অশেষ দুঃখ সহ্য করিয়াছেন, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছি এই ছয় মাসে "আনন্দবাজারের" প্রতি লোকের আন্তরিক স্নেহ, ভালবাসা ও বিশ্বাসের যে পরিচয় পাইয়াছি, আমরা যেন তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩০ সালের ৬ ডিসেম্বর, বিজ্ঞাপিত করেছে:

"ছয়মাস বন্ধ থাকার পর
দেশবাসীর সেবার সংকল্প লইয়া
আনন্দবাজার পত্রিকা
পুনঃ প্রকাশিত হইল।
দেশবাসীর সহানুভূতি
এবং
দেশবাসীর সহায়তাই
আনন্দবাজারের একমাত্র সম্বল।

আশা করি আনন্দবাজার এই সহানুভূতি এবং সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইবে না। আনন্দবাজারে প্রকাশার্থ সংবাদ পাঠাইয়া, আনন্দবাজারের গ্রাহক হইয়া, আনন্দ-

বাজারে বিজ্ঞাপন দিয়া, আনন্দবাজারের দেশসেবায় সহায়তা করুন।

সংবাদ পাঠাইবার নিয়ম

যথাসম্ভব সংক্ষেপে কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট অক্ষরে সংবাদ লিখিবেন। সংবাদে যেন কোন অতিরঞ্জন না থাকে বা কাহারও প্রতি অযথা আক্রমণের ভাব না থাকে। সংবাদদাতা নিজ নাম-ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। সংবাদের সঙ্গে ফটো পাঠাইতে পারিলে ভাল হয়। কোন সংবাদ প্রকাশ করা না করা সম্পাদকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। অপ্রকাশিত চিঠি ফেরৎ চাহিলে চিঠির সঙ্গে নাম-ঠিকানা ও ডাকটিকেট সংযুক্ত লেপাফা পাঠাইবেন।

গ্রাহক হইবার নিয়ম

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা

বার্ষিক মূল্য ১৪৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭৲ টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪৲ টাকা মাত্র।

অর্দ্ধ সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক মূল্য ৩৲ টাকা।

মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে মূল্য প্রাপ্তির দিন হইতেই পত্রিকা পাঠান হয়। ভিঃ পিঃতে লইলে প্রথম পত্রিকা পাইতে অযথা অনেক বিলম্ব হয় এবং খরচও কিছু বেশী পড়ে।

যদি কোন বিজ্ঞাপন আপত্তিজনক মনে হয়, তবে তাহা লওয়া হইবে না। বিদেশী কাপড় এবং মদের বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পত্র লিখিলে বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী ও মূল্যের হার জানিতে পারিবেন।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩০ সালের ২৬ নভেম্বর, লিখেছে: "রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের প্রতিবাদে গত ১২ই তারিখ পুলিশ কমিশনারের আদেশ অমান্য করিয়া একটি মিছিল বাহির করা এবং এক জনসভায় বক্তৃতা করার অপরাধে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক ও বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদের অষ্টম সভাপতি শ্রীযুত মাখনলাল সেনের প্রতি কলিকাতা পুলিশ আইনের ৬২(ক) এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা অনুসারে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদশ হইয়াছে।"

১৯৩০ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক, মুদ্রক ও প্রকাশক হয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র সেন।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৯৩০ সালের ২১ জুলাই কারাবরণ করেছেন। যখন মুক্তি পেলেন, জানা গেল যে কারাবাসকালে তাঁর শরীরের ওজন আঠারো পাউন্ড কমে গেছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩০ সালের ১৭ ডিসেম্বর লিখেছে: "প্রায় ছয়মাস কাল কারাদন্ড ভোগের পর আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার গতকল্য সন্ধ্যাকালে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রবাবু আনন্দবাজার পত্রিকার গত কংগ্রেস সংখ্যায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আজ কারামুক্ত সত্যেন্দ্রবাবুকে আমরা আনন্দবাজারের পক্ষ তথা আনন্দবাজারের হিতৈষীবর্গের পক্ষ হইতে অভিনন্দন করিতেছি। দেশ সেবার পুরস্কার স্বরূপ সত্যেন্দ্রবাবু কারাবরণ করিয়াছিলেন, সেজন্য আমাদের কোন দুঃখ নাই। তিনি পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া স্বদেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করুন ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।"

১৯৩১ সালের ১৯-মের পর 'আনন্দবাজার পত্রিকা আর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত হয়নি। ১৯৩১ সালের ২০-মে থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' '১৮নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা আনন্দ প্রেস হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত' হয়েছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩১ সালের ২১-মে, বিজ্ঞাপিত করেছে: "আনন্দ-বাজারের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত

করা যাইতেছে যে, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিস ১৮নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছে। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সমস্ত এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।"

এই সময়েই যোগেন্দ্রমোহন সেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় একজন কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। উত্তরকালে তিনি বলেছেন: "তখন আনন্দবাজারের অফিস ১৮নং মীর্জাপুর ষ্ট্রীটে। অফিস বলতে যা বোঝায় ১৮নং মীর্জাপুর ষ্ট্রীটের বাড়িটি মোটেও সেরকম ছিল না। স্বল্প চেয়ার টেবিল নিয়ে কোনো রকমে কাজ চালানো গোছের ব্যাপার। আমরা সবাই একসঙ্গে বসে কাজ করতাম।... সে সময় মাত্র চারজন লোক নিয়ে অ্যাকাউন্টস বিভাগ। আমি অ্যাকাউন্ট্যান্ট, সুধীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বিভূরঞ্জন গুপ্ত আর টাইপিস্ট চুনীলাল দাশগুপ্ত। সারকুলেশনের কাজ দেখতেন তিনজন।"[৫]

১৯৩১ সালের ১১ জুন থেকে আবার সম্পাদক হলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। মুদ্রাকর ও প্রকাশক—বঙ্কিমচন্দ্র সেন।

১৯৩১ সালের ২৭ জুলাইয়ের বেঙ্গল-গভর্ণমেণ্টের একটি নির্দেশ:
"With reference to his letter, asking for a free supply of the publications entitled "India" and "Whitley Commission's Report", informing the Editor, "Ananda Bazar Patrika, Ltd.," that these are priced publications of the Government of India and that they are distributed by the Central Government and not by the local Government."[৬]

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক, ১৯৩১ সালের ২৯ জুলাই, গভর্ণমেণ্টকে লিখেছেন:

"To

The Secretary,
Government of India,
Departments of Education,
Health and Lands,
Simla.

Through the

Deputy Secretary,
Government of Bengal,
Political and Appointment Departments,
Calcutta.

Dear Sir,

In forwarding herewith the copy of a letter from the Deputy Director of Public Information to the Government of India I have to draw your attention to the fact that the Ananda Bazar Patrika, which enjoys the largest circulation amongst vernacular dailies in Bengal, does not receive complimentary copies of the official reports etc., of Government of India. In view of the fact that these publications are indispensably necessary for the proper conduction of the Journal, I shall feel much obliged if you will extend us the courtesy of sending complimentary copies as is done in the case of other Journals.

I have further to add in this connection that the Bengal Government have all along been supplying us with official publications.

Thanking you."

বেঙ্গল-গভর্ণমেণ্ট ১৯৩১ সালের ৩১ অগাস্ট চিঠিখানি যথাস্থানে দাখিল করে লিখেছে:

"I am directed to submit for the orders of the Govt. of India, an application dated the 29th July 1931 from the Editor of the Ananda Bazar Patrika and enclosure, regarding free supply of Government of India publications.

The paper is extremist in tone and consistently hostile to Govt. It has, however, a circulation over 3000 sold copies and commands some influence, and is for these reasons supplied free with Bengal Government publications. The Governor in Council has no objection to the request of the Editor being granted." ৭

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"With reference to his application regarding free supply of Government of India publications, informing the Editor, "Ananda Bazar Patrika", that the matter was referred to the Government of India, Department of Education, Health and Lands, who intimate that in view of the present financial position they regret that they are unable to supply him with copies of their publications, free of cost." ৮

'আনন্দবাজার পত্রিকা' সে সময়ে কোথাও কোথাও বাড়তি দামেও বিক্রীত হয়েছে। কিন্তু 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এই অন্যায়ের প্রতি উদাসীন থাকেনি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর, লিখেছে: "আমরা জানিতে পারিলাম যে, কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে কোন কোন হকার 'দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা' দুই পয়সার পরিবর্তে তিন পয়সা, চার পয়সা করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। আমরা উহা বন্ধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। এ বিষয়ে আমরা পাঠকদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। প্রথমতঃ তাঁহাদের প্রতি অনুরোধ এই যে, দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতি খণ্ডের মূল্য দুই পয়সার বেশী কেহ দিবেন না। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন হকার দুই পয়সার বেশী দাবী করে, তবে তাহা তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে জানাইবেন। আমরা প্রতিবিধানের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিব।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর, বিজ্ঞাপিত করেছে: "অদ্য আনন্দবাজার পত্রিকার যে বিশেষ সান্ধ্য সংস্করণ বাহির হইবে, তাহাতে অদ্য অপরাহ্নে টাউন হলের সভায় সভাপতি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত সম্পূর্ণ বক্তৃতা থাকিবে। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছামত ঐ সংস্করণের মূল্য প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা হইবে, এবং উহার মধ্যে এক পয়সা (অর্থাৎ বিক্রয়লব্ধ অর্থের অর্ধেক) চট্টগ্রামের নির্যাতিত হিন্দুদের সাহায্যার্থ রবীন্দ্রনাথের হস্তে অর্পণ করা হইবে।"

অভূতপূর্ব জনসমাগমের জন্য সেদিন টাউন হলে সভা হতে পারেনি, সভা হয়েছে মনুমেণ্টের নিচে, অপটু শরীর নিয়েও রবীন্দ্রনাথ সভায় এসেছেন, হিজলীতে গভর্ণমেণ্টের কাপুরুষতা ও পশুত্বের বিরুদ্ধে কয়েকটি অমোঘ বাক্য উচ্চারণ করেছেন।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর, লিখেছে:

"ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের সেক্রেটারী শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু জানাইতেছেন: ভারতের সমস্ত প্রদেশের দেশীয় সংবাদপত্র এবং মুদ্রাযন্ত্রের পরিচালকদের সম্মতিক্রমে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, আগামীকল্য বুধবার ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রস্তাবিত সংবাদপত্র দমন আইনের প্রতিবাদ দিবসরূপে গণ্য হইবে। সুতরাং ঐ দিন কোন দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবে না।...

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আগামীকল্য বুধবার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হইবে না।"

সুতরাং ১৯৩১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হয়নি।

১৯৩১ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র আর্থিক অবস্থার ঈষৎ পরিবর্তন হয়েছে। উত্তরকালে যোগেন্দ্রমোহন সেন বলেছেন: "১৯৩১ সালে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার ঈষৎ পরিবর্তন হয়। পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার জন্যই বোধ হয় কাগজের বিক্রী এবং বিজ্ঞাপন একটু একটু বাড়তে থাকে। ১৯৩১ সালের আগে বছরে বিজ্ঞাপন পেতাম পঁচিশ হাজার টাকার মতো। তাও আবার সব আদায় হত না। চার আনা, তিন আনা তখন বিজ্ঞাপনের রেট ছিল, তদুপরি ছিল ঢালাও কনসেশন। ওটা আমরাই দিতাম। কারণ সেসময় আমরা কোনোরূপ সরকারী বিজ্ঞাপন পেতাম না, অন্যান্য বিজ্ঞাপনও না।"[৯]

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্রে জানা যাচ্ছে:

"With reference to the departmental letter the District Magistrate, Rangpur, supplies facts about the report of burning the house of Babu Priyanath Biswas published in the "Ananda Bazar Patrika" of the 1st March 1932. The letter is filed."[১০]

ধর্মে, রাষ্ট্রে ও সমাজে সমষ্টিমুক্তি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র আদর্শ। প্রচলিত অর্থে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বিত্তশালী হয়নি, কিন্তু ভিন্ন অর্থে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সেদিন বিপুল বিত্ত অর্জন করেছে—দেশবাসীর সহানুভূতি ও স্নেহ।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩২ সালের ২২ মার্চ, একাদশ বর্ষে পদার্পণ করে লিখেছে: "আনন্দবাজারের আদর্শ পাঠক পাঠিকারা জানেন। তাঁহারা জানেন, ধর্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে "আনন্দবাজার" সমষ্টি-মুক্তির সাধক। এই সাধনার পরিস্ফুট মূর্তি দেখিবার জন্য আমরা অধীর। এই অধীরতার চাঞ্চল্য ও গতিবেগে আদর্শের কথা বলিতে গিয়া, কর্মের কথা বলিতে গিয়া যদি কটু কহিয়া থাকি, অশোভন বাক্য বলিয়া থাকি, তবে সে দোষ আমাদের নিশ্চয়ই। কিন্তু তাহার জন্য আমরা সকলের কাছে ক্ষমা চাহিব, কেননা, তাঁহারা আমাদের উদ্দেশ্যকে সাধু জানিয়া নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন।"

সেদিনের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে আরো কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করি: "আনন্দবাজার পত্রিকা দরিদ্র নহে! দেশবাসীর শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালবাসা, অনুরাগ, আনন্দবাজারের বিপুল বিত্ত! এ সম্পদ লইয়া আমরা আজ গর্ব করিব না, অহঙ্কৃত হইব না—পাঠক-পাঠিকা শুভানুধ্যায়ী, হিতৈষী, বন্ধুবান্ধব, শত্রুমিত্র, সকলের নিকট প্রার্থনা করিব, আমাদের কোন মূঢ়তায়, কোন ত্রুটিতে যেন আমরা সে বিত্ত হইতে বঞ্চিত না হই,—সকলের সহানুভূতি ও স্নেহ যেন তাহা আমরা যোগ্যতার সহিত রাখিতে পারি।"

"The keeper of the "Ananda Press" and the publisher of the

"Ananda Bazar Patrika", a Bengali daily, well served with notices by the Government to deposit with the Chief Presidency Magistrate by the 8th June (1932), Rs. 1,000 each for the publication of certain alleged objectionable passages on 17th April in an article entitled "England and India."[১১]

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"Forwarding for information to the Bengali Translator to the Government of Bengal, Copy of a letter from the Chief Presidency Magistrate reporting deposit of security of Rs. 1,000 each by the Publisher of "Ananda Bazar Patrika" and the Keeper of the Ananda Press."[১২]

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রকাশক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও 'আনন্দ প্রেসে'র কীপার জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুবিচারের আশায় আদালতে দরখাস্ত করলেন। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। আদালত রায় দিয়েছে:

"Reading the original Bengali and its authorised translation, it strikes me that the writer is bewailing the present economic condition of the country and that his comments are inspired by a comparison between the zeal and enthusiasm of the authorities in England and the alleged inaction of the authorities in India as regards the solution of questions relating to unemployment and to obtaining better facilities for purposes of trade and commerce. The writer goes on to accuse the authorities in India of suffering from a sort of inertia as regards taking measures which would revive trade and commerce. So far I do not find that there is any warrant for the action taken by the Government, but there are other passages in the offending article which I must consider, and the main question for decision in the present proccedings is whether there is any accusation that the authorities are of set purpose indifferent to the well-being of the people or that the inaction of the Indian Government is prompted by social discrimination. If the prosecution had been launched under section 124A Indian Penal Code, I should have had great difficulty in finding the writer guilty, but the position is here different. The intention of the writer is a thing which we are not entitled to take into account; we are concerned with the effect of the words used by the writer. Onus of proof in the present proceedings is on the petitioners. And I am constrained to hold that there are passages in the offending extracts which are hit by section 63(d) of the said ordinance. The passages that can easily be brought up against the petitioners are contained in paragraph 7 of the authorised translation. It is suggested therein that protection has been given to certain industries because they are carried on with foreign capital and are under foreign management. There, the word "Bideshi" in the

original Bengali does not necessarily connote "British" and it may be read as meaning "non-indigenous."

I am aware that in construing this passage one cannot overlook the main idea running through the entire article; but even after making all alowances I am reluctantly obliged to come to the conclusion in the light of what has been said by Mr. Justice Strachey in first Tilak case that the words used are such as may be considered to impute unworthy or dishonest motive to the Government, and therefore calculated to bring into hatred or contempt the Government or excite disaffection towards Government. I must, therefore, hold that the petitioners are without any redress and that, therefore, the petitions must be dismissed." [১৩]

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"The solicitor to the Government of Bengal forwards a copy of the judgment delivered by the High Court, Calcutta, in the matter of the Indian Press (Emergency Powers) Act, 1931, and in the matter of the "Ananda Bazar Patrika." This is filed after perusal." [১৪]

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩২ সালের ১৫ জুন, লিখেছে: "অদ্য ১৫ই জুন সকালবেলা শ্রীযুত মাখনলাল সেনকে জরুরী আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।"

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"Furnishing the editor of the "Ananda Bazar Patrika" with the facts about the false allegations contained in the report entitled "A Sub-Inspector of Police and a missionary charged with bental outrage" published in the issue of the paper of the 13th July 1932 and asking him to publish a suitable contradiction in an early issue of the paper." [১৫]

১৯৩২ সালের ১৭ অক্টোবর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপিত হয়েছে: "অদ্য
১৭ই অক্টোবর সোমবার হইতে আনন্দবাজার পত্রিকার সমগ্র কার্য্যালয় ১নং বর্ম্মণ
ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইল। পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে অনুরোধ
করা যাইতেছে যে, এখন হইতে তাঁহারা সমস্ত চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি এবং টাকা
পয়সা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।...আমাদের নূতন কার্য্যালয়ের ফোন নম্বর বড়বাজার
১৯৩৯।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র জন্য একটা মুদ্রাযন্ত্র কেনা হয়েছে। উত্তরকালে যোগেন্দ্র-
মোহন সেন বলেছেন: "১৯৩২ পর্যন্ত কাগজ ছাপা হত ফ্ল্যাট মেশিনে। ঐ সালেই
'ইংলিশম্যান' পত্রিকার ব্যবহৃত মেশিনটা কেনা হয়।" [১৬]

সুরেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন: "আইন অমান্য আন্দোলনের সময় এই পত্রিকা
পূর্ণ উৎসাহে আন্দোলনের জন্য প্রচারকার্য করিতে থাকে। অচিরাৎ শাসকশক্তি পত্রিকার
কণ্ঠরোধ করিবার জন্য বাহুবিস্তার করেন। মুদ্রাযন্ত্র অর্ডিন্যান্স অনুসারে—আনন্দ-
বাজার পত্রিকার নিকট হইতে জামানত দাবী করা হয়। কিন্তু তৎকালীন আইন অমান্য
আন্দোলনের নীতির প্রতি এবং গণ-সংগ্রামের আদর্শের প্রতি মর্যাদা রক্ষা করিয়া

আনন্দবাজার পত্রিকা মুদ্রাযন্ত্র অর্ডিন্যান্সের কাছে আত্মসমর্পণ করে নাই। ছয়মাসকাল পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ রাখা হয় এবং তাহার পর মুদ্রাযন্ত্র অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহৃত হইলে পুনরায় প্রকাশিত হইতে থাকে। এই ঘটনায় জনসাধারণের আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতি শ্রদ্ধা ও সমাদর বিপুল হইয়া উঠে এবং পত্রিকার পুন প্রকাশ মাত্র জনসাধারণ কর্তৃক পত্রিকা যে অভিনন্দন লাভ করে, ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসে তাহার তুলনা আছে বলিয়া মনে হয় না। পত্রিকার পাঠকসংখ্যা দিনে দিনে প্রবলরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এই দাবী মিটাইবার জন্য ১৯৩২ সালে পত্রিকা মুদ্রণের জন্য উচ্চ গতিবেগসম্পন্ন রোটারী যন্ত্র স্থাপিত হয়।"[১৭]

কলকাতার পুলিশ কমিশনার এল. এইচ. কলসন, ১৯৩২ সালের ৭-ডিসেম্বর, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারিকে লিখেছেন:

"I have the honour to refer to the article entitled "BANGLAR DAMAN NITI" (Policy of Repression in Bengal) at page 4 of Ananda Bazar Patrika dated the 15th November 1932 and to state that it tends to excite feeling of disaffection towards the Government established by law in British India. It therefore comes within the purview of Section 4(1) of the Indian Press (E. P.) act XXIII of 1931 as supplemented by section 77 of the special powers ordinance No. 10 of 1932.

The paper is edited, printed and published by Satyendra Nath Mozumdar at the Ananda Press at 1 Burman Street (declaration No. 263, dated 23. 9. 32) the owner of which press is Jagadish Chandra Mookherji (declaration No. 158, dated 28. 9. 32.).

I would request that the security of Rs. 1000/- deposited by the printer and publisher Satyendra Nath Mozumdar and also the security of Rs. 1,000/- deposited by the keeper Jagadish Chandra Mookherji in pursuance of the Political Department order No. 708 P.D. and 709 P.D., dated the 26th May 1932 respectively be forfeited to the Government under Sub Section (1) of 4 of the Indian Press (E. P.) Act XXIII 1931 in respect of the Press and under Sub Section (1) of 8 of the Indian Press (E. P.) Act XXIII of 1931 in respect of the paper."

১৯৩৩ সালের ১০-জানুয়ারি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে আদেশ করল:

"Whereas it appears to the Governor in Council that you Satyendra Nath Mozumdar publisher of the "Ananda Bazar Patrika" before the commencement of the Indian Press (Emergency Powers) Act 1931, (XXIII of 1931) hereinafter referred to as the said Act, filed a declaration under section 5 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (XXV of 1867) and you deposited a security of Rs. 1,000/- (Rupees one thousand) under Sub-section (3) of Section 7 of the said Act;

And whereas it appears to the Governor in Council that you

published in the issue of the newspaper "Ananda Bazar Patrika" of the 15th November 1932 an article containing words of the nature described in Sub-section (1) of Section 4 of the said Act, the objectionable passages of which are given in the annexure hereto;

And whereas the said passages, in the opinion of the Governor in Council, tend to bring into hatred or contempt the Government established by law in British India, or to excite disaffection towards His Majesty's Government;

Now, therefore, take notice that the Governor in Council in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 8 of the said Act, declares the sum of Rs. 500/- (Rupees Five hundred only) a portion of the security of Rs. 1,000/- deposited by you and all copies of the "Ananda Bazar Patrika" dated the 25th November 1932 wheresoever found, to be forfeited to His Majesty.

Annexure

The ruling authorities are ill-disposed towards Bengal. They seem unwilling even to consider how intolerablle the policy of repression is daily growing to the public! Yet the stories that are daily coming to our ears from Chittagong and Midnapore, we have lost even the capacity to put them in language. Are not the Calcutta authorities prepared even to enquire whether the local authorities, taking advantage of the powerlessness of the press which has been gagged by the ordinance, are satisfying their own whims or not?

Hundreds of youngmen were arrested and confined in detention camps without trial. People in the country thought or were compelled to think that the police did not detain anybody on vain suspicion. From time to time searches are made at various places in order to find out arms and weapous, and in most cases, the comment is that nothing incriminating could be found. This too causes harassment and humiliation to the householder in various ways, yet he puts up with (it), thinking of the supression of revolution. It is inevitable that subordinate officers armed with special powers should abuse them—this consolation is inadequate to-day when the authorities in Chittagong have enforced the curfew orders on only the Hindu youths and issued orders that it is Hindus alone who will have to pay a fine of eighty thousand rupees unless they can get revolutionaries arrested.

These measurrs are a denial of the fundamental principle underlying the Penal Code.

There is no argument, no reasoning behind this, this is the policy of repression, pure and simple. If the highest authorities whom the public regard as incarnations of justice, out of anger

against the revolutionaries, get ready to part with their sense of justice, it can be easily imagined what subordinate officers will do. If the policy of repression, adopted for the purpose of putting down the revolutionary movement or the revolutionaries, misses its aim and comes down upon the public, that too will be a sort of repression indeed, but it will not affect the revolutionries in the least—only the inoffensive public will be prosecuted. If the ruling authorities have not taken leave of both political wisdom and power of judgment at one and the same time, they will be able to realise its evil effect and its futile security.

If troops have been quartered at different stations merely to alarm and frighten the public, it is a different matter. But if they have been brought in to help in preserving law and order is not anybody entitled to know what the inner significance behind (such acts as) forcing people to close their umbrellas and indulgence in various sorts of harassment (on passers-by) in the public streets is? This show of spreading alarm amongst all the Bengali Hindus, enacted in connection with repression of revolution, has filled us with sadness.

We shall no more raise the question of over-colouring or exaggeration. He who cannot realise what little of inclination or courage is left for lodging complaints when people, with official liveries on, begin to engage in a frantic dance before the very eyes, will not understand what pains poor householders in the inmost recesses of their heart.

That villagers are abandoing home and village is not a tale,. is not an exaggeration or an over-coloured statement. Because soldiers would engage in target-practice at a village in the neighbourhood of Midnapore, orders were issued, "Leave the village and go away." In these dark days, where could one find shelter with one's wife and children—why would they have to abandon their homesteads—will no reply to this question come from any quarter? Let us leave out of this article the list of the daily harassments, big and small. The very brief and half-uttered tale of the achievements of the punitive police in Tamluk occupies a large space every day in the "Political Diary". If really it is not the wish of the highest authorities that oppression should be indulged in beyond the rules, why have they remained indifferent?

Unless they come forward unitedly who will to-day explain to the bureaucracy who depend only on ordinances that those who uphold the flag of peace and order are about to remove peace and order from the lives of the Bengalis."

১৯৩৩ সালের ১০-জানুয়ারী বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আদেশ করেন:

"Whereas it appears to the Governor in Council that you Babu Jagadish Chandra Mukherji, Keeper of the Ananda Press, before the commencement of the Indian Press (Emergency Powers) Act, 1931 (XXIII of 1931), hereinafter referred to as the said Act, filed a declaration under section 4 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (Act XXV of 1867) and you deposited a security of Rs. 1,000/- (Rupees one thousand only) under sub-section(3) of section 3 of the said Act;

And whereas it appears to the Governor in Council that you printed at the above press the issue of the 'Ananda Bazar Patrika' of the 15th November 1932 which had an article containing words of the nature described in sub-section (1) of section 4 of the said Act the objectionable passages of which are given in the annexure hereto;

And whereas the said passages in the opinion of the Governor in Council, tend to bring into hatred or contempt the Government established by law in British India or to excite disaffection towards His Majesty's Government;

Now, therefore, take notice that the Govenor in Council in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 4 of said Act, declares that the amount of Rs. 500/- a portion of the security of Rs. 1,000/- deposited by you to be forfeited to His Majesty."

সত্যেন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র অতঃপর কলকাতা হাইকোর্টে দরখাস্ত করেছেন। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের নির্দেশই অব্যাহত থেকেছে।

কলকাতা হাইকোর্ট, ১৯৩৩ ২০-ফেব্রুয়ারি, রায় দিয়েছে:

"In the High Court of Judicature at Fort William in Bengal. Civil Appellate Jurisdiction.

Present : The Hon'ble the Chief Justice, The Hon'ble Mr. Justice Pearson and The Hon'ble Justice M. C. Ghose.

In the matter of an application under section 23 of the Indian Press Emergency Powers Act 1931.

and

In the matter of orders under section 8(1) and 4(1) of the said Act.

and

In the matter of Satyendra Nath Majumlar Editor, Printer and Publisher of the Ananda Bazar Patrika and Jagadish Chandra Mukherjee, Keeper of the Ananda Press.

The 20th February 1933

This is an application in respect of an order made by the Government of Bengal whereby a newspaper called Ananda Bazar Patrika upon the footing that certain passages objectionable under sub-section 1 of section 4 of Act XXIII of 1931 as amended were published in its issue of the 15th of November 1932 was subjected to action under Section 8 of the Act. Security having been given, Rs. 500/- out of Rs. 1,000/- was declared to be forfeited.

The publisher applies to this Court and by Mr. Banerji takes the following points. Act XXIII of 1931 has not by itself governed the position at any material time. From sometime in the beginning of 1932 onward that Act has been supplemented either by an ordinance or by a more recent statute, Act XXIII of 1932. The date on which the ordinance ceased to supplement the earlier Act and Act XXIII of 1932 took its place may be put as the 19th of December 1932. The issue in which the matter complained of was published was prior to that date, namely the 15th of November 1932. The point taken by Mr. Banerji is that as the order for forfeiture or the first step in the proceedings against the news paper was not taken till the 10th of January 1933 his clients, apart from the merits, are entitled to be exempted, there being a lacuna in the provisions which carry on the order legislation into the new. That is his first point. Mr. Banerji's second point is that under the more recent Act—Act XXIII of 1932—his clients are entitled to the benefit of certain explanations which have been inserted for the first time by that Act. These explanations are to the effect that criticisms of the measures of the Government or Administrative actions of the Government are in certain circumstances not to be deemed to be objectionable for the present purpose. Criticisms or comments expressing disapprobation of the measures of the Government, if they are with a view to obtain alterations by lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection are said not to be within the mischief of the statute. To this the learned Advocate General while not pressing his doubt as to whether the applicants are entitled to the benefit of the explanations contends first that the explanation, if applicable, is of no avail as regards this particular publication as it does contain matters by which the publisher excites or attempts to excite hatred, contempt or disaffection. He says secondly that there is no such lacuna in the law as to present an order for forfeiture being made soon after Act XXIII of 1932 came into force in respect of security which had been taken under the previous legislation, notwithstand-

ing that the article complained of was published prior to the coming into force of the later Act.

In my judgment the application before use fails upon the merits in the sense that it appears to me that there is more than one passage in the article which cannot be absolved from the charge of coming under the expression "exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection". It is not necessary to read through the article as a whole; but there are passages in which the action of the Government is held up to as being repression for the sake of repression, as producing a state of nightmare over the Hindu community and as though the officers of the Government are recklessly engaged in a sort of dance of destruction.

That being so it appears to me that the only point left for consideration is the technical question which has been raised in the applicants' favour. Now both before and after the 19th of December 1932 the proceedings of the present character—an arrangement for giving security and for forfeiture the security for certain causes—were in existence under Act XXIII of 1931. That Act amended and extended up to the 19th of December 1932 by an ordinance and after that by similar provisions in Act XXIII of 1932. Section 19 of the later Act says that anything done in pursuance of the earlier Act as amended by a certain ordinance shall upon the commencement of this Act be deemed to have been done in pursuance of the corresponding provisions of the previous Act as amended by this Act. The security which was taken under the previous legislation and it is not suggested that on the 15th of November 1932 the publication of the objectionable matter was not contrary to the then existing law. The same provisions making such publication to entail certain cosequences exist under the more recent Act. While I am prepared to rule that the applicants are entitled, being proceeded against under the more recent Act, to the benefit of the explanation, I am not of opinion that there is any substance in the contention that because proceedings were not initiated until the later Act had come into force no proceedings can be initiated at all. The exclusion of such a contention in the case of an offence may be seen in section 20. Section 19 is not to be read on the same principle as though the present proceedings were a prosecution for a criminal offence. We are here dealing with administrative action which the Government is authorised to take in certain circumstances. It is quite true that it is only authorised to take such action when objectionable matter is published. But in my judgment it is not reasonable

to construe section 19 as meaning that if proceedings had been initiated before the 19th of December that could have been continued under the Act of 1932 but that if initiated after the Act of 1932 came into force they are bad with the result that there is no remedy against the publication of objectionable matter.

On the whole it seems to me that this application fails and must be dismissed. We have under our rules power to award costs but it is not our practice to do so in such cases and I would make no order for costs in this case.

G. C. Rankin

I agree

H. G. Pearson

I agree

M. C. Ghose"[১৮]

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ জনু ১৯৫৫।
২। পাতিরাম পারিজার সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
৩। Political Department Proceedings Nos. B484-90, January 1930
৪। পাতিরাম পারিজার সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
৫। যোগেন্দ্রমোহন সেনের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
৬। Political Department Proceedings Nos. B396-97, July 1931.
৭। Political Department Proceedings Nos. B77-78, September 1931.
৮। Political Department Proceedings Nos. B113-14, October 1931.
৯। যোগেন্দ্রমোহন সেনের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
১০। Political Department Proceedings Nos. B189-90, April 1932.
১১। Indian Recorder, April-June 1932 (Calcutta, 1932), p. 313.
১২। Political Department Proceedings Nos. B636-37, June 1932.
১৩। Indian Recorder, July-September 1932 (Calcutta, 1932), pp. 627-28.
১৪। Political Department Proceedings Nos. B726-36, August 1932.
১৫। Political Department Proceedings Nos. B216-17, August 1932.
১৬। যোগেন্দ্রমোহন সেনের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
১৭। আনন্দবাজার পত্রিকা, কংগ্রেস সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৪৮, পৃষ্ঠা ৫৬।
১৮। Political Department Proceedings Nos. B702-12, March 1933.

ইতিহাসে আনন্দবাজার

১৯৩৩ সালের ১২ মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করল। সেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "এই অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনেও, দেশবাসীর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত সংবাদপাঠ-কামনা লক্ষ্য করিয়া, আমরা 'আনন্দবাজারের' কলেবর ক্রমে তিনগুণ বৃদ্ধি করিয়াছি। গত অক্টোবর মাস হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত আধুনিক রোটারী মুদ্রাযন্ত্রে ঘণ্টায় ৩০ হাজার করিয়া পত্রিকা মুদ্রিত হইতেছে। অতি দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা হইয়াছে। স্বদেশী বিদেশী সংবাদ ছাড়াও মফঃস্বলের অভাব অভিযোগও আমরা যত্নের সহিত ব্যক্ত করিয়া থাকি।"

দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছেন: "আনন্দবাজার পত্রিকা" দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিল জানিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর পড়িয়াও "আনন্দবাজার পত্রিকা" কোন দিন তাহার আদর্শ ত্যাগ করে নাই। সকল বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া নির্ভীক ভাবেই "আনন্দবাজার" দেশের প্রতি কর্ত্তব্য করিয়া আসিয়াছে। "আনন্দবাজার" এতদিন যে ভাবে আদর্শ রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে দেশের জনসাধারণের কাছে ইহা বিশেষভাবেই সমাদৃত। আমি কামনা করি, আরও বহু বৎসর ধরিয়া "আনন্দবাজার" দেশের সেবা করুক। তাহার দীর্ঘজীবন দেশবাসী মাত্রেই প্রার্থনা করে।"

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "আনন্দবাজার পত্রিকা" বহু বৎসর ধরিয়া অক্লান্তভাবে এবং নির্ভীকতা ও যোগ্যতার সহিত জাতীয় কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। এই কাগজখানির আরও অধিক সাফল্য কামনা করিতেছি।" এবং সর্বোপরি আছে রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাণী:

"তোমার লেখনী যেন ন্যায়দণ্ড ধরে
শত্রুমিত্র নির্বিভেদে সকলের পরে।
স্বজাতির সিংহাসন উচ্চ করি গড়ো,
সেই সঙ্গে মনে রেখো সত্য আরো বড়ো।
স্বদেশেরে চাও যদি তারো উর্দ্ধে ওঠো,
কোরো না দেশের কাছে মানুষেরে ছোটো।"

সে-সময়ে কংগ্রেস সম্পর্কে বিস্তর ধরপাকড় হয়েছে, ১৯৩৩ সালের ৩০ মার্চ সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার গ্রেপ্তার হলেন। দিনকয়েক পরে ৬ এপ্রিল দু'জনেই মুক্তি পেলেন।

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"The commssioner of police brings to the notice of Government an objectionable article under the heading "Value of agricultural products" published in the "Ananda Bazar Patrika", dated the 28th May 1933."[১]

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রথম নিজস্ব রিপোর্টার সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এসেছেন ১৯৩৩ সালের ২৮ জুন। দু-একদিন পরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় আরো একজন নিজস্ব রিপোর্টার এলেন—মণীন্দ্র ভট্টাচার্য। ইতিপূর্বে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কোনো নিজস্ব রিপোর্টার ছিল না। উত্তরকালে মণীন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন: "তখনকার দিনে রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য আমাদের পায়ে হেঁটে ঘুরতে হত। পকেটে পয়সা থাকলে ট্রামে চড়তে পেতাম। এই ভাবেই বহুদিন আমরা শহরের বিভিন্ন সভাসমিতি, ঘটনা এবং দুর্ঘটনার খবর যোগাড় করতাম।"[২]

সেসব দিনে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রিপোর্টারকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। পত্রিকার নিজস্ব গাড়ি নেই, রিপোর্টারের পকেট কপর্দকশূন্য, অথচ কাজের দায়িত্ব আছে। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। মণীন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন: "তখন শহরে যানবাহনের এত সুব্যবস্থা ছিল না। অফিসের নিজের গাড়িও ছিল না। একদিন রাত্রে অফিসে টেলিফোন এল যে কালীঘাটে কালীমায়ের মন্দিরের সামনের মণ্ডপে একজন পুরোহিত গলায় ক্ষুর লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তৎকালীন বার্তা সম্পাদক অমূল্য সেন বললেন, আপনি বাড়ি যাওয়ার পথে খবরটা নিয়ে টেলিফোন করে আমাকে জানাবেন। তখন রাত ন'টা। আমি থাকতাম ভবানীপুরে। কালীঘাটে গিয়ে খবর সংগ্রহ করে টেলিফোন করতে গেলাম একটি বড়ো মুদি দোকানে। দোকানী জানাল, আট আনা পয়সা লাগবে। আমার পকেট তখন কপর্দকশূন্য। আমি বহুভাবে অনুরোধ করলাম বিনা পয়সায় ফোন করবার জন্যে। কিন্তু দোকানী রাজি হল না। অতএব কথায় কথায় একটু একটু করে আমার সঙ্গে তর্ক লেগে গেল। আমিও মেজাজ গরম করে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা অন্যরকম হয়ে গেল। দোকানের কর্মচারীরা বেরিয়ে এসে আমাকে মারতে লাগল। বেশ কিছু কিল, ঘুষি, চাপড় মেরে আমাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এল বড়ো রাস্তায়। দুই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করায় আমার লাঞ্ছনার অবসান ঘটল। অবশেষে একজনের কাছ থেকে পয়সা ধার করে অফিসে ফোন করলাম।"[৩]

পুলিশ কমিশনার, ১৯৩৩ সালের ১০-অক্টোবর, চীফ সেক্রেটারিকে লিখেছেন:

"I have the honour to refer to the articles entitled "Nari-Raksha" published at page 4 of the Ananda Bazar Patrika dated the 1st September 1933, "Andaman—Nirbash" at page 4 in its issue dated the 7th September 1933, "Utsaha Matha Birbhag" and "Jatkinchit" at page 4 in its issue dated the 31st August 1933 and to state that the first article offends against Section 4 clause (1), sub-section (d) and (h) and the other 3 articles come within the mischief of Section 4 clause (1) sub-section (d) of the Indian Press (Emergency Powers) Act XXIII of 1931.

The paper is edited, printed and published by Satyendra Nath Majumdar at the Ananda Press at Burman Street (declaration No. 128 dated the 4th September 1933)—the Keeper of which is Jagadish Chandra Mukherji (declaration No. 52 dated the 4th April 1933).

I would request that a portion of the security of Rs. 2000/- deposited by the printer and publisher Satyendra Nath Mojumdar and also from the security of Rs. 2000/- deposited by the Keeper Jagadish Chandra Mookherjee may be forfeited to the Government under clause (3), Sub-Section (1) of section 4 of the Indian Press (Emergency Powers) Act XXIII of 1931 in respect of the Press and Section 8 read with Section 7 of the said Act in respect of the paper".

বেঙগল গভর্ণমেণ্ট, ১৯৩৩ সালের ৯-নভেম্বর, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে আদেশ করেছে:

"Whereas it appears to the Governor in Council that you Satyendra Nath Majumdar publisher of the "Ananda Bazar Patrika" after the commencement of the Indian Press (Emergency Powers) Act, 1931 (XXIII of 1931), hereinafter referred to as the said Act, filed a declaration under section 5 of the press and Registration of Books Act, 1867 (XXV of 1867) and you deposited a security of Rs. 2000/- (Rupees two thousand only) under sub-section (1) of section 9 of the said Act;

And whereas it appears to the Governor in Council that you published in the issues of the newspaper "Ananda Bazar Patrika" of the 7th September and 18th October 1933 articles containing words of the nature described in sub-section (1) of section 4 of the said Act, the objectionable passages of which are given in the annexure hereto;

And whereas the said passages, in the opinion of the Governor in council, tend to bring into hatred or contempt the Government established by law in British India, or to excite disaffection towards His Majesty's Government, and also tend to incite to the commission of any cognizable offence involving violence;

Now, therefore, take notice that the Governor in Council in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the said Act, declares that the sum of Rs. 1000/- (Rupees one thousand only) a portion of the security of Rs. 2000/- (Rupees two thousand only) deposited by you and all copies of the "Ananda Bazar Patrika" dated the 7th September and the 18th October 1933 wheresoever found, to be forfeited to His Majesty.

Annexure

In brief, what underlies this arrangement is, in (the language

of) modern political dictionary, "reprisal".

The retaliatory measures of mediaeval sternness which exist are adequate enough for the preservation, of order and discipline.

He who is afraid of destruction, who, bound down by a hundred bonds of the narrowness of self-interest, shudders in dread of self-surrender and self-sacrifice, is not competent to worship the Mother. The worship of the Mother is a worship to be performed by a hero, not by a coward!

That is why you are in such a plight, that is why you shudder at the terror of the evil spirits who move about on the cremation ground at every step you swoon in fear of death, you are afraid to destroy, that is why you have forgotten how to build. It is because you have ceased to worship the Eternal Mother who is the embodiment of the energy necessary for creation, preservation and destruction that you are in this plight. There before you is the symbol of your energy, your emancipation, your progress— Kali with her fell jaws, with her garland of heads round her and human skulls.

Thou who dost accomplish all desires ! Come, Mother, O Goddess of Welfare, who dost reside on the cremation ground in this dark night, rouse Thyself to-day in Thy most fearful aspect,— dance, O Mother, to the most fearful rhythm of creation, preservation and destruction, dance again and with the cadence of that destructive dance, make this dead nation eager again with the anguish of a new creation".

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ১৯৩৩ সালের ৯-নভেম্বর জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আদেশ করেছে:

"Whereas it appears to the Governor in Council that you Babu Jagadish Chandra Mukherji, Keeper of the Ananda Press, after the commencement of the Indian Press (Emergency Powers) Act, 1931 (XXIII of 1931), hereinafter referred to as the said Act, filed a declaration under section 4 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (Act XXV of 1867) and you deposited a security of Rs. 2,000/- (Rupees two thousand only) under sub-section (1) of section 5 of the said Act;

And whereas it appears to the Governor in Council that you printed at the above press the issues of the 'Ananda Bazar Patrika' of the 7th September and the 18th October 1933 which had articles containing words of the nature described in sub-section (1) of section 4 of the said Act the objectionable passages of which are given in the annexure hereto;

And whereas the said pasages, in the opinion of the Governor in Council, tend to bring into hatred or contempt the Government

established by law in British India or to excite disaffection towards His Majesty's Government and also tend to incite to the commission of any cognizable offence involving violence;

Now, therefore, take notice that the Governor in Council in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, declares that the amount of Rs. 1,000/- (Rupees one thousand only) a portion of the security of Rs. 2,000/- (Rupess two thousand only) deposited by you to be forfeited to His Majesty".

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারির কাছে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৯৩৩ সালের ১৬ নভেম্বর, আবেদন করেছেন:

"The humble petition of Satyendra Nath Majumdar, son of late Mohim Chandra Majumdar of Village Gharinda, P. S. Tengail, District Mymensingh, at present resident of 1, Burman Street, Calcutta, most respectfully sheweth :

That an order dated Calcutta, the 9th November, 1933, was served on the petitioner on the evening of the 14th November intimating that the Governor in Council has been pleased to declare that the amount of Rs. 1,000/- out of the security of Rs. 2,000/- deposit of the petitioner in respect of the Ananda Bazar Patrika has been forfeited under section 10(1) of the Indian Press (Emergency Powers) Act of 1931.

That it is necessary under the provisions of clause 2 of section 10 to obtain the permission of the local Government for a further declaration as publisher and printer of the Ananda Bazar Patrika and the petitioner therefore prays for the aforesaid permission to apply for a further declaration as the publisher and printer.

That according to the provisions of clause 2 section 10 of the said Act the present declaration shall be deemed to be annulled after the expiry of 10 days from the date of issue of the notice and as such the petitioner prays that the local Government's permission on conditions which will enable the paper to continue publication may be granted to your petitioner.

And your petitioner in duty bound shall ever pray".

সত্যেন্দ্রনাথের এই আবেদন অগ্রাহ্য হয়নি। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট, ১৯৩৩ সালের ১৭ নভেম্বর, ব্যক্ত করেছে:

"There is no objection to the petitioner being permitted to make a declaration under section 5 of the Press and Registration of Books Act, 1867 as publisher of the Ananda Bazar Patrika".

কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯৩৩ সালের ২৮ নভেম্বর, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের ডেপ্যুটি সেক্রেটারিকে লিখেছেন:

"Referring to your letter No. 22283 Pub dated the 17th November, 1933, I have the honour to report for information of Govern-

ment that their order forwarded with your letter No. 22259 Pub dated 9.11.33 has been duly served. Both the publisher (Babu Satyendra Nath Majumdar) and Keeper (Babu Jagadish Chandra Mukherji) have appeared and deposited with me Rs. 5000/- each as security including the unforfeited balance of their previous deposit and filed fresh declaration". [৪]

অতঃপর 'দেশে'র* কথা। 'দেশ' প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৩ সালের ২৪ নভেম্বর। ১৯৩৩ সালের ২৪ নভেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপিত হয়েছে:

"আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড
কর্ত্তৃক পরিচালিত
বাঙলায় নূতন সাপ্তাহিক
দেশ

বাঙলা ভাষায় একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সাপ্তাহিক পত্রিকার অভাব বহুদিন হইতে অনুভূত হইতেছিল। এই অভাব দূরীকরণার্থ আনন্দবাজার পত্রিকা কার্য্যালয় হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদকতায় প্রথম সংখ্যা অদ্য ৮ই অগ্রহায়ণ প্রকাশিত হইবে।...

মূল্য
সডাক বার্ষিক—৫৲
ষাণ্মাসিক—২৷৷০ টাকা মাত্র
প্রতিখণ্ড নগদ—৴১০ পয়সা

ছয় মাসের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হইবে না। প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইবার জন্য অদ্যই মূল্য পাঠাইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন, সাপ্তাহিক "দেশ" বিক্রয় করিবার জন্য সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

এজেন্সীর সর্ত্ত ও নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।"

'দেশে'র প্রথম সংখ্যায় 'মহানগর' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের নাম—প্রেমেন্দ্র মিত্র। বলা বাহুল্য, 'মহানগর' বাঙলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় গল্প।

'দেশে'র জন্ম মুহূর্ত্তেই ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন: "দেশ" জয়যুক্ত হউক। যে ভাবে "আনন্দবাজার পত্রিকা" স্বদেশের ও স্বজাতির সেবা করিয়া আসিয়াছে, যে ভাবে একটি মুমূর্ষু জাতির মধ্যে প্রাণ-সঞ্চারের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, যে ভাবে নির্ভীক সৎসাহসের সঙ্গে জাতিকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতে "আনন্দবাজার" চাহিয়াছে, "দেশ" সেই ভাবে চলিয়া ধন্য হউক, "দেশ" দীর্ঘজীবী হউক, "দেশ" বাঙ্গালীর জীবনে শক্তি আনয়ন করুক...।"[৫]

দিনে-দিনে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রসারিত হয়েছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছেন: "আনন্দবাজার দিন দিন যে প্রকার প্রতিপত্তি লাভ করিতেছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মাতৃভাষার আদর উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে ভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছেন, সে ভাষাকে

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্যামল চক্রবর্তী লিখেছেন : প্রফুল্লবাবু (প্রফুল্লকুমার সরকার) সাপ্তাহিকের কথা উল্লেখ করলে গিরীনবাবু (গিরীন্দ্রনাথ মিত্র) রাজশেখরবাবুর (রাজশেখর বসু) দ্বারা নামকরণের প্রস্তাব করেন। সেই সময় রাজশেখরবাবু বর্তমান এ্যালবার্ট বিল্ডিংএ বেঙ্গল কেমিকেলের অফিসে বসতেন। গিরীনবাবুর প্রস্তাব অনুযায়ী প্রফুল্লবাবু নামকরণের কথা বললে রাজশেখরবাবু নামকরণ করেন 'দেশ'। সেটা—১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি। "(শ্যামল চক্রবর্তী : ছাপা হরফের হাট, কলকাতা, ১৯৭০, পৃঃ ৪৮)।

আর উপেক্ষা করা চলে না। সম্প্রতি আমি বলিয়া বলিয়া হয়রাণ হইতেছি যে, এক কপি 'দৈনিক আনন্দবাজার' পড়িলে এমন কোন জিনিষ অজ্ঞাত থাকে না যাহাতে ইংরাজী পত্রিকা পাঠ করার প্রয়োজন হয়।"[৬]

ঢাকায় এয়ার সার্ভিস চালু হল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কি কোনো কর্তব্য নেই? উত্তরকালে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেছেন: "ঢাকায় এয়ার সার্ভিস চালু হয়ে যাবার পর ইংরেজি কাগজগুলো ঢাকায় যেত। মাখনবাবু তাই একদিন বললেন, ঢাকা হচ্ছে বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট জায়গা আর সেখানে কিনা বাংলা কাগজ যাবে না—আনন্দবাজারও ঢাকায় যাবে। ফলে লোকসান দিয়ে হলেও তখনকার দিনের প্রতিষ্ঠিত এবং প্রখ্যাত ইংরেজি কাগজের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আনন্দবাজারও দু-হাজার কপি করে ঢাকায় পাঠানো আরম্ভ হল।"[৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৭২ সালের ১৩ মার্চ লিখেছে: "১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ঢাকায় বিমানযোগে আনন্দবাজার পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে সকাল ৮টা ৯টার মধ্যে ঢাকার লোকেরা আনন্দবাজার পড়তে পেতেন।"

১৯৩৪ সালের ১৫ জানুয়ারির ভূমিকম্পে উত্তর বিহার বিধ্বস্ত হয়ে গেল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নিজস্ব রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার অকুস্থলে উপস্থিত হয়েছেন, দিনের পর দিন অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করে সংবাদ ও ফোটো পাঠিয়েছেন।

হরিপদ মহালনবীশ লিখেছেন: "১৯৩৪ সালের বিহার ভূমিকম্পের বিস্তৃত সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার আনন্দবাজার পত্রিকার জীবনের আর এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ঐ বৎসর ১৫ই জানুয়ারী দ্বিপ্রহরের কিছু পর বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীরা যখন ধরিত্রীর বুকের কয়েকটি তীব্র কম্পন অনুভব করে, তখন কেহই ভাবিতে পারে নাই, সেই কম্পন উত্তর বিহারে প্রলয়ঙ্কর কান্ড ঘটাইয়াছে,—সেখানকার প্রায় প্রতিটি জনপদের উপর দিয়া করাল হস্ত বুলাইয়া দিয়াছে। আনন্দবাজার পত্রিকাই জীবন ও সম্পত্তি বিনাশের সেই মর্মভেদী বিবরণ প্রচারের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে। আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারগণ দিনের পর দিন, সময়ে অসময়ে দারুণ শীতে যোগাযোগ ব্যবস্থাহীন সেই শ্মশানভূমিতে মাইলের পর মাইল পায়ে হাঁটিয়া ভ্রমণ করিয়া সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, ধ্বংসলীলার ফটো তুলিয়াছেন।"[৮]

মণীন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন: "ঘটনাটা ঘটে ১৯৩৪ সালে। আমাকে এবং সুশীলবাবুকে আনন্দবাজার থেকে এই কাজের দায়িত্ব দিয়ে বিহার পাঠানো হয়। আমরা রেলে পাটনা পর্যন্ত যাই, তারপর বিহারের সর্বত্র রেললাইন বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ায় আমরা কখনো হেঁটে, কখনো বা টাঙ্গা করে ঘুরে ঘুরে খবর সংগ্রহ করি। আমি মুঙ্গের, মজফরপুর, মতিহারী, সীতামারি অঞ্চল ঘুরে নেপাল সীমান্তে রকশৌল পর্যন্ত যাই। সময়টা ছিল শীতকাল। সঙ্গে উপযুক্ত শীতবস্ত্র না থাকায় প্রচন্ড শীতে আমার চোখমুখ ফুলে যায়। এর ওপর যানবাহনের অসুবিধা থাকায় পায়ে হেঁটে পথ চলার ফলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। কিন্তু বিশ্রাম করার কোন অবসর ছিল না। কারণ, ধ্বংসের বার্তা ছাড়াও আমাদের আরেকটা বিশেষ কাজ ছিল বিহারের বাঙালী পরিবারদের খোঁজখবর সংগ্রহ করা। কেননা কলকাতায় আমাদের অফিস থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, বিহারের বাঙালীদের খোঁজখবর কলকাতায় তাঁদের আত্মীয়স্বজনকে পোঁছে দেওয়া হবে। ফলে আমাদের কার্য্যালয়ে প্রচুর চিঠি আসতে থাকে। আমরা বাঙালীদের খবরা-খবর সংগ্রহ করে লোক মারফৎ পাটনা পর্যন্ত পোঁছে দিতাম, সেখান থেকে অন্য কেউ আবার কলকাতার অফিসে পোঁছে দিত। এর ফলে বিহারপ্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে আনন্দবাজারের জনপ্রিয়তা ভীষণ বেড়ে যায়। কলকাতাতেও প্রচুর চাহিদা বাড়ে।...

আমাদের সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার ফটোগ্রাফার শ্রীবীরেন্দ্র সিংহও ছিলেন। বিধ্বস্ত বিহারের ফটোগুলিও পাঠকদের কাছে রীতিমত আলোচনার বস্তু ছিল।"[৯]

উত্তরকালে বীরেন্দ্রনাথ সিংহ লিখেছেন:

"১৯৩৪ সালের ১৫ জানুয়ারীর দিনটি ভারতের ইতিহাসে একটি বেদনাভরা ঘটনার দিন। বিহারের ভূমিকম্প। সেই ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিক্ষোভের এক আকস্মিক ঘটনার বিবরণ দেশের সকল সংবাদপত্রের পাতায় দেশবাসী তখন পড়ছেন। সেই সময় আনন্দবাজার পত্রিকা মানুষের সেই দুঃখের ও বিপর্যয়ের করুণ কাহিনীকে শুধু বিবরণের দ্বারা নয়, ঘটনার প্রত্যক্ষ রূপচিত্রের দ্বারাই পরিবেষণ করবার ব্যবস্থা করলেন। সেই হল আনন্দবাজার পত্রিকার নিয়মিত সংবাদ-ফটো পরিবেষণের সূত্রপাত।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম নিযুক্ত একজন ফটোগ্রাফার, তার সঙ্গে একজন রিপোর্টার, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত উত্তর বিহারের গ্রাম ও শহরের বেদনামাখা রূপের পরিচয় গ্রহণ করবার জন্য অভিযাত্রিকের মত সেদিন উত্তর বিহারের পথে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে শুধু একটি ¼ প্লেট ট্যাক্সো ক্যামেরা, তাতে ফিল্ম প্যাক ব্যবহার করাও যেত।"[১০]

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত বিহারের ছবি তোলার জন্য গিয়েছিলেন স্বয়ং এই বীরেন্দ্রনাথ সিংহ। ১৯৩৪ সালের এপ্রিলে বীরেন্দ্রনাথ ফোটোগ্রাফার হিসেবে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয়েছেন।

কিছুকাল পরে মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এলেন। তাঁর ছবি তুলতে বীরেন্দ্রনাথ গেলেন বেলুড় স্টেশনে। বিকেলে দেশবন্ধু পার্কে গান্ধীজীর সভা, সে-ছবিও তুলতে হবে। কিন্তু বিকেলে ছবি তুলে রাত্রির মধ্যে পত্রিকায় জমা দিতে হবে, সেদিনের পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

বাগবাজারের এক স্টুডিওর মালিক বীরেন্দ্রনাথকে অভয় দিলেন—সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভাববার নেই।

তাড়াতাড়ি গান্ধীজীর বিকেলের সভার ছবি তুলে বীরেন্দ্রনাথ ছুটলেন স্টুডিওতে। রোল ডেভলাপ করে প্রিণ্ট করাও হল, কিন্তু ফিল্ম শুকোতে চাইছে না। তখন স্টুডিওর মালিক তাড়াতাড়ি শুকনো কাপড় দিয়ে ফিল্মের উপরের জল মুছে দিলেন। কিন্তু, হায়, জলের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর মুখখানাও মুছে গেছে।

এদিকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় মাখনলাল অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন, এত দেরি করে এলে ছবি ছাপা হবে কখন?

বীরেন্দ্রনাথ বললেন—নিজেদের এনলার্জার না থাকাতেই এত ঝামেলা।

দিনকয়েক পরে এনলার্জার কেনার জন্য মাখনলাল বীরেন্দ্রনাথকে একটা ক্যামেরা কোম্পানীতে পাঠালেন। এনলার্জার এসে গেল। দোতলায় নিজস্ব বিভাগের পেছনে প্যাকিং-এর কাঠ দিয়ে ছোটো একটি ডার্করুমও হল।

তারপর আস্তে-আস্তে ফোটোগ্রাফিক ডিপার্টমেণ্ট বড় হয়েছে। শম্ভু চট্টোপাধ্যায় স্টোরে কাজ করেন, ফোটোগ্রাফিতে তাঁর বিশেষ উৎসাহ, স্টোরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই তিনি বীরেন্দ্রনাথকে সাহায্য করেন, শেষপর্যন্ত স্টোর থেকে একদিন তিনি পাকাপাকি স্টাফ ফোটোগ্রাফার হয়ে এলেন।[১১]

ফোটো তোলার কাজ নির্বিঘ্ন ছিল না, অনেক বাধা-বারণের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বীরেন্দ্রনাথ সিংহ লিখেছেন:

"ফটো তোলার কাজের পথে অনেক বাধা ছিল, বিশেষ করে রাজনীতিক ঘটনার ফটো তোলার কাজে। সেদিনের বিদেশী শাসকের কঠোর আপত্তি আঘাত ও দণ্ড উদ্যত হয়েই থাকত, এবং ফটোগ্রাফারকে অনেক নিগ্রহ বরণ করে নিয়েই এগিয়ে যেতে হয়েছে। পুলিশের লাঠি-চার্জের সম্মুখে, ঘোড়সওয়ারের তাড়নার আশেপাশে, গুলীবর্ষণের ঝলক ও ধোঁয়ার মধ্যে। আহত সত্যাগ্রহীর ও নীরব শহীদের ছবি তোলবার জন্য

ফটোগ্রাফারকেও বারবার জীবন বিপন্ন করতে হয়েছে, এমনই ছিল সেদিনের শাসকের বাধা নিষেধ আর আঘাত।...

আমেদনগর দুর্গ থেকে বন্দী মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে বাঁকুড়ায় নিয়ে যাচ্ছে সরকারের পুলিশ। খড়্গপুর স্টেশনে আনন্দবাজার পত্রিকার ফটোগ্রাফার প্রতীক্ষায় রয়েছে। তিনটা বাজার আগেই দলে দলে সাদা পোষাকে ছাতা হাতে (যদিও বৃষ্টির চিহ্ন নেই) পুলিশের দল আসতে লাগল। উপর থেকে অফিসারের ইশারায় পুলিশের লোকেরা প্রস্তুত হল।

মৌলানা আজাদ নামলেন। যেই ক্যামেরা তোলা অমনি সামনে পুলিশের ছাতা বাধা দিয়ে দাঁড়াল। ছুটে একটা ব্যাফলওয়াল ছিল তার উপর উঠে এক্সপোজার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সামনে ছাতা। এই ভাবে ৫।৬ খানা ফিল্ম তো নষ্ট হল। ফটোগ্রাফার ছুটে গিয়ে একটা বগীর ছাতে উঠে যেই ছবি তুলতে যাবে তখন পুলিশের লোকেরা তাড়াতাড়ি ছাতা খুলে মৌলানা আজাদের মুখ ঢেকে ফেলতে চেষ্টা করে। পুলিশ অফিসারেরা হাঁক দিতে লাগলেন, নেমে আসুন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হবে।"[১২]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চলের চিত্রগ্রহণের মধ্যেও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কৌশল কৃতিত্বর পরিচয় আছে। হরিপদ মহলানবীশ লিখেছেন: "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন জাপানীরা কলিকাতায় বোমা বর্ষণ করে, তখন উহার চিত্র প্রকাশ আনন্দবাজার পত্রিকার আর একটি স্মরণীয় কৃতিত্ব। বোমা বর্ষণের প্রথম দিন হইতেই আনন্দবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠায় উহার বিধ্বংসী চিত্র ফুটিয়া উঠিতে থাকে; আনন্দবাজার পত্রিকায় এইরূপ তিন চারিদিন বোমাবিধ্বস্ত কলিকাতার চিত্র প্রকাশের পর অন্য সংবাদপত্রে উহা প্রকাশিত হয়। অবশ্যই সেই চিত্র প্রকাশ করিতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইতে হইয়াছিল; কিন্তু সরকারের কোপ দৃষ্টিতে থাকিয়াও আনন্দবাজার পত্রিকা কিরূপে কাহার নিকট হইতে অন্যান্য সকলের পূর্বে সেই অনুমতি সংগ্রহ করিল, আজও বোধ হয় তাহা সাংবাদিক জগতে গবেষণার বিষয়। চট্টগ্রাম ও ফেণীতে বোমা বর্ষণের চিত্রও আনন্দবাজার পত্রিকায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারেও কম তৎপরতা ও কৌশলের প্রয়োজন হয় নাই।"[১৩]

মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালি পরিক্রমাকালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র চিত্রগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সেসব চিত্র যোগ্য সমাদর থেকে বঞ্চিত হয়নি। হরিপদ মহলানবীশ লিখেছেন: "মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালী পরিক্রমার সময় উহার সংবাদ সংগ্রহে ও চিত্রগ্রহণে আনন্দবাজার পত্রিকা ছিল শ্রম স্বীকারে ও অর্থব্যয়ে সমান অকৃপণ। আনন্দবাজার পত্রিকার ফটোগ্রাফার তখন যে সকল চিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে মহাত্মাজীর অনাবিল করুণা রসের দুর্বার অথচ স্নিগ্ধ ধারা এমন স্বচ্ছভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকার উহা লইয়া একখানা প্রদর্শনীয় চলচ্চিত্রই নির্মাণ করিয়াছে।"[১৪]

ছবির জন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ফটোগ্রাফার দিগ্বিদিকে ছুটেছেন, বহু ছবি তুলেছেন, সব ছবির মূল্য অবশ্যই সমান নয়, কিন্তু অনেক ছবিই বিশেষ মূল্যবান। বীরেন্দ্রনাথ সিংহ লিখেছেন: "১৯৩৪ সালের পর থেকে কংগ্রেসের সকল বৃহৎ সম্মেলনে, বোটানিক্যাল অভিযাত্রার সঙ্গে সিকিমের অধিত্যকার ১৬ হাজার ফুট উচ্চস্থানে, হানাদার লাঞ্ছিত কাশ্মীরে, নেপালে রাণাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঘটনাস্থলে, ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত আসামে, অরণ্যময় আদিবাসী অঞ্চলে, হিমাচল প্রদেশে; ঘটনার আহ্বানে কোথায় না ছুটে গিয়েছে পত্রিকার ফটোগ্রাফার? আনন্দবাজার পত্রিকার পরিবেষিত যে-সকল রাজনীতিক ঘটনার ছবি দেশের লোকের মনে চমৎকারিতার আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, লাল কেল্লার আজাদ হিন্দের বিচার, সিমলায় ওয়েভেল-কংগ্রেস-লীগ সম্মেলন, দিল্লীর এশিয়া সম্মেলন, গান্ধী-মাউন্টব্যাটেন সাক্ষাৎকার আর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের ক্ষমতা হস্তান্তর।"[১৫]

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি লিখেছে: "আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং বেংগল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্কসের শ্রীযুত রাজশেখর বসুর চেষ্টায় লাইনোটাইপ মেশিনে বাংগলা হরফের ছাঁচ বসাইবার আয়োজন হইয়াছে। মজুমদার মহাশয় বহু বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছিলেন। ইদানীং আনন্দবাজার পত্রিকার ছাপাইবার অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত তিনি প্রবল চেষ্টা আরম্ভ করেন। যুক্তাক্ষরগুলির গঠনসমস্যা লইয়া তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি রাজশেখরবাবুর শরণাপন্ন হন। রাজশেখরবাবু তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। রাজশেখরবাবুর সহায়তায় সুরেশবাবু একটি পরিকল্পনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। লাইনোটাইপ মেসিনারী লিমিটেড শ্রীযুত মজুমদারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। মেশিনটী কার্য্যকরী করিবার জন্য বাংগলার প্রায় ৬০০ হরফকে মেশিনের 'কী বোর্ডে' ১২৪টী ঘরে পরিণত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাইড কেসে প্রায় ৫০টী হরফ ও বিভিন্ন চিহ্নের ঘর থাকিবে।"

সেদিন কি কেউ ভেবেছিলেন, অদূরভবিষ্যতে সুরেশচন্দ্রের এই পরিকল্পনা সাফল্য অনিবার্য, বাঙলা মুদ্রণশিল্পে একটি নতুন যুগের জন্মমুহূর্ত আগতপ্রায়?

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৪ সালের ১ মার্চ ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করে লিখেছে:

"সমগ্র দেশের স্নেহ প্রীতি ও শুভেচ্ছা লাভ করিয়া ক্রমে যেখানে আসিয়া আনন্দবাজার উপনীত হইয়াছে, তাহা এই দরিদ্র দেশে দুর্লভ হইলেও আশাতীত নহে। দেশ দরিদ্র, কিন্তু তাহার আশা ক্ষুদ্র নহে। দেশের শুভ কামনাই আজ দুই পয়সায় ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী বাংগলা সংবাদপত্র সম্ভব করিয়াছে। আজ স্বদেশী ভাষার সংবাদপত্র যে সংবাদে, প্রবন্ধে, বহু বিষয়ের আলোচনায় বিজাতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিকে প্রচারে, প্রভাবে, প্রতিষ্ঠায় বহুদূরে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর—ইহা জাতীয় মনের জাগরণের সুস্পষ্ট পরিচয়, ইহা প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগ ও মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন।

সমাজ-জীবনে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত মনুষ্যত্ব ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বাধীনতার অপেক্ষা কাম্য কি? দ্বাদশবর্ষকাল সংবাদপত্রের সেবার মধ্য দিয়া এই দুই কামনার চরিতার্থতাই আমরা খুঁজিয়াছি। আমাদের ব্রত নিস্কাম নহে—সকাম। ভয় হইতে জড়ত্ব হইতে, চরিত্রহীনতার পংক হইতে আত্মসম্মোহনের বিভ্রম হইতে পরাধীনতার মূঢ় সন্তোষ হইতে—একটা জাতিকে জাগাইবার সকাম ব্রত। আমরা মোক্ষ চাহি না—আমরা চাহি ধর্ম, অর্থ, কাম।

ভারতের স্বরাজ সকাম রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতারই আদর্শ—উহা মোক্ষকামীর নিষ্কাম সাধনা নহে। কুসংস্কারে, অজ্ঞতায়, আকণ্ঠ নিমজ্জিত ত্রিশকোটী নরনারীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহারা—যাঁহাদের চিত্ত ভবিষ্যতের মহৎ সম্ভাবনাকে ভাবলোক হইতে কর্মক্ষেত্রে রূপান্তরিত করিবার উদগ্র কামনায় নিত্য জাগ্রত—দেশের সেই সব জাগ্রত নরনারীর ভাব ও কর্মধারা আনন্দবাজার নিত্যই আপামর সাধারণের মধ্যে বন্টন করিবার ব্রত যথাশক্তি পালন করিয়া আসিতেছে।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীকালী' ও 'আন্দামানে নির্বাসন' নামক দুটি প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে বেংগল গভর্ণমেণ্ট জরুরী প্রেস আইন অনুসারে জামিনের দু-হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে এবং দশ হাজার টাকা নতুন জামিন দাখিল করার আদেশ দিয়েছে। এই আদেশের বিরুদ্ধে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার হাইকোর্টে আবেদন করেছেন। হাইকোর্টে আবেদনের শুনানীর প্রারম্ভে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেছেন যে "শ্রীশ্রীকালী" সম্পর্কে

কোনো আপত্তি উত্থাপিত হবে না। অতএব কেবলমাত্র "আন্দামানে নির্বাসন" সম্পর্কেই শুনানী হল। কলকাতা হাইকোর্ট, ১৯৩৪ সালের ১৬ মার্চ, রায় দিয়েছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৪ সালের ১৮ মার্চ, লিখেছে: "হাইকোর্টের স্পেশ্যাল বেঞ্চ তাঁহাদের রায়ে গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ নাকচ করিয়া দিয়াছেন। স্পেশ্যাল বেঞ্চের অন্যতম জজ বিচারপতি মিঃ কষ্টেলো ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি শ্রীযুক্ত এস কে ঘোষ—উভয়েই একমত হইয়া আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছেন।"

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"In view of the orders of the High Court setting aside the demand of security from the publisher of the "Ananda Bazar Patrika" and the Keeper of Ananda Press, informing the Chief Presidency Magistrate, Calcutta, that the sums amounting to Rs. 4,000/- including the forfeited amounts of the publisher of the newspaper and Keeper of the press should be held as security deposits and the additional sums amounting to Rs. 8,000/- should be refunded". [১৬]

১৯৩৪ সালের ৭ জুলাই থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'সাপ্তাহিক চিত্র সংবাদ' নামে একটি নতুন নিয়মিত বিভাগ আরম্ভ হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভালো, ইতিপূর্বেও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' চলচ্চিত্র সম্পর্কে তথ্য ও মন্তব্য প্রকাশ করেছে। 'সাপ্তাহিক চিত্র সংবাদ' দীর্ঘজীবী হয়নি।

১৯৩৪ সালের ৮ ডিসেম্বর থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সিনেমা-থিয়েটার বিষয়ে 'সাপ্তাহিক রঙ্গজগৎ' নামে একটি নতুন নিয়মিত বিভাগ আরম্ভ হয়েছে। ১৯৪০ সালের ১০ মের পর 'সাপ্তাহিক রঙ্গজগৎ' আর প্রকাশিত হয়নি।

আগেই বলা উচিত ছিল, প্রবোধচন্দ্র সেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এসেছেন ১৯৩৪ সালে। মাসখানেক নিউজ ডিপার্টমেণ্টে কাটালেন, তারপর সার্কুলেশনে। সেসময়ে সার্কুলেশন, অ্যাকাউণ্টস, ক্যাশ আর ক্যাজুয়াল বিজ্ঞাপন একসঙ্গে ছিল। কয়েকজন কর্মী মিলেমিশে সব কাজ করতেন। বর্মণ স্ট্রীটের বাড়িতেই অবশ্যি শেষের দিকে কিছু কিছু ডিপার্টমেণ্ট ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। অতীতকালের বর্মণ স্ট্রীটের কথা স্মরণ করে সম্প্রতি প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন: "পত্রিকার কাজকে সবাই নিজের কাজ ভাবত। ফলে ঘড়ি ধরে কাজ করা আর কর্তা-ভৃত্য, বস্, সাব-অর্ডিনেট প্রভৃতি সম্পর্ক তখনো গড়ে ওঠেনি। সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করত, কখনো কারো মনে হত না যে কোনো ব্যাপারটা কর্মীদের ওপর আরোপ করা।"[১৭]

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"The editor of the "Ananda Bazar Patrika" has been warned in respect of an article entitled "Daman Niti"" published in the issue of his paper of the 10th March 1935". [১৮]

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৫ সালের ২০ মার্চ, চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করে লিখেছে:

"আজ বাঙ্গলা ভাষায় দৈনিকপত্র—প্রচারে, প্রভাবে ও প্রতিষ্ঠায় সমগ্র ভারতে যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে,—ইহা বাঙ্গালী জাতির প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগ ও মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধারই নিদর্শন।...

সমস্ত ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের মধ্যেও রাষ্ট্র ও সমাজে সমষ্টি-মুক্তির কামনার চরিতার্থতাই আমরা বর্ষের পর বর্ষ ধরিয়া অনুসন্ধান করিতেছি। সংবাদপত্রের অনেক

রকম কর্তব্য থাকিতে পারে; সংবাদ, প্রবন্ধ, চিত্র এবং বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ প্রভৃতি দ্বারা নানা শ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জনের বিপুল প্রচেষ্টাও সংবাদপত্রের কর্তব্য হইতে পারে;—কিন্তু এই পরাধীন দেশে সংবাদপত্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য—পরামুখাপেক্ষী ভয়ের জড়ত্ব হইতে, আত্মবিস্মৃতির বিভ্রম হইতে, পরাধীনতার মূঢ় সন্তোষ হইতে জাতিকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শে জাতিকে অনুপ্রাণিত করা অপেক্ষা মহত্তর লক্ষ্য পরাধীন দেশে আর কি আছে? সেই লক্ষ্য সাধনার জন্য—জাতীয় ঐক্য, বিশিষ্ট ও বিভক্ত সমাজের পুনর্গঠন প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিদিন সজাগ থাকিয়া আনন্দবাজার যথাসাধ্য তাহার কর্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছে।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাব কখনো প্রসন্ন হয়নি। সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"The Commissioner of Police, Calcutta, enquires whether a prosecution should be started against the paper "Ananda Bazar Patrika" under section 124A, Indian Penal Code, in connection with the article entitled "New Taxation". It has been decided that the editor should be warned on this occasion and action has been taken accordingly". ১১

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৯৩৫ সালের ১৮-সেপ্টেম্বর, গভর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করেছেন:

"From the copy of the Auditor's certificate that we are enclosing herewith you will be able to find that the Ananda Bazar Patrika attained in April last a net sale of 43,350 copies daily. This circulation figure which is hitherto unsurpassed by any other daily paper published in any language from any part of India, has since gone up much higher and is now about 50,000 copies daily. Its valuable service in catering the latest news of the day whether political, commercial, educational or otherwise and its sound editorial comments have won for itself a unique and unchallengable position both in prestige and popularity.

We are trying to make this paper still more useful and serviceable to all classes of readers and one work will be very much facilitated if we are supplied with free advance copies of your publications.

I may also mention here that it is also in the interest of the Government that full publicity be given as far as possible of the relevant portions of such reports and publications. May I not therefore expect that you would be pleased to include the Ananda Bazar Patrika in your free mailing list and supply us regularly with advance copies of all the publications of the Government of India. I understand that similar privilege is allowed to many other journals".

বেঙ্গল-গভর্ণমেণ্ট, ১৯৩৫ সালের ২১ নভেম্বর, ভারত-গভর্ণমেণ্টকে লিখেছে:

"I am directed to submit for the orders of the Government of

India an application, dated the 18th September 1935, from the Editor of the "Ananda Bazar Patrika", a Bengali daily, on the above subject.

2. The paper is extremist in tone and is consistently hostile to Government. It, however, wields considerable influence having the largest circulation of all the newspapers in Bengal, if not in India. It is desirable that a paper like this should be put in possession of corect facts and figures relating to the different departments of Government by being suplied with copies of all Government publications. Moreover, the Government of India will thereby get considerable publicity through its columus. The Government of Bengal, therefore, recommend that the application of the Editor may be favourably considered.

3. I am to add that the paper is supplied free with the publications of the Government of Bengal". [২০]

১৯৩৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে লাইনো টাইপ কোম্পানির শো-রুমে বাঙলা লাইনো টাইপ মেসিনের উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেই অনুষ্ঠানে রাজশেখর বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রফুল্লকুমার সরকার, যতীন্দ্রকুমার সেন এবং আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

হরি গোভিল বললেন—শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের অক্লান্ত চেষ্টায় এ-কাজ সম্ভব হয়েছে। শ্রীযুত রাজশেখর বসু তাঁকে এ-কাজে সহায়তা করেছেন। মূল অক্ষরগুলির আকৃতি অংকন করেছেন শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার সেনের সহায়তায় শ্রীযুত এস কে ভট্টাচার্য*। সকলকেই আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাঙলায় সংযুক্ত অক্ষরগুলির সংখ্যা হ্রাস করা একটা প্রধান অসুবিধা দাঁড়িয়েছিল। এ-কাজে রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় সুরেশবাবুকে বিশেষ সাহায্য করেছেন। যাঁরা নতুন পথে চলেন তাঁদেরই মতো শ্রীযুত মজুমদারকে কখনো-কখনো ভগ্নোৎসাহ হতে হয়েছে। আজ তাঁর চেষ্টা সার্থক হয়েছে, তাঁকে আমরা এজন্য অভিনন্দিত করি। ভারতবর্ষ সুরেশবাবুর জন্য গর্ব অনুভব করতে পারে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বললেন—একাগ্র সাধনার দ্বারা যে কত বড়ো কাজ সম্ভব হয়, তা সুরেশবাবু দেখিয়েছেন।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার বললেন—ভদ্রমহোদয়গণ, আমি মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভাইস চ্যান্সেলর মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এইজন্য যে তিনি বাঙলা লাইনোটাইপ মেসিনের উদ্বোধন কালে আমার মতো অভাজনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং আমার কাজের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আমি মনে করি যে প্রশংসার কাজ আমি এমন কিছু করিনি, যা করেছি তা মাতৃভাষার প্রতি কর্তব্যবোধেই করেছি।...আমি বিদ্বান নই, সামান্য একজন মুদ্রাকর মাত্র। বিদ্বান যাঁরা, তাঁদের লেখা আমাকে মুদ্রিত করতে হয়,—তাই আমার কাজ। সে-কাজ

* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বয়ং সুরেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন : "যতীন্দ্রকুমারের তত্ত্বাবধানে সুশীলকুমার (ভট্টাচার্য) অক্ষর অঙ্কন কার্য করিয়াছেন।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, পৃঃ ১০।)

যাতে সুন্দর ও সহজ হয়, তারই চেষ্টা আমি করেছি।

১৯৩৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সাকুল্যে ১২২টি শব্দ বাঙলা লাইনো টাইপে মুদ্রিত হয়েছে।

উত্তরকালে বিরজাকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছেন:

"তিনি (সুরেশচন্দ্র মজুমদার) দ্রুত বাঙ্গলা কী বোর্ড রচনা সমাপ্ত করিয়া লাইনো টাইপে বাঙ্গলা কম্পোজ আরম্ভ করাইয়া দিলেন। লাইনো টাইপে কম্পোজ হইয়া কিছু কিছু সংবাদ আনন্দবাজারে মুদ্রিত হইতে লাগিল। কিন্তু গোড়ার দিকে দেখা গেল, অক্ষরগুলির অবয়ব সুদৃশ্য হইতেছে না, বিশেষ করিয়া যুক্তাক্ষরগুলি বড় বেমানান হইতেছে এবং দ্রুত কম্পোজের পক্ষে কী বোর্ড বিশেষ জটিল হইয়াছে। মুদ্রণ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মজুমদার মহাশয়ের নিরলস চেষ্টা তখন যুক্তাক্ষরের সংখ্যা হ্রাস করিয়া জটিল কী বোর্ড যথাসাধ্য সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত করণে নিয়োজিত হইল। এই চেষ্টার ফল ফলিতেও বিলম্ব হইল না। সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত কী বোর্ড যেমন রচিত হইল, তেমনি সুদৃশ্য অবয়বের এবং বিভিন্ন আকারের বাঙ্গলা অক্ষরও উদ্ভাবিত হইয়া লাইনো টাইপে বাঙ্গলা কম্পোজের পক্ষের বাধা সব দূর করিয়া দিল।

আনন্দবাজার পত্রিকা তখনও আংশিক হাতে কম্পোজ এবং আংশিক লাইনো কম্পোজ সংবাদ লইয়া মুদ্রিত হইতেছিল। সম্পূর্ণ কাগজ লাইনো টাইপে ছাপা হইলে পাঠক সমাজ অসুবিধা বোধ করিবেন কিনা, এই সন্দেহ ছিল। কিন্তু মজুমদার মহাশয়ের উৎসাহে পুরাপুরি লাইনো টাইপে কম্পোজ কাগজ মুদ্রণ আরম্ভ হইল। তাহাতে কাগজের চেহারা পাল্টাইয়া এমন সুন্দর ও মনোহর হইল যে, পাঠক সমাজ খুশি হইয়া অযাচিতভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাকে বাঙ্গলা সংবাদপত্রের রূপান্তর বলা যাইতে পারে। সংবাদ বিন্যাস ও মুদ্রণের দিক দিয়া এই রূপান্তরের পথ প্রদর্শক আনন্দবাজার পত্রিকা। তাহার প্রদর্শিত পথ অতঃপর অন্যান্য সংবাদপত্রে সাগ্রহে গৃহীত হইয়াছে।"[২১]

সুরেশচন্দ্রের এই আবিষ্কারের ধারা অনুসরণ করে অন্যান্য প্রদেশের ভাষাতেও লাইনো যন্ত্র নির্মিত হয়েছে এবং সুরেশচন্দ্রের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়েছে।[22] ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৬৬ সালের ১২ অগস্ট বলেছেন: "শুধু বাঙলা লাইনো টাইপ নয়, বাঙলা টাইপরাইটার সম্পর্কেও তিনি (সুরেশচন্দ্র) অগ্রণী হয়েছিলেন।"

লাইনো টাইপ প্রবর্তনের বেশ কিছুকাল পরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় রেফাক্রান্ত বর্ণের দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে। উত্তরকালে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন: "আমি দুদিনের জন্যে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা গিয়েছিলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে 'শনিবারের চিঠি' কার্য্যালয়ে স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে দেখা হয়। লাইনো টাইপ প্রবর্তন ও বানান সংস্কারের জন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে রেফাক্রান্ত বর্ণের দ্বিত্ব বর্জন জন্যে অনুরোধ জানাই। তিনি জানালেন—পণ্ডিতদের মতে সর্বত্র নাকি দ্বিত্ব বর্জন চলে না, তাই কোথায় দ্বিত্ব থাকবে আর কোথায় থাকবে না স্থির করা কঠিন বলে দ্বিত্ব রক্ষা করাই নিরাপদ। আমি জানালাম—সর্বত্র দ্বিত্ব বর্জন করলে ব্যাকরণের কোন নিয়ম লঙ্ঘিত হয় না, যথার্থ পণ্ডিতদের মত নিলে আমার একথা সমর্থিত হবে। অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই তা জানালাম এবং দু-তিনজন শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ পণ্ডিতের নামও তাঁর কাছে করলাম। প্রশ্ন করলাম—'তাঁদের সমর্থন পেলে দ্বিত্ব বর্জন করবেন তো?' উত্তর এল—'অবশ্যই করব। তাতে তো আমাদের কাজ সহজ হবে। সে পথেই তো আমরা চলতে চাই।' শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার দুদিন পরে দেখলাম আনন্দবাজার পত্রিকার সর্বত্র দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে। কেবল 'বর্মন ষ্ট্রীট' কথাটি বাদে। এ বিষয়ে সুরেশবাবুকে পত্র লেখার উপক্রম করছি, এমন

সময় হঠাৎ একদিন দেখি ওখানেও সংস্কারের হাত পড়েছে।"[২৩]

১। Political Department Proceedings No. 682, June 1933.
২। মণীন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
৩। তদেব।
৪। Political Department Proceedings Nos. 99-103, December 1933.
৫। 'দেশ', ২৪ নভেম্বর ১৯৩৩, পৃ. ২০।
৬। 'দেশ', ২৪ নভেম্বর ১৯৩৩, পৃ. ১৩।
৭। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
৮। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ জুন ১৯৫৫।
৯। মণীন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
১০। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ জুন ১৯৫৫।
১১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ মার্চ ১৯৭২।
১২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ জুন ১৯৫৫।
১৩। তদেব।
১৪। তদেব।
১৫। তদেব।
১৬। Political Department Proceedings Nos. B292-302, May 1934.
১৭। প্রবোধচন্দ্র সেনের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
১৮। Political Department Proceedings Nos. B255-57, May 1935.
১৯। Political Department Proceedings Nos. B244-45, June 1935.
২০। Political Department Proceedings Nos. B23-24, December 1935.
২১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ জুন ১৯৫৫।
২২। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার : সুরেশচন্দ্র মজুমদার (কলকাতা, ১৯৫৪), পৃ. ৭।
২৩। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।

ইতিহাসে আনন্দবাজার

১৯৩৫ সালের ১৫ নভেম্বর স্বনামধন্য কবি নেগ্‌চি 'আনন্দবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এলেন; সেখানে তিনি সম্বর্ধিত হলেন। পরদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "গত শুক্রবার অপরাহ্নে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কার্য্যালয়ে প্রসিদ্ধ জাপানী কবি আচার্য নেগুচিকে সম্বর্ধনা করা হয়। এই উপলক্ষে বহু সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। আচার্য নেগুচি সমাগত ব্যক্তিদের সহিত নানাবিধ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। তিনি আনন্দবাজার' কার্য্যালয়ের সম্পাদকীয় ও মুদ্রণ বিভাগ পরিদর্শন করেন। আচার্য নেগুচি আনন্দবাজার কার্য্যালয়ে আসিলে তাঁহাকে সাদর-সম্বর্ধনা সহকারে সম্পাদকীয় বিভাগে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় সম্পাদক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন।..."

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"The Editor of the "Ananda Bazar Patrika" has been warned in respect of an article entitled "Zemindars and Court of wards" published in the issue of his paper of the 7th December 1935". [১]

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৬ সালের ৮ মার্চ, লিখেছে: "সমস্ত সভ্য ও স্বাধীন দেশে মাতৃভাষাতেই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়,—তারবার্তা, সংবাদ ইত্যাদি মাতৃভাষাতেই প্রচারিত হয়। কিন্তু এদেশে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় বিদেশী ভাষা যেমন শিক্ষার বাহন হইয়া আমাদের মানসিক দৈন্য ঘটাইতেছে,—সংবাদপত্রের বেলাতেও সেই বিদেশী ভাষার প্রভুত্ব তেমনি আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে খর্ব করিতেছে। তারবার্তা সংবাদ ইত্যাদি সমস্তই এখানে ইংরাজী ভাষায় প্রচারিত হয় এবং অনুবাদের মধ্য দিয়া তাহা আমরা প্রকাশ করি। দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রের পক্ষে ইহা যে কত বড় বাধা, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন সকলে সম্যক বুঝিতে পারিবেন না। তবে আমাদের মনে এই আশা আছে যে, মাতৃভাষা তাহার যোগ্য মর্যাদা লাভ তথা শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় সংবাদপত্রও অধিকতর শক্তিশালী হইবে।"

মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় বিদেশী ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন, এই সত্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পক্ষে তৃপ্তিকর হয়নি। বহুকাল আগে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'

আশা করেছে, মাতৃভাষা যোগ্য মর্যাদা লাভ করবে!

৮ মার্চ ১৯৩৬ সাল। দোলপূর্ণিমা। চৌদ্দবছর আগে এই তিথিতেই দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৬ সালের ৮ মার্চ, লিখেছে: "সমস্ত পরাধীন দেশেই জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের পথ দুর্গম—বাধাবিঘ্নসংকুল। ভারতবর্ষে সেই বাধা-বিঘ্ন বিপত্তি সহস্রগুণে প্রবল! আইনের নাগপাশে সংবাদপত্র এখানে আবদ্ধ, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ তাহার নাই,—অতি সতর্ক পদে তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়। এই বাধা-বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে, আইনের রক্তচক্ষুর সম্মুখে আমরা সকল সময়ে আমাদের কর্তব্য পূর্ণরূপে পালন করিতে পারি নাই, ইহা আজ সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি।"

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"The editor of the Ananda Bazar Patrika has been informed of the names of the publications which the Government of India in the various departments have been pleased to supply him free of cost". [২]

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"The editor of the "Ananda Bazar Patrika" has been informed that the Government of India, Railway Department (Railway Board), have placed his paper on their free distribution list for the supply of copies of publication of that department". [৩]

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"The article entitled "suicide" published in the issue of the "Ananda Bazar Patrika", dated the 29th March 1936, was examined and it has been decided that action under the Press Act need not be taken at present in view of the fact that the editor has been warned recently in respect of a similar article". [৪]

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"The application from the Manager of the "Ananda Bazar Patrika" for publication of Government advertisements in the paper has been considered and decided that no action need be taken". [৫]

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"The editor of the "Ananda Bazar Patrika" has been informed that the Government of India, Department of Commerce, have placed his paper on their free distribution list for the supply of copies of publication of that department". [৬]

ঢাকার আদালতে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার শুনানী আরম্ভ হয়েছে ১৯৩৩ সালের ২৭ নভেম্বর, শুনানী চলেছে আড়াই বছর, ১৯৩৬ সালের ২০ মে শুনানী শেষ হয়েছে, ১৯৩৬ সালের ২৪ আগস্ট আদালত রায় দিয়েছে। "কলিকাতার পত্রিকার মধ্যে প্রথমে 'আনন্দবাজার'ই এই মামলার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রথম হইতেই সমস্ত শুনানীর বিবরণ টেলিগ্রামে নিয়া পরদিন প্রাতে বিমান ডাকে পত্রিকা পাঠাইয়া ঢাকাবাসীদের সংবাদ পরিবেশন করিতেন। বিমান ডাক বন্ধ হইবার পরেও তাঁহারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় শুনানীর

বিবরণ টেলিগ্রামে নিতেন; ফলে পরদিনই পূর্বদিনের প্রায় সমস্ত শুনানীর বিবরণ 'আনন্দবাজারে' পাওয়া যাইত। 'আনন্দবাজার' এই মামলার বিষয়ে প্রাধান্য দিবার পরে, কলিকাতায় আরও ২। ১ খানি দৈনিক মাঝে মাঝে শুনানীর বিবরণ টেলিগ্রামে নিতেন।"

উত্তরকালে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন: "ভাওয়াল রাজবাড়ির মামলা চলাকালীন ঢাকাতে দেখেছি আনন্দবাজার কেনার জন্যে জনসাধারণের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। বাড়ির মহিলারা রান্না করার ফাঁকে ফাঁকেও আনন্দবাজার পড়তেন।"[৭]

যে যাই বলুক, কে একজন ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতি অতিশয় বিরূপ হয়েছেন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রাজনৈতিক মতবাদ তাঁর অসহ্য, গত্যন্তর না দেখে তিনি গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করেছেন যেন গভর্ণমেণ্ট 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বন্ধ করে দেয়। সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"The receipt of a letter from one Ishwar Chandra Shastri for stopping the publication of the "Ananda Bazar Patrika" because of its extreme political views has been acknowledged." [৮]

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট, ১৯৩৬ সালের ৭-সেপ্টেম্বর, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে আদেশ করেছে:

"Whereas it appears to the Governor in Council that you Suresh Chandra Bhattacharji, publisher of the "Ananda Bazar Patrika" after the commencement of the Indian Press (Emergency Powers) Act, 1931 (XXIII of 1931), hereinafter referred to as the said Act, filed a declaration under section 5 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (XXV of 1867) and you deposited a security of Rs. 2000/- (Rupees two thousand only) under sub-section (1) of section 9 of the said Act;

And whereas it appears to the Governor in Council that you published in the issue of the newspaper "Ananda Bazar Patrika" of the 8th July 1936 an article containing words of the nature described in sub-section (1) of section 4 of the said Act, the objectionable passages of which are given in the annexure hereto;

And whereas the said passages, in the opinion of the Governor in Council, tend to bring into hatred or contempt the Government established by law in British India, or to excite disaffection towards His Majesty's Government, and also tend to incite to the commission of any cognizable offence involving violence;

Now, therefore, take notice that the Governor in Council in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the said Act, declares the sum of Rs. 1,000/- (Rupees one thousand only) a portion of the security of Rs. 2,000/- (Rupees two thousand only) deposited by you and all copies of the "Ananda Bazar Patrika" dated the 8th July 1936 wheresoever found, to be forfeited to His Majesty.

Annexure

It is coming to be the object of the Government to check and

to destroy all that is unfavourable to the autocratic policy of the ruling authorities.

If an account was kept of the number of young men that have so far been punished in Bengal in this connection we would not have been able to abuse the Fascist Government of Hitler and Mussolini as ferocious and savage in comparison with the Government of India.

A country and a nation which, during one hundred and fifty years of British rule, have been deprived of the fundamental rights of man, the homes and the families in which have come to be centres of ignorance, poverty and ill-health, have certainly no use for a literature which will keep them at a distance from the realities of life and rule them to the pleasant sleep of slavery. In fact the main object of the capitalist state and the social leaders of the country is to see that we may remain lapped in the luxury of literature and, without rebelling against national poverty, humiliation and hunger, accept the exploitation carried on by the existing state and social economy as the only thing worthy of welcome. It is with an eye on this object that the ruling authorities are gagging all sorts of writings based on nationalism, communism or realism and, appealing to the two vague labels "objectionable" and "proscribed", putting readers constantly into trouble.

The more distressing and painful the administrative policy in a country is to her people, the more zealous are the ruling authorities of the country in their shameless attitude towards thought and knowledge. In Bengal, from the dawn of the Swadeshi era such high-handedness has been going on in reference to literature, and now on the plea of terrorism and communism the same repressive policy has spread far and wide. The ruling authorities know that the pen is mightier than the sword; hence, if, by any means, the pen of the nation can be broken and thereby its thought weakened and contaminated, it will be easy to keep intact the repressive policy of administration and exploitation in a country of foolish and ignorant men. This is the chief secret of the virulence of the official attitude to literature."

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট, ১৯৩৬ সালের ৭-সেপ্টেম্বর, জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আদেশ করেছে:

"Whereas it appears to the Governor in council that you Jagadish Chandra Mukherji, keeper of the Ananda Press, after the commencement of the Indian Press (Emergency Powers) Act. 1931 (XXIII of 1931), hereinafter referred to as the said Act, filed a declaration under section 4 of the Press and Registration of Books

Act, 1867 (Act XXV of 1867) and you deposited a security of Rs. 2,000/- (Rupess two thousand only) under sub-section (1) of section 5 of the said Act;

And whereas it appears to the Governor in Council that you printed at the above press the issue of the "Ananda Bazar Patrika" of the 8th July 1936 which had an article containing words of the nature described in sub-section (1) of section 4 of the said Act the objectionable passages of which are given in the annexure hereto;

And whereas the said passages in the opinion of the Governor in Council, tend to bring into hatred or contempt the Government established by law in British India or to excite disaffection towards His Majesty's Government and also tend to incite to the commission of any cognizable offence involving violence;

Now, therefore, take notice that the Governor in Council in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, declares that the amount of Rs. 1,000/- a portion of the security of Rs. 2,000/- deposited by you to be forfeited to His Majesty."

সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯৩৬ সালের ১৬-সেপ্টেম্বর, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারির কাছে আবেদন করেছেন:

"I have the honour to bring the following facts for your kind perusal and favourable consideration.

1. That I am the printer and publisher of the "Ananda Bazar Patrika" printed and published from "Ananda Press" situated at 1, Burman Street, Calcutta.

2. That at the time of filing declaration under section 5 of the Press & Registration of Books Act, 1867 (XXV of 1867) I deposited in the Court of the Chief Presidency Magistrate, Calcutta, a security of Rs. 2,000/- (Rupees two thousand only) under sub-section (1) 9 of the Indian Press (Emergency Powers) Act, 1931 (XXIII of 1931).

3. That on the 10th September, 1936, I was served with the Government order dated 7th September, 1936, giving me notice that the Governor in Council, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the said Indian Press (Emergency Powers) Act, was pleased to declare that a sum of Rs. 1,000/- (Rupees one thousand only) a portion of the security of Rs. 2,000/- deposited by me to be forfeited to His Majesty the King Emperor, for publishing in the issue of the newspaper "Ananda Bazar Patrika" of the 8th July, 1936 an article alleged to contain words of the nature described in sub-section (1) of section 4 of the said Act.

4. That without admitting that the said article contains

words of the nature described in sub-section (1) of section 4 of the said Act but in obedience to the Government order I appeared before the learned Chief Presidency Magistrate, Calcutta on the 15th September, 1936 and deposited Rs. 1,000/- (Rupees one thousand only) in cash, being the amount forfeited under the Government order.

The learned Chief Presidency Magistrate was pleased to give me time till 25th September, 1936 to obtain permission of local Government to file fresh declaration as the publisher of the said "Ananda Bazar Patrika."

5. That I beg to bring to the notice of the Government that after the commencement of the Indian Press (Emergency Powers) Act from 1931 there was only ONE occasion in 1933 when the Governor in Council by order No. 946 dated 10th January 1933 was pleased to order a forfeiture of Rs. 500/- out of the security of Rs. 1,000/- deposited by the publisher of the "Ananda Bazar Patrika."

6. That I beg to add that the Government order No. 22258 Pub dated Calcutta the 9th November, 1933 declaring the forfeiture of Rs. 1,000/- out of the security of Rs. 2,000/- deposited by the publisher, with reference to two articles dated 7th September and 18th October 1933, published in the issues of the said paper "Ananda Bazar Patrika" was, on appeal, subsequently set aside by a Special Bench of the Hon'ble High Court of Calcutta.

The order of enhanced security deposit of Rs. 5,000/- by the publisher stood automatically cancelled and the further deposit in G. P. Notes to make up the enhanced security demanded, which had been made in the meantime was returned to the then publisher by the Chief Presidency Magistrate, Calcutta, on or about 23.8.34.

7. In the circumstances, I respectfully pray that under section 10(2) of the Indian Press (Emergency Powers) Act, (XXIII of 1931) the local Government may be pleased to grant me permission of file the necessary declaration as 'Printer and Publisher' of the aforesaid "Ananda Bazar Patrika" under section 5 of the Press & Registration of Books Act, 1867."

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট, ১৯৩৬ সালের ১৯-সেপ্টেম্বর, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লিখেছে:

"I am directed to refer to your letter dated the 16th September 1936 in which you ask, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 10 of the I. P. (E.P.) Act, 1931, for the permission of the local Government to make a fresh declaration under section 5 of the Press & Registration of Books Act, 1867 as Publisher of the 'Ananda Bazar Patrika' and in reply, to say that the Government of Bengal are pleased to grant the permi-

ssion asked for."

চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯৩৬ সালের ২৩-সেপ্টেম্বর, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিকে লিখেছেন:

"In continuation of this office letter No. 3516 dated 16.9.36. I have the honour to inform you that Babu Suresh Chandra Bhattacharya, publisher of the 'Ananda Bazar Patrika' and Babu Jagadish Chandra Mukherjee, keeper of the 'Ananda Press', have this day deposited enhanced security amounting to Rs. 5,000/- each and filed fresh declarations."

ইণ্ডিয়ান জার্ণালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি তখন কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি, ১৯৩৬ সালের ২৬-সেপ্টেম্বর, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টকে লিখেছেন:

"Regarding the order of forfeiture of security deposit money and demand of fresh security from Ananda Bazar Patrika, the Indian Journalists' Association adopted the following resolution at its last meeting on 22nd September, 1936, of which the copy is sent for your information :—

"That this meeting views with alarm the renewed activity of the Government under the Emergency Powers Act as indicated by its forfeiture of a total sum of Rs. 2,000/- from the security deposit and in demanding a fresh deposit from Ananda Bazar Patrika instead of proceeding against the paper under ordinary laws if the article for which the forfeiture order has been made was really objectionable.

The meeting urges upon the Government to withdraw the order of forfeiture and fresh deposit, or institute regular proceeding in a Court of law."

An acknowledgment will oblige." ১

সুরেশচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টে দরখাস্ত করলেন:

"1. That your petitioner No. 1, Suresh Chandra Bhattacharya is the publisher of the Ananda Bazar Patrika, a daily Bengali newspaper published from No. 1, Burman Street, Calcutta and your petitioner No. 2, Jagadish Chandra Mukherjee is the keeper of the Ananda Press at No. 1, Burman Street where the said newspaper, Ananda Bazar Patrika is printed.

2. That the notice of an order under section 10(1) of the said Act were served upon your petitioners on the September 1936 declaring the sum of Rs. 1,000/- (Rupees one thousand only) a portion of the security of Rs. 2,000/- (Rupees two thousand only) deposited by your petitioner No. 1 under the said Act forfeited to His Majesty.

In as much as an article containing words of the nature described in section 4, sub-section (1) was published in the said Ananda Bazar Patrika in its issue of the 8th of July 1936 last.

3. That a notice of a like order under section 6(1) was served on your petitioner No. 2 on the same date. That the said notices of the orders of the Governor in Council are appended hereinto and marked Annexure "A".

4. That a copy of the issue of the said newspaper, dated the 8th July 1936 together with a translation by the Court Translator of the article in which the words objected to are contained are also appended to this application and are marked Annexure "B".

5. That the said article embodies comments expressing disapproval of the administration of the Sea Customs Act and of the provisions of the Indian Press (Emergency Powers) Act and other similar measures of the Government with a view to their alteration by lawful means and the said article was published in the normal course of the performance of the functions of a newspaper in discussing a current question of public importance, viz. increasing Governmental interfering with literature, without exciting or attempting to excite hatred contempt or disaffection or inciting to the commission of any cognizable offence involving violence or without creating or promoting tendencies for the commission of any offence.

6. That the immediate occasion for the publication of the said comments was the publication of a news item "E" published in the Amrita Bazar Patrika of the 6th July 1936 (which is appended hereinto and marked Annexure "C" and the subject matter of which formed the subject matter of some questions in the House of Commons on the 7th July 1936) and of an article in the Statesman of the 7th September 1936.

7. That your petitioners submit that the passages and comments in the said order are not objected to and shall not be deemed to be of the nature desscribed in Section 4, sub-section(1) of Act XXIII of 1931 and the said orders of the Governor in Council are not warranted by the Act.

Your petitioners therefore humbly pray that your lordship will be graciously pleased to set aside the said orders of the Governor of Bengal in Council dated the 7th September 1936 forfeiting the sums of Rs. 1,000/- respectively in the case of each of your petitioners or to pass such other order or orders as to your Lordship may seem fit and proper in the premises herein.

And your petitioners as in duty bound shall ever pray.

Suresh Chandra Bhattacharjee
Jagadish Chandra Mukherjee

G. C. Chunder & Co.
Petitioners' Attorneys."

কলকাতা হাইকোর্টের স্পেশ্যাল বেঞ্চে বিচার হল। স্পেশ্যাল বেঞ্চে ছিলেন প্রধান বিচারপতি ডার্বিশায়ার এবং আরো দু-জন বিচারক: দ্বারকানাথ মিত্র ও প্যানক্রিজ।

কলকাতা হাইকোর্ট, ১৯৩৬ সালের ১৭-ডিসেম্বর, রায় দিয়েছে:

"In this matter our function is to decide whether the newspaper in question did or did not contain any words of the nature described in section 4, sub-section (1) of the Indian Press (Emergency Powers) Act, 1931. In deciding that we have to take into account the explanations which have been added to section 4. We have had the benefit of hearing counsel for the newspaper concerned and counsel for the crown and having considered the matter we are of the opinion and decide that the article complained of certainly contained two passages which offended against the provisions of the Act in question. We do not say that there are not other passages in the article which offend against the Act. The first of the two passages to which we refer is that beginning with the words "A country and a nation" and ending with the words "putting readers constantly into trouble." The other of the two passages is that beginning with the words "The more distressing and painful" and ending with the words "The is the chief secret of the virulence of the official attitude to literature."

In these circumstances, this application is dismissed. We make no order as to costs." [১০]

উত্তরকালে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেছেন: "মনে আছে ১৯৩৬ সালে আমি একবার সাহিত্যে সরকারী দৌরাত্ম্য' সম্ভবত এই শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলাম। এই সম্পাদকীয়টির জন্য আনন্দবাজার অভিযুক্ত হয় এবং বেশ কয়েক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আনন্দবাজার সে টাকা দিয়ে দেন। কিন্তু আশ্চর্য, এজন্যে কর্তৃপক্ষ আমাকে একবারো কৈফিয়ৎ চাননি কিংবা কোন প্রশ্ন করেননি, বরং আমার লেখার প্রশংসাই করেছেন।"[১১]

১৯৩৬ সালে বিশ্ব অলিম্পিক হল বার্লিনে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সেখানে বিশেষ প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। উত্তরকালে ব্রজরঞ্জন রায় লিখেছেন: "১৯৩৬ সালের বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের বার্লিন সহরে আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। ইহার পূর্বে ভারতের কোন সংবাদপত্রই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি প্রেরণের কথা কল্পনাই করিত না। ভারতীয় ক্রিকেট দল ১৯৩২ সালে সরকারীভাবে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের অন্তর্ভুক্ত হইলে আনন্দবাজার পত্রিকা বৈদেশিক ভ্রমণে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহিত প্রতিনিধি প্রেরণের কথা কল্পনা করে। ঠিক উপযুক্ত ভারতীয় প্রতিনিধি না পাওয়ায় বৈদেশিক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করে। ইহার পর ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংলণ্ড ভ্রমণ করিতে গেলে আনন্দবাজার পত্রিকা ভারতের কৃতী ও প্রবীণ ক্রিকেট খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওধরকে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ইংলণ্ড ভ্রমণে প্রেরণ করে। ১৯৪৭-৪৮ সালে পুনরায় অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহিত অধ্যাপক দেওধরকে প্রেরণ করে।"[১২]

মনে রাখা দরকার, ১৯৩৬ সালের পর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অবস্থার উল্লেখ-

যোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। যোগেন্দ্রমোহন সেন বলেছেন: "১৯৩৬ সালের পর আমাদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। তখন বছরে সব মিলিয়ে আয় হচ্ছে তিন লাখের মতো। এর পর থেকে আরো বেড়ে যেতে থাকে।"[১০]

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসে নতুন শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রস্তাব পাশ করালেন, জাতিকে আবার নিয়মতান্ত্রিকতার পথ দেখালেন। কিন্তু, প্রশ্ন থেকে যায়, জনসাধারণের দীর্ঘকালের ত্যাগ ও দুঃখবরণ কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? সেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংশয় ও দৌর্বল্যের নীতি সমর্থন করেনি।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৭ সালের ২৬ মার্চ, লিখেছে:

"১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার সত্যাগ্রহ নীতি লইয়া প্রবেশ করিলেন, তখনই পুরাতন অধ্যায় শেষ হইয়া নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ হইল। মহাত্মা গান্ধীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও শক্তির প্রভাবে সমগ্র দেশ প্রাণের আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিল,—যে গণশক্তি বহুযুগ নিদ্রিত, অচেতন ছিল, তাহা বাসুকী নাগের মত সহস্র-ফণা উদ্যত করিয়া জাগিয়া উঠিল। তারপর ঘটনার পর ঘটনায় অপ্রত্যাশিত-রূপে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস নূতনভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। পুরাতন নিয়মতান্ত্রিকতার মডারেট রাজনীতি বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত হইল, জাতি আত্মশক্তি ও সাধনা বলেই ত্যাগ ও দুঃখ বরণের মধ্য দিয়া স্বরাজ লাভের পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে লাগিল,—অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলন সেই শক্তিরই বাহ্য বিকাশ মাত্র।

তারপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনীতির অভিযান। তিনি তিনবার গোলটেবিল বৈঠক বসিল, একটা অসার কৃত্রিম শাসনতন্ত্র রচিত হইল এবং সেই অনভিপ্রেত শাসনতন্ত্র সমগ্র জাতির উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার আয়োজন হইতে লাগিল। একদল দুর্ব্বলচেতা প্রচ্ছন্ন মডারেট এই শাসনতন্ত্রের মোহে মুগ্ধ হইল এবং কংগ্রেসকে পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকতার পথে টানিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু ঘটনার বিস্ময়কর পরিণতি—সেই মহাত্মা গান্ধীই আজ কংগ্রেসে আসিয়া শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রস্তাব পাশ করাইলেন এবং কংগ্রেস তথা জাতিকে পুনরায় নিয়মতান্ত্রিকতার পথ প্রদর্শন করিলেন। সুতরাং গত ষোল বৎসরের ইতিহাস স্মরণ করিয়া আজ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে—এই ষোল বৎসর কি বৃথা গিয়াছে, জনসাধারণের এত ত্যাগ ও দুঃখবরণ, সহস্র সহস্র কর্ম্মীর আত্মোৎসর্গের কি কোনই মূল্য নাই? মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে গত ষোল বৎসর জাতি যে স্বরাজ সংগ্রাম করিয়াছে, তাহা কি দুঃস্বপ্ন মাত্র?...

আমরা মনে মনে জানি, নিশ্চয়ই তাহা সত্য নহে।... জাতি মহাত্মাজীর নেতৃত্বে গত ষোল বৎসর যে সংগ্রাম করিয়াছে, তাহা বৃথা যায় নাই; আজ মহাত্মাজী স্বয়ং নিয়মতান্ত্রিকতার পথে জাতিকে ফিরাইয়া লইতে চাহিলেও তাহারা ফিরিতে পারিবে না; যে গণশক্তি বহুযুগের নিদ্রার পর একবার জাগিয়া উঠিয়াছে, আর তাহাকে ঘুম পাড়ানো যাইবে না। রণশ্রান্ত প্রবীণ সেনাপতিরা আজ সংশয় ও দৌর্ব্বল্যের বশবর্ত্তী হইয়া যাহাই করুন না কেন, অগ্রগামী তরুণ সৈনিকের দল কখনই আর পশ্চাতে ফিরিতে পারিবে না। ভূলুন্ঠিত জাতীয় পতাকা তাহারাই তুলিয়া লইবে এবং তাহাদেরই নেতৃত্বে জনগণ লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবে। তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র আইন সভায়—রাজ দরবারে নয়, উহার বাহিরে—দেশের মর্ম্মস্থলে।...

"আনন্দবাজার পত্রিকা" চিরদিন অগ্রগামী পতাকাবাহীদেরই সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিয়াছে, পশ্চাতে ফিরিয়া চাহে নাই। আজও সে সংশয় ও দৌর্ব্বল্যের নীতি পরিহার

করিয়া স্বাধীনতাকামী নবীন ভারতের মর্ম্মকথাই ব্যক্ত করিবে।..."

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"A report was obtained from the Inspector-General of Police, Bengal, about the truth of the statement published in the "Ananda Bazar Patrika" regarding alleged harassment of one Birendra Chandra Sen of Dacca by the Police. As it was not a good case for contradiction the papers have been filed." ১৪

আন্দামানবন্দীরা অনশন ধর্মঘট করেছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহস্র সতর্কতা সত্ত্বেও এই সংবাদ একদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হল। কীভাবে এই সংবাদ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংগ্রহ করেছে, তা অদ্যাবধি রহস্যাবৃত। উত্তরকালে হরিপদ মহলানবীশ লিখেছেন: "১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে একদিন আনন্দবাজার পত্রিকা পাঠ করিয়া দেশবাসী জানিতে পারেন, প্রত্যেক স্বদেশপ্রাণ বাঙ্গালীর নয়নের মনি আন্দামানবন্দীরা অনশন ধর্মঘট করিয়াছেন। প্রথমে ১৮৭ জন, এবং পরে ২১১ জন বন্দী অনশন করেন। কলিকাতা হইতে বহু দূরে ভারত মহাসাগর বক্ষে আন্দামান এবং সেখানে শত শত প্রহরীর বিনিদ্র চক্ষুর ভ্রূকুটিশাসিত সেলুলার জেল। কলিকাতা হইতে যাতায়াতের একমাত্র উপায় মহারাজা জাহাজ; সেখানে এবং এখানে, সাগরের দুই কূলেই জাহাজ হইতে আরোহণ ও অবতরণ কালে যাত্রীদিগকে তল্লাসীর নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা সত্ত্বেও আন্দামান বন্দীদের অনশনের কাহিনী কিরূপে আনন্দবাজার পত্রিকা আফিসে পৌঁছিল, জনসাধারণের কাছে তাহা আজও অজ্ঞাত এবং মনে হয় চিরদিন তাহা রহস্যেই থাকিয়া যাইবে।"১৫

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"The question of issuing a contradiction to an article published in the *Ananda Bazar Patrika* regarding alleged oppression on the villagers in connection with suppression of dacoities in Dinajpur was considered, and it was decided not to issue any contradiction on the subject." ১৬

১৯৩৭ সালের ১-অক্টোবর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপিত হয়েছে: "আনন্দ-বাজার পত্রিকার সেবকগণ পরিচালিত নূতন ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড', শনিবার, ২রা অক্টোবর কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইবে। এই নূতন প্রচেষ্টায় আমরা দেশবাসীর শুভেচ্ছা প্রার্থনা করিতেছি।"

সুভাষচন্দ্র বসু, ১৯৩৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর, 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন:

"The "Hindusthan Standard" represents one more effort in the nation's unending struggle for self-fulfilment and self-expression. As we set our hand to our task, we are conscious of the call of Life Divine and we are not blind to the law of earthly gravitation. But we are not daunted, because we have faith in ourselves—faith in the nation's glorious destiny. Let the same faith inspire the "Hindusthan Standard." ১৭

১৯৩৭ সালের ২ অক্টোবর 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড', প্রকাশিত হল। সম্পাদক—ধীরেন্দ্রনাথ সেন। মুদ্রাকর ও প্রকাশক—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

উত্তরকালে পরিমল গোস্বামী লিখেছেন: "এ সময় আমাদের আনন্দবাজার পত্রিকা আফিসে মাঝে মাঝে সান্ধ্য আড্ডা বসত। আড্ডার মধ্যমনি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। মাখন

সেন মহাশয় ছিলেন খুব সীরিয়াস, কাজের লোক, তিনি আড্ডায় এসেছেন ব'লে মনে পড়ে না, তবে প্রফুল্ল সরকার মহাশয়কে নিয়মিত দেখেছি। সত্যেনদার মুখের কোনো আগল ছিল না, এবং সম্ভব অসম্ভব সব কথা তাঁর মুখে শুনতে ভাল লাগত। আমরা সবাই তা উপভোগ করতাম, প্রফুল্লবাবু স্বল্পবাক ছিলেন, তিনি মৃদু মৃদু হাসতেন। যেদিন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড নতুন বেরোল সেদিন সকালবেলা মাখনদা এক কপি কাগজ হাতে ক'রে এলেন মোহনবাগান রো-তে, সজনীকান্তকে দেখাতে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।"[১৮]

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"The Editor of the "Ananda Bazar Patrika" has been warned not to publish in future such article as "Autonomy in Bengal." [১৯]

'আনন্দবাজার পত্রিকা' তখন ভারতীয় ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র। বাঙলাভাষা জানেন এমন অনেক হিন্দীভাষীর হাতেও সে-সময়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' দেখা গেছে। শ্রীপ্রকাশ, ১৯৩৭ সালের শেষার্ধে, লিখেছেন:

"The Ananda Bazar Patrika" is certainly the greatest paper printed in any of our languages; and my only regret is that owing to my very imperfect acquaintance with the Bengali language, I am unable to read it. But it gives me much satisfaction to see it daily in the hands of not only Bengalees in my home town of Benares, but a large number of Hindi speaking persons also, who know Bengali." [২০]

'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের প্রতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অপরিসীম: 'বন্দে মাতরম', 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বিবেচনায়, 'জাতির প্রাণধর্মের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি', 'রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের গতিপথে তীব্র মুক্তিকামনার প্রস্ফুরিত মহিমা।'

কংগ্রেস কোনোদিন 'বন্দে মাতরম'কে সরকারীভাবে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করেনি। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে 'বন্দে মাতরম' দীর্ঘকাল জাতীয় সঙ্গীতরূপে পরিণত হয়েছে।

এককালে সম্প্রদায়বিশেষ 'বন্দে মাতরমে'র সমালোচনা করেছে—'বন্দে মাতরম' জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য নয়।

কংগ্রেস সেই সমালোচনা উপেক্ষা করেনি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৭ সালের ৩০ অক্টোবর লিখেছে: 'বন্দেমাতরম' সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের নির্গলিতার্থ যাহা দাঁড়ায় তাহা এই,—"যতক্ষণ না জাতীয় সঙ্গীত হইবার উপযোগী কোন হিন্দুস্থানী গান পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ 'বন্দে মাতরম' গান চলিতে পারে কিন্তু তাহাও প্রথম দুইটী পদ্যাংশ মাত্র।" 'বন্দে মাতরম'এর এই খণ্ডিত অংশ এখন হইতে 'জাতীয় সঙ্গীত' বলিয়া বিবেচিত ও সম্মানিত হইবে, এ আশ্বাসটুকুও ওয়ার্কিং কমিটির সুদীর্ঘ বিবৃতি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া কোথাও পাওয়া গেল না; বরং ইহার বিপরীত এই কথাই আছে যে, জাতীয় অনুষ্ঠানসমূহে 'বন্দে মাতরম'এর পরিবর্তে অন্য যে কোন আপত্তিশূন্য গানও গাওয়া যাইতে পারে।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা' ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী।

১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে আনন্দবাজার-হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড তিমিরবরণের সুর সংযোজনায় ও পরিচালনায় 'বন্দে মাতরম' রেকর্ড প্রকাশ করেছে। ১২ ইঞ্চি ডবল-সাইডেড রেকর্ড। পল রোজারিও, জে, মেঞ্জিস এল, কোরিয়া, কালী সরকার, অমিয় ভট্টাচার্য, সূর্য পাল, ডেনিস, রামপ্রসাদ, মহম্মদ আলম শা, ফ্রেডারিক বোস,

ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী প্রভৃতি যন্ত্রসংগীতে অংশ গ্রহণ করেছেন। কণ্ঠসংগীতে অংশগ্রহণ করেছেন ইভা গুহ, আরতি বল, শিবানী সরকার, পরেশ দেব, ধীরেন দাস, সুধীর চক্রবর্তী, সাগরময় ঘোষ। ভারতে ও ভারতের বাইরে এই রেকর্ডের একমাত্র পরিবেশক— মেগাফোন কোম্পানী, ৭৭।১, হ্যারিসন রোড, কলকাতা।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৯ সালের ১৬ এপ্রিল, লিখেছে:

"আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের উদ্যোগে জাতীয় সংগীত "বন্দে মাতরমের" যে নূতন রেকর্ড হইয়াছে তাহা ইতিমধ্যেই প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। এই নূতন রেকর্ডের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল জাতীয় সংগীতের নূতন সুরসংযোজনা। ইতিপূর্ব্বে "বন্দে মাতরম্" সংগীত যে সকল সুরে গীত হইয়াছে তাহাতে দুই প্রকার অসুবিধার কথা শোনা যাইত। প্রথমতঃ অসুবিধা এই যে, সে সকল সুর সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজে আয়ত্ত করা সম্ভব নহে, অথচ জাতীয় সংগীতের সুর এরূপ হওয়া প্রয়োজন যে, সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বসাধারণ উহাতে যোগ দিতে পারে এবং গাহিতে পারে। দ্বিতীয় যে অসুবিধার কথা শোনা যাইত তাহা হইল সুরের কোমলতা। জাতীয় সংগীতের সুর কোমল না হইয়া বীরত্বব্যঞ্জক হওয়াই উচিত—ইহাই প্রচলিত ধারণা। যে দেশকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, সে দেশের জাতীয় সংগীতের সুরে বীরত্বের উদ্বোধক ভাব থাকা অপরিহার্য্য। নূতন 'বন্দে মাতরম'-এর রেকর্ডে যে সুর দেওয়া হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত দুইটি অসুবিধাই দূর হইয়াছে। সুরটি সাধারণের পক্ষে উপযোগী এবং বীরত্বব্যঞ্জকও বটে। বিখ্যাত সুরশিল্পী তিমিরবরণ এই নূতন সুর দিয়াছেন।

এই রেকর্ডের সম্বন্ধে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ইহা সম্পূর্ণ সংগীতের রেকর্ড; ইদানীন্তন কালের প্রবর্ত্তিত রীতি অনুসারে মাত্র অনুমোদিত দুই কলির রেকর্ড নহে। "বন্দে মাতরম্" খন্ডনের প্রস্তাবের পর হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের জাতীয়তাবাদীরা যে বেদনা বোধ করিয়াছেন তাহা নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে। বাংলা দেশের তো কথাই নাই। সুদূর মহারাষ্ট্র, হায়দরাবাদ পর্য্যন্ত "বন্দে মাতরম্"এর বিপুল প্রতিধ্বনিতে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইয়াছে। তৎকালে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন, যাহাতে সমগ্র বন্দে মাতরম্ সংগীত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সহজে প্রচারিত হইতে পারে, বাংলা দেশের পক্ষ হইতে তাহার উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য। "বন্দে মাতরম্" সংগীতের এই নূতন রেকর্ড সেই উদ্যোগেরই ফল।

"বন্দে মাতরম্" সংগীতের এই নূতন সুরসংযোজনা করিতে সুরশিল্পী তিমির-বরণকে দীর্ঘকাল অনুধ্যান করিতে হইয়াছে। সুবিখ্যাত গায়ক-গায়িকারা তাঁহার নির্দ্দেশমত সংগীতটি গাহিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। সংগীতের সহিত রেকর্ডের অপর দিকে সংগীতের অর্কেষ্ট্রা স্বতন্ত্রভাবে প্রদত্ত হওয়ায় ইহা শ্রোতৃবৃন্দের অধিকতর আনন্দ বিধান করিবে।"

বাঙলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিল রচনা করেছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বিবেচনায় এই বিল জনস্বার্থবিরোধী। এই বিলের কথা গোপন রাখার জন্য সরকারী সতর্কতার অন্ত নেই। কিন্তু বিলখানার সমস্ত ধারা-উপধারার অনুবাদ একদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশিত হল।

হরিপদ মহলানবীশ লিখেছেন: "১৯৩৭ সালের শেষের দিকে জানা যায়, বাংলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক, জনশিক্ষার মূলে কুঠার হানিবার আয়োজন করিয়াছেন —তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য এক বিল রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন। এই বিলের কথা গোপন রাখার জন্য সমস্ত রকমের সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছিল।

তথাপি একদিন দেখা গেল আনন্দবাজার পত্রিকায় বিলের মর্ম নহে, সমগ্র বিলখানার সমস্ত ধারা উপধারার অনুবাদ অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।[২১]

১৯৩৭ সাল পর্যন্ত 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কাগজ কিনেছে ভোলানাথ দত্তের কাছ থেকে। উত্তরকালে যোগেন্দ্রমোহন সেন বলেছেন: "১৯৩৭ সাল পর্যন্ত আমরা কাগজ কিনেছি ভোলানাথ দত্তের কাছ থেকে। সব কাগজ বাকিতে আসত। টাকা দিতাম ন'মাসে, ছ'মাসে।...আমাদের অর্ডারমতো কোম্পানী জাহাজে কাগজ পাঠাত, আমরা কাগজ তুলে নিতাম, পরে যখন যেমন পারতাম তেমন টাকা পাঠাতাম।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্ক শেষ হয়েছে ১৯৩৭ সালের ৩১ অগস্ট। কিন্তু 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কথা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ভোলেননি। উত্তরকালে তিনি বলেছেন: "তখন আনন্দবাজারের সাংবাদিকরা কাজ করতেন অদম্য মনোবল নিয়ে—যেন পরাধীন ভারতের শৃঙ্খলমোচনের জন্য ফাইটিং স্পিরিট নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন একদল সাংবাদিক। ফলে, কোন কষ্ট বা লাঞ্ছনাকে আমরা গায়ে মাখতাম না।...সেদিন আনন্দবাজারের নিউজ এবং এডিটোরিয়াল স্টাফদের মতো কর্মকুশলী, এফিসিয়েন্ট স্টাফ আর কোন বাংলা কাগজে বোধ হয় ছিল না। আজও তেমন ফাইটিং স্পিরিট আর জার্নালিস্টদের ডিভোটেড সার্ভিস কোথাও আছে বলে মনে হয় না। আনন্দবাজার বড় হওয়ার মূলে এঁদের অবদানের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার যে সব দৃষ্টান্ত এখনো মনে গেঁথে আছে তার তুলনা হয় না।"[২৩]

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"In connection with a certain objectionable article published in the "Ananda Bazar Patrika" the question whether the securities deposited by the Publisher of the "Ananda Bazar Patrika" and the keeper of the Ananda Press should be forfeited, has been examined and it has been decided that as the article is not virulent enough for action under the Indian Press (Emergency Powers) Act no notice need be taken on the present occasion." [২৪]

১৯৩৮ সালের ২ মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'মেদিনীপুর জেলে রাজবন্দীদের অবস্থা' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটি সম্পর্কে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের প্রেস অফিসার প্রতিবাদ জানিয়েছেন, এই প্রতিবাদও ১৯৩৮ সালের ৯ মার্চের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছে।

কিছুদিন পর গভর্ণমেণ্ট রাজদ্রোহের অভিযোগে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নামে মামলা দায়ের করেছে। অ্যাডিশনাল চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯৩৮ সালের ১৮ জুলাই, সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে ছ-মাস এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে তিনমাস কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ও সুরেশচন্দ্রের পক্ষের কৌঁসুলী অবিলম্বে হাইকোর্টে দরখাস্ত করে প্রার্থনা জানালেন যে, সম্পাদক ও মুদ্রাকরের দণ্ডাদেশ কেন নাকচ হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের উপর রুল জারী করা হউক।

হাইকোর্ট রুল মঞ্জুর করে আসামীদের জামিনে মুক্তি দেবার নির্দেশ দিল। জামিনের পরিমাণ সাব্যস্ত করার ভার পেলেন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট।

চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ৩০০, টাকা করে জামিনে সত্যেন্দ্রনাথ ও সুরেশচন্দ্রকে মুক্তির আদেশ দিলেন।

হাইকোর্ট, ১৯৩৮ সালের ১ ডিসেম্বর, আপীলের রায় দিয়েছে। হাইকোর্টের বিচারে

সত্যেন্দ্রনাথ ও সুরেশচন্দ্র বেকসুর খালাস পেয়েছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৮ সালের ৩ ডিসেম্বর, লিখেছে: "এই শ্রেণীর হাস্যকর রাজদ্রোহের মামলায় সরকারী অর্থের অপব্যয় করিয়া এবং অপরপক্ষকে না-হক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া হক সরকার যে কার্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যদি জনসাধারণের চিত্তে অশ্রদ্ধা ও অস্নেহের ('ডিস্‌এফেকসন) উদ্রেক হয় এবং কেহ যদি তাহা প্রকাশ করে তাহা হইলে তাহাকে কি সিদিস্যানীর প্যাঁচে ফেলিয়া জেলে পুরিবার আয়োজন হইবে?"

১। Political Department Proceedings Nos. B131-32, February 1936.
২। Political Department Proceedings Nos. B136-44, April 1936.
৩। Political Department Proceedings Nos. B533-36, May 1936.
৪। Political Department Proceedings No. B210, June 1936.
৫। Political Department Proceedings No. B696, June 1936.
৬। Political Department Proceedings Nos. B526-27, August 1936.
৭। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
৮। Political Department Proceedings Nos. B438-39, November 1936.
৯। Political Department Proceedings Nos. B27-38, October 1936.
১০। Political Department Proceedings Nos. B1039-44, February 1937.
১১। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
১২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ জুন ১৯৫৫।
১৩। যোগেন্দ্রমোহন সেনের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
১৪। Political Department Proceedings Nos. B337-40, July 1937.
১৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ জুন ১৯৫৫।
১৬। Political Department Proceedings Nos. B601, September 1937.
১৭। Hindusthan Standard, 2 October 1937.
১৮। পরিমল গোস্বামী; স্মৃতিচিত্রণ (কলকাতা,১৯৫৮), পৃ. ২৭৭।
১৯। Political Department Proceedings No. B498, November 1937.
২০। Hindusthan Standard, 2 October 1937.
২১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ জুন ১৯৫৫।
২২। যোগেন্দ্রমোহন সেনের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
২৩। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
২৪। Political Department Proceedings Nos. B1160-61, January 1938.

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

ইতিহাসে আনন্দবাজার

কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯৩৮ সালের ১৮ মার্চ, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটারিকে লিখেছেন:

"I have the honour to inform you that Babu Jagadish Chandra Mukherjee, keeper of the Ananda Press situated at No. 1, Burman Street, Calcutta, from where the Ananda Bazar Patrika is printed is reported to have died on the 2nd March 1938 and Babu Suresh Chandra Mozumdar, the Managing Director of the Ananda Bazar Patrika Ltd. has filed declaration as keeper of the said press which has been accepted. The Security Deposit of Rs. 5000/- standing in the name of the said Jagadish Chandra Mukherjee has been transferred in the name of Babu Suresh Chandra Mozumdar the new keeper of the Press."[১]

হ্যাঁ, জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লোকান্তরিত হয়েছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৮ সালের ৪ মার্চ, লিখেছে: "জগদীশবাবুর বাড়ী ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেতকা গ্রামে। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ঢাকা কংগ্রেসের অধীনস্থ কয়েকটি কেন্দ্রে কয়েক বৎসর কাজ করার পর তিনি ১৯২৫ সালে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে খাদি প্রদর্শনী সম্পর্কে ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। প্রদর্শনীর পর ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে তিনি শিক্ষানবীশ হিসাবে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দেন। প্রথমে তিনি প্রুফরীডাররূপে কাজ করেন। তিনি তিন বৎসর প্রুফরীডারের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া সংবাদপত্র পরিচালনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং ১৯২৯ সালে মুদ্রণ ও প্রচার বিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন। এই কার্য্য গ্রহণ করার পর স্বীয় দক্ষতা এবং শ্রমশক্তিবলে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার প্রচার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। অতঃপর ১৯৩২ সালে তিনি এজেন্সী বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে আনন্দবাজারের জন্য রোটারি মেসিন আসিলে বর্ত্তমান বাড়ীতে

আনন্দবাজার কার্য্যালয় উঠিয়া আসে। তখন তিনি প্রচার বিভাগের ভার গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই কাজই করিতেছিলেন।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা' তখন ভারতবর্ষে সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র। কিন্তু তা নিয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নিজস্ব কোনো অহঙ্কার নেই, কারণ এই সত্য বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতির গৌরবের বস্তু।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৮ সালের ১৬ মার্চ, লিখেছে: "বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত একখানি সংবাদপত্র (আনন্দবাজার পত্রিকা) যে ভারতের মধ্যে সর্ব্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র এবং যে কোন বিদেশী ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে, ইহা বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতিরই গৌরব এবং বাঙ্গলা ভাষারই শক্তির পরিচয়। মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার সেবকরূপে আমরা এই কৃতিত্বের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কোন অহঙ্কার পোষণ করি না।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে'র জেনারেল ম্যানেজার মাখনলাল সেনকে, ১৯৩৮ সালের ৩০ মে, কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট রাজদ্রোহের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে চার মাস সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ২৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডে, অনাদায়ে আরো একমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

১৯৩৮ সালের ৩ নভেম্বরের (বৃহস্পতিবার) 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধার করি:

"অধুনা দৈনিক সংবাদপত্র পাঠকবৃন্দ প্রত্যহ কেবল দেশবিদেশের সংবাদ পাঠ করিয়াই পরিতৃপ্ত নহেন। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন তাঁহারা সাহিত্য এবং সাময়িক বিষয় সমূহে প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে চাহেন। পাঠকদের এই দাবী মিটাইবার জন্য ইংরাজী পত্রিকা সমূহে রবিবার ক্রোড়পত্রের ব্যবস্থা আছে। আমরাও রবিবার কলিকাতা সংস্করণ এবং মঙ্গলবারের মফঃস্বল সংস্করণে এবিষয়ে কিছু কিছু ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এজন্য ঐ সংস্করণের চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু বহু পাঠক আমাদিগকে ঐ সংস্করণের আকার বৃদ্ধি করার জন্য এবং অধিকতর প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহাদের এই অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত আমরা স্থির করিয়াছি যে, নবেম্বর মাসের প্রথম রবিবার হইতে আমরা প্রতি রবিবার আনন্দবাজার পত্রিকা ৩২ পৃষ্ঠা আকারে বাহির করিব। উহাতে বহু চিত্তাকর্ষক বিষয় সন্নিবেশিত হইবে। বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল লেখকদের প্রবন্ধ এবং চিত্রাদিতে রবিবারের 'আনন্দবাজার' সুশোভিত হইবে। উহা যাহাতে সর্ব্বত্র রবিবারেই পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

এইরূপ একখানা পত্রিকা প্রকাশ অতিশয় ব্যয়সাধ্য। সুতরাং আমরা রবিবারের আনন্দবাজারের মূল্য প্রতিখণ্ড এক আনা ধার্য্য করিয়াছি। রবিবাসরীয় আনন্দবাজার রবিবারেই কলিকাতা এবং মফঃস্বলের সর্ব্বত্র পাওয়া যাইবে।

বিনীত

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ।"

১৯৩৮ সালের ৫-নভেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপিত হয়েছে: "আগামী কল্য হইতে প্রতি রবিবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয় আলোচনী নূতন এবং বৃহত্তরভাবে প্রকাশিত হইবে।"

১৯৩৮ সালের ৬-নভেম্বরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'নূতন এবং বৃহত্তরভাবে' 'রবিবাসরীয় আলোচনী' প্রকাশিত হল। সেদিনের 'রবিবাসরীয় আলোচনী'র কয়েকজন লেখকের নামোল্লেখ করি: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; প্রমথ চৌধুরী; রমাপ্রসাদ

চন্দ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৩৯ সালের ২৫ জানুয়ারির 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'স্বাধীনতা দিবস' নামে একটি সম্পাদকীয় রচনা প্রকাশিত হল।

এই রচনাটি সম্পর্কে কলকাতার পাবলিক প্রসিকিউটর—নাম পি. জি. মুখার্জি—১৯৩৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মন্তব্য করেছেন:

"A thoroughly bad article. Appears to come within the mischief of Sub-clauses (d) and (h) of clause (1) of Section 4 of the Indian Press (Emergency Powers) Act, 1931.

May be reported to Government for action under section 7(3) or 8(1)(a) as may be applicable. Opinion of L. R. and if necessary of the Advocate General should be taken in this behalf."

কলকাতার পুলিশ কমিশনার, ১৯৩৯ সালের ৭/৮ ফেব্রুয়ারি, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারিকে লিখেছেন:

"I have the honour to send herewith, for the consideration and orders of Government, a copy of the Ananda Bazar Patrika, dated the 25th January 1939 in which appeared an editorial article entitled "Swadhinata Dibash", together with a review thereof. The public Prosecutor, Calcutta, who was consulted in the matter, is of opionion that the article appears to come within the mischief of Sub-clauses (d) and (h) of clause (1) of Section 4 of the Indian Press (Emergency Powers) Act, 1931. A copy of his opinion is enclosed.

I would request that, as suggested by the Public Prosecutor, the opinion of the Legal Remembrancer and if necessary that of the Advocate-General may kindly be obtained."

লীগ্যাল রিমেমব্রান্সার, ১৯৩৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, মন্তব্য করেছেন:

"I agree with the P. P. will Advocate General please advise."

অ্যাডভোকেট জেনারেল, ১৯৩৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি মন্তব্য করেছেন:

"I am inclined to agree with the L. R. but I am not prepared to say that the High Court will not take a different view."

গভর্ণমেণ্টের একজন কর্তাব্যক্তি, ১৯৩৯ সালের ৩ মার্চ, লিখেছেন:

"In my view we should in this instance accept the risk of failure and prosecute."

সরকারী ফাইলে বিস্তর লেখালেখি হল। এবং শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল যে সমস্ত বিষয়টির উপর যবনিকা পড়ুক।[২]

এতকাল 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সপ্তাহে একদিন বন্ধ থেকেছে। অতঃপর সে-ব্যবস্থা লুপ্ত হল। ১৯৩৯ সালের ২২ জানুয়ারি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপিত হয়েছে: "অধুনা সংবাদপত্র পাঠে লোকের আগ্রহ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, একদিন যথাসময়ে সংবাদপত্র না পাইলে পাঠকদের অসুবিধা হয়। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সপ্তাহে একদিন বন্ধ থাকে, সুতরাং পাঠকদের মধ্যে অনেককে সপ্তাহে একদিন পত্রিকা পাঠ বন্ধ রাখিতে হয় বা অন্য কোনও পত্রিকা লইতে হয়। পত্রিকা পাঠ বন্ধ রাখা বা এক দিনের জন্য অভ্যস্ত পত্রিকা ছাড়িয়া অন্য পত্রিকা পাঠও বিশেষ অসুবিধাজনক। পাঠকদের পত্রিকা

পাঠে আগ্রহের তৃপ্তির নিমিত্ত এবং উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থ এখন হইতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সপ্তাহের মধ্যে একদিনও বন্ধ রাখা হইবে না বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। যদি কদাচিৎ কোনও বিশেষ উপলক্ষে কোনও দিন পত্রিকা বন্ধ রাখা হয় তবে পূর্বে বিজ্ঞাপিত হইবে। যাঁহারা নগদ মূল্যে হকারদের নিকট হইতে বা এজেণ্টের নিকট হইতে কাগজ লইয়া থাকেন তাঁহারা আগামী সপ্তাহ হইতেই তাঁহাদিগকে প্রত্যহ 'আনন্দবাজার' দিতে বলিয়া দিবেন।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৩৯ সালের ৫ মার্চ, অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করে লিখেছে: "ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী গণ-আন্দোলনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই আমরা চলিয়াছি। 'আনন্দবাজার' জনসাধারণের পত্রিকা, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও অধিকার বঞ্চিতের পত্রিকা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্ববিধ বৈষম্য ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে এবং সাধ্যমত প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করিতে আনন্দবাজার কখনও দ্বিধাবোধ করে নাই। বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের দুর্গতি, কদাচার, কুসংস্কার, ভীরুতা ও ভণ্ডামির সংস্কার ও বর্জনের জন্য আনন্দ-বাজারের আন্দোলন, রক্ষণশীল সাম্প্রদায়িকতাবাদী কূপমণ্ডুকদের অপ্রীতিকর হইলেও অনিষ্টকর প্রথা, নিষেধ ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অনেকাংশে সাফল্যলাভ করিয়াছে।"

সেদিনেই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নিবেদন করেছে: "একদিকে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার উপর নির্ভরশীল কায়েমী স্বার্থবাদী স্বদেশী ও বিদেশী শাসক শোষক দল, অন্যদিকে তথাকথিত ধনী, জমিদার, ব্যবসায়ীর লুব্ধ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা—এই দুই সঙ্কটের মধ্য দিয়া জনসাধারণ ও দীন দরিদ্রের মুখপত্র আনন্দবাজারের আদর্শবাদ, তাহার সেবকগণ রক্ষা করিয়া চলিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের কৃতকার্য্যতা কতটুকু—সে বিচার প্রতিদিন সহস্র সহস্র নরনারী করিতেছেন। তাঁহাদের সহানুভূতি, সাহায্য ও শুভেচ্ছাই আমাদের বাহুর বল, মস্তিষ্কের শক্তি, হৃদয়ের সাহস। যখন নৈরাশ্য আসে, দুর্বলতা আসে, সংশয়ে চিত্ত পীড়িত হয়, তখন বন্ধনজর্জর মানবের মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষুব্ধ গর্জন কান পাতিয়া শুনি—শুনি কটিমাত্র কৌপীনসম্বল ভারতের চিরবঞ্চিত কৃষক শ্রমিক আজ বক্র মেরুদণ্ড ঋজু করিয়া মানুষের স্বরে মানুষের অধিকার দাবী করিতেছে! নবীন উৎসাহ, নবীন উদ্দীপনার সঙ্কেত আসে। এই সাম্প্রদায়িকতার কলকলা, চাকুরী ও প্রসাদলোভীর কাড়াকাড়ি, ক্ষুদ্রের স্পর্ধা আর নীচের প্রভুত্বপ্রয়াস —তুচ্ছ হইয়া যায়। কালসমুদ্রের দুদণ্ডের এই বুদ্বুদগুলি দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া যাইবে। বৃহত্তর সমস্যার মহত্তর সমাধানের জন্য যে সংগ্রাম আজ মনুষ্যজাতির হৃন্মর্ম আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার বিপুলতার সম্মুখে অদ্যকার দিনের স্বার্থান্ধ সুবিধাবাদীদের অপবিত্র আয়োজন কত তুচ্ছ! সেই উদার আদর্শবাদের মহোচ্চ লক্ষ্যের প্রতি ধ্রুবদৃষ্টি রাখিয়া আনন্দবাজারের মধ্য দিয়া যেন আমরা জাতির যথার্থ সেবা করিতে পারি—আনন্দবাজারের জন্মদিনে আমরা বাঙ্গলাদেশের নিকট সেই আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।"

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট, ১৯৩৯ সালের ২৩ জুন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদককে লিখেছেন:

"I am directed to refer to the report of the speech delivered by Babu Satish Chandra Chakrabarti, Chairman, Reception Committee, Dacca District Political Conference, published in the issue of your paper dated the 28th may 1939 and to say that it offends against clause (b) of Sub-section (1) of Sec. 4 of the Indian Press (Emergency Powers) Act, 1931. I am to say that the publication of such matter in your paper in the future will be

vigorously dealt with under the provisions of the said Act."[৩]

১৯৩৯ সালের ১২ জুনের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি রচনার সূত্রে গভর্ণমেণ্টের একজন কর্তাব্যক্তি, ১৯৩৯ সালের ২২ জুন, লিখেছেন:

"This type of article frequently appears in this paper and is calculated, I consider to do considerable harm, as the paper has a wide circulation." [৪]

১৯৩৯ সালের ২৩ সালের জুলাইয়ের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি রচনার সূত্রে গভর্ণমেণ্টের একজন কর্তাব্যক্তি, ১৯৩৯ সালের ১০ অগাস্ট. মন্তব্য করেছেন:

"It is very important that we should hit this paper as hard as we possibly can for publishing this dangerous staff. It is this which will infallibly revive the terrorist movement unless we use the powers in our hand boldly."[৫]

১৯৩৯ সালের ৩১ আগস্ট মাখনলাল সেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন।

এখানে মাখনলাল সম্পর্কে দু-চার কথা নিবেদন করে রাখা ভালো।

মাখনলাল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বিশারদ বংশের সন্তান। ১৮৮১ সালের ১১ জানুআরি চট্টগ্রামে জন্ম। বাবার নাম গুরুনাথ সেন। তিনি চট্টগ্রামের অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জন ছিলেন। গুরুনাথ চট্টগ্রাম থেকে উত্তরপাড়ায় বদলি হয়ে এসেছেন: মাখনলাল সেখান থেকে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পাশ করেছেন। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছেন; এফ.এ. পাশ করেছেন, বি.এ. পাশ করেছেন। এম.এ. ক্লাশে ভর্তি হয়েছেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে এসে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়েছেন।

মাখনলাল সুরেশচন্দ্রের বিপ্লবী জীবনের বন্ধু। সেই বন্ধুত্বের জন্যই সুরেশচন্দ্রের অনুরোধে মাখনলাল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এসেছেন।[৬]

মাখনলালের কর্মজীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অধ্যায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। দীর্ঘকাল তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে কার্যনির্বাহ করেছেন।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র আদি বেয়ারা কৃষ্ণকুমার দাস বলেছে: "বহুদিন আমি ভোলানাথের দোকান থেকে মাথায় করে কাগজ বয়ে এনেছি। এমনও হয়েছে কাগজ ছাপবে কিন্তু কাগজ নেই। অফিসে কাগজ কেনবার টাকাও নেই। সুরেশবাবু বললেন, আমার কাছে কিছু নেই, যা হয় ব্যবস্থা করুন। মাখনবাবু টাকার জন্যে চেষ্টা করতেন। একবার আমাকে ডেকে বললেন, পয়সাকড়ি আছে নাকি কিছু? যদি থাকে তবে দিয়ে দাও, কাল তোমায় দেব। আমায় দিতে হবে না, তুমি কাগজ কিনে নিয়ে এসো। আমি সেবার টাকা দিয়ে মাথায় করে কাগজ এনেছিলাম ভোলানাথ দত্তর দোকান থেকে। ক্যাশমেমোটা মাখনবাবুকে দিয়েছিলাম, উনি পরদিন টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন।"[৭]

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেছেন: "একবার ইউরোপিয়ান বণিক সমাজ আনন্দবাজারকে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেবার হুমকি দেখিয়ে জানতে চাইল, তোমাদের নীতি কী তা অবিলম্বে জানাও। বলা বাহুল্য, এই হুমকি এবং স্পর্ধিত আদেশের কাছে আনন্দবাজার মাথা নত করেনি। বরং বণিক সমাজের এই চিঠির উত্তরে মাখনবাবু স্বয়ং চিঠি লিখে জানালেন, সংবাদপত্রের নীতি রোজই তার কাগজে প্রতিফলিত হয়ে থাকে, আলাদা করে নীতি ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন দেখি না।"[৮]

'আনন্দবাজার পত্রিকা' ছেড়ে যাওয়ার পর মাখনলাল 'জার্ণালিস্ট কর্ণার' নামে সাংবাদিকদের এক মিলনস্থল প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারপর তাঁর পরিকল্পনায় ১৯৩৯ সালে 'ভারত' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে। 'ভারত' রাজরোষে পড়েছে, মাখনলাল আত্মগোপন করেছেন এবং ফলে 'ভারত' বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই মাখনলাল গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অন্তরীণ থেকেছেন। মুক্তির পর তিনি 'ভারত' পুনর্জীবিত করেছেন; কিন্তু 'ভারত' দীর্ঘায়ু হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন।[৯]

মাখনলাল সেন, ১৯৬৫ সালের ১০ মে, ৮৫ বছর বয়সে, ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৬৫ সালের ১১ মে, লিখেছে: "এই পত্রিকার শৈশবে যে কর্ণধারগণ পত্রিকাটিকে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সাহস ও নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত সেন তাঁদের অন্যতম। এই পত্রিকাটিকে গড়ে তোলার কৃতিত্বের একটি বিশেষ অংশ মাখনবাবুর প্রাপ্য।"

যোগেন্দ্রমোহন সেন বলেছেন: "১৯৩৯ এর পর, অর্থাৎ মাখনবাবু ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে সুরেশবাবু দু'বেলাই আসতেন। আর প্রফুল্লবাবু অফিসে এসেই সব বিভাগ একবার নিজে ঘুরে দেখতেন। তারপর এসে বসতেন আমাদের কাছে। যা যা সব সই করার থাকত তা করে দিয়ে তারপর যেতেন নিজের ঘরে অর্থাৎ নিউজ ডিপার্টমেণ্টে। কাজ এবং কথাবার্তায় প্রফুল্লবাবু খুব পাংচুয়াল ছিলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে নিজে ডেকে ডেকে কথা বলতেন, সকলের খোঁজখবর নিতেন।"[১০]

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"In connection with an article entitled "Mass Education" published in the "Ananda Bazar Patrika" of the 11th January 1940, an order under rule 116 of the Defence of India Rules was issued against the editor of the "Ananda Bazar Patrika". On recommendation of Hon'ble Chief Minister the matter was dropped without taking any action."[১১]

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ঊনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষে অনেকেই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ, ১৯৪০ সালের ১০ মার্চ, লিখেছেন: "নববর্ষে আনন্দবাজার পত্রিকার অভিনন্দন করি। সেই সঙ্গে এই কামনা করি যে বাংলাদেশে সর্বজনপাঠ্য সংবাদপত্রের যে প্রধান কর্তব্য তাহা যেন এই পত্রিকার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। বাঙালীকে আত্মবিস্মৃত জাতি বলা হইয়াছে, বস্তুত বাঙালী আত্মঘাতী জাতি। তীব্র অহমিকার উত্তেজনায় আমরা পরস্পরকে আঘাত করিতে সর্বদা প্রস্তুত। এই ব্যক্তিগত বিরুদ্ধতার আঘাত সমস্ত দেশের মর্মস্থানকে বিক্ষত করিয়া তাহার প্রাণশক্তিকে নিরন্তর ক্ষয় করিতে থাকে অন্ধ আবেগে একথা আমরা মনে রাখি না। এই কর্মনাশা ভেদবুদ্ধির সর্বনাশা বিস্তারে সমস্ত ভারতবর্ষের সভায় বাঙালীর আসন আজ সংকীর্ণ ও অসম্মানিত। পরস্পর সম্মিলনের ক্ষমাপরায়ণ ধৈর্যশীল সমবায়শক্তির দ্বারাই বাঙালী ক্রমপরিবর্দ্ধমান দুর্গতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে—অন্য উপায় নাই। আমাদের সংবাদপত্রগুলি এই উদার মিলনের পথে বাঙালীকে উৎসাহ না দিয়া যদি তাহার বিচ্ছেদসাধনের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে থাকে তবে তাহার পরাভব নিঃসংশয়িত। এই অসংযত আত্মবিনাশমত্ততা হইতে বাঙালীকে রক্ষা করিবার ব্রত গ্রহণ করুক, আনন্দবাজার পত্রিকাকে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত বাংলাদেশের হইয়া এই আমার নিবেদন জানাইতেছি।"[১২]

প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছেন: "আনন্দবাজার পত্রিকা এবার ১৯শ বর্ষে পদার্পণ করিল, ইহাতে আমি সত্যই আনন্দ বোধ করিতেছি। বাংগলা দৈনিক সংবাদপত্র 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা' আজ ভারতের সর্ব্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। বাংগলার এই জাতীয়তাবাদী পত্রিকা সুদীর্ঘকাল দেশবাসীর নিকট নির্ভীকভাবে স্বাধীনতার বানী প্রচার করিয়া আসিয়াছে, সর্ব্বপ্রকার গণ-আন্দোলন সমর্থন করিয়াছে। সুতরাং আনন্দবাজার যে দেশবাসীর চিত্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আরও বহু বৎসর ধরিয়া 'আনন্দবাজার' দেশসেবার সুযোগ লাভ করুক, ইহাই আমি চাই।..."[১৩]

বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ১৩৪৬ বংগাব্দের ১৫ ফাল্গুন, লিখেছেন: "আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯শ বৎসরে পদার্পণ করিল। ইহার এই বর্ষবৃদ্ধি বিশেষ আনন্দের বিষয়: অন্য প্রদেশের কথা জানি না, কিন্তু বঙ্গদেশে ইহা যে নানাদিক দিয়া দৈনিকপত্রের যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।...প্রতিদিন উচ্চাংগের ইংরাজী দৈনিকের সংগে সমান তালে পা ফেলিয়া চলা কত শক্ত তাহা বুঝাই যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা এ বিষয়ে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক প্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিককেও ইহা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। ইহা কেবল রাজনীতিই নহে, কিন্তু সাহিত্য, শিল্প, কলা, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচনা করিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া আসিতেছে। ইহা সত্যকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হউক, এবং বর্ষবৃদ্ধির সংগে ইহার সর্ব্বাংগীণ বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ।"[১৪]

প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন:

"আমি "আনন্দবাজার পত্রিকার" কর্ত্তাব্যক্তিদের সংগে বহুকাল হতে পরিচিত। গত বিশ বৎসরের মধ্যে "আনন্দবাজার" সংবাদপত্র হিসেবে যে রকম উন্নতি লাভ করেছে তাতে আমি যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি। এ যুগে আমরা সকলেই ডিমোক্রাসির ভক্ত। সংবাদপত্র হচ্ছে ডিমোক্রাসির একটি বড় সহায় এবং সেই সংগে শাসনকর্ত্তাদেরও প্রধান সমালোচক। সুতরাং শাসনকর্ত্তাদের সুপথে চালানোর ভিতর সংবাদপত্রের অনেকটা হাত আছে। ভোটের সাহায্যে আমরা শাসনকর্ত্তাদের নির্ব্বাচন করি এবং সেই নির্ব্বাচিত শাসনকর্ত্তাদের তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সংবাদপত্র নিত্য স্মরণ করিয়ে দেয়।

সংবাদপত্রের প্রধান সম্বল হচ্ছে সংবাদ। এ বিষয়ে বাংগলা সংবাদপত্রগুলি পূর্ব্বে যথেষ্ট হীনাংগ ছিল। "আনন্দবাজারের" স্পষ্ট গুণ হচ্ছে উক্ত পত্রিকা এ বিষয়ে দরিদ্র নয়। এবং এ বিষয়ে "আনন্দবাজার" ইংরাজী সংবাদপত্রদের প্রায় সমকক্ষ।..."[১৫]

'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়, ১৯৪০ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে, শিশু ও কিশোরদের জন্য একটি নতুন বিভাগের জন্ম হল, নাম—'আনন্দ মেলা'। 'আনন্দমেলার'র পরিচালক সেদিন নিবেদন করেছেন: "নতুন বছরের নতুন প্রভাতে আজ 'আনন্দবাজারে'র 'আনন্দ মেলা' সুরু হল— 'আনন্দবাজার' এতকাল ধরে শুধু বড়দের মনের খোরাক জুগিয়ে এসেছে বটে,— কিন্তু এখন থেকে সে ছোটদের মনের খোরাক যোগাবার চেষ্টা করবে 'আনন্দ মেলা'র মারফত প্রতি সোমবারে—এ ব্যবস্থার খবরটা শুনে তোমরা সকলেই যে খুব খুশী হবে তা আমি জানি; কিন্তু 'আনন্দ মেলা'র পাতাটা দেখে বা পড়ে শুধু খুশী হলেই চলবে না। 'আনন্দ মেলা'কে কি করে আরও জমিয়ে তোলা যায়, কি করলে 'আনন্দ মেলা'ই বাঙলার সকল ছেলেমেয়ের শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে সেকথা তোমরা নিজেরা ভাববে এবং আমাকে তোমাদের পরামর্শ দিয়ে সবসময়েই সাহায্য করবে। তোমাদের মধ্যে যারা লিখতে পারো তারা লেখা পাঠাবে—যারা ছবি আঁকতে পারো তারা ছবি পাঠাবে, যারা ফটো তুলতে পারো, তারা মজার মজার ছবি তুলে পাঠাবে—এইভাবে সকল রকমে তোমাদের গড়া 'আনন্দ মেলা'কে তোমরাই সাজিয়ে তুলবে এই আমার ইচ্ছা। আনন্দবাজারের 'আনন্দ মেলা'য় সবাই সমান; ছোট, বড়, গরীব, বড়লোক, হিন্দু, মুসলমান, জৈন বা ক্রীশ্চান যে

কেউ আমাদের এই 'আনন্দমেলা'য় যোগ দিতে পারে। এ 'আনন্দমেলা'য় শুধু তারাই আসতে পারে যারা নীচতা, শঠতা ও দলাদলির বাইরে। যারা জানতে চায়, যারা শিখতে চায়, যারা এগোতে চায় আলোর পথে। 'আনন্দ মেলা'য় তোমরা পাবে বিজ্ঞানের কথা, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গের কাহিনী, বড় বড় মনীষীদের জীবনী, ধাঁধা, নতুন নতুন বইয়ের খবর, নতুন নতুন আবিষ্কারের কথা, আরও কতো কি!..."

'আনন্দমেলা'র পরিচালকের ছদ্মনাম 'মৌমাছি', প্রকৃত নাম বিমল ঘোষ।

অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু এবং আরো কেউ কেউ 'আনন্দমেলা'কে অভিনন্দিত করে চিঠি লিখেছেন। "ভারতীয় ভাষায় দৈনিক সংবাদপত্রে দেশের শিশু ও কিশোরদের আনন্দ ও শিক্ষার উপযোগী বিষয় পরিবেশনের জন্য প্রতি সপ্তাহে গোটা একটি পৃষ্ঠা ব্যবহার করার উদার উদাহরণ আনন্দবাজার সর্বপ্রথম উপস্থিত করেন।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথ 'আনন্দ মেলা'কে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১৮ বৈশাখ আশীর্বাদ জানালেন:

"মূর্ত্ত তোরা বসন্তকাল মানবলোকে,
সদ্য নবীন মাধুরীকে আনলি চোখে
পুরানোকে ঝরিয়ে দেওয়ার মন্ত্র সাধা,
সরিয়ে দিলি জীবন পথের জীর্ণ বাধা।
ফুল ফোটানোর আনন্দ গান এলি শিখে,
কোথা থেকে ডাক দিয়েছিস মৌমাছিকে
চঞ্চল ঐ নাচের ঘায়ে তরুণ তোরা
উচ্ছলিয়া দিলি ধরার পাগলা-ঝোরা।
তাই আজি এই নববরষ স্নেহভরে
নবীন আশার বাহন তোদের আশীষ করে
মানবগৃহে তোরা প্রাণের প্রথম বাণী
স্বর্গ হতে কলভাষায় দিলি আনি।
মর্ত্য হতে যেন আবার দিনের শেষে
স্বর্গপানে পূর্ণতর যায় ফিরে সে।"

১৯৪০ সালের ১৭ মে থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'নাট্যলোক ও চিত্রকথা' নামক নিয়মিত সাপ্তাহিক বিভাগটি আরম্ভ হয়েছে।

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"With reference to his proposal for issuing a warning to the editor of the "Ananda Bazar Patrika" for publishing an objectionable matter in the paper in its issue, dated the 23rd May 1940, the District Magistrate, Burdwan, has been informed that his proposal has been duly considered by Government, but they have decided not to take any action in the matter."[১৭]

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে:

"Reply has been given by the Hon'ble Minister in charge of the Home Department on a Council question asked by Mr. Lalit Chandra Das regarding the prosecution of the editor, printer and publisher of the "Ananda Bazar Patrika" for violation of Government order in connection with "National Week, 1940."[১৮]

'সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক' নামে সঙ্গীত সম্পর্কিত নতুন একটি সাপ্তাহিক বিভাগ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় আরম্ভ হয়েছে ১৯৪০ সালের ৩-জুলাই: "বিশ্ববরেণ্য কবি

রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ৭ আষাঢ়, লিখেছেন "তোমরা আনন্দবাজারে সাপ্তাহিক গানের ভোজের যে আয়োজন করেছ সেটা সৎকর্ম। তোমাদের এই শুভ সংকল্পে বীণাপানি তোমাদের আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। আমি তাঁর সেই আশীর্বাদ বহন করে তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলুম। তোমাদের সাধনা সার্থক হোক।"

সুবোধ ঘোষ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যোগ দিয়েছেন ১৯৪০ সালে। মন্মথনাথ সান্যাল তখন 'রবিবাসরীয় আলোচনী' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। সুবোধ ঘোষ তাঁর সহকর্মী হিসেবে নিযুক্ত হলেন। ছ-মাস পর্যন্ত কোনো মাইনে পাননি, পরে তিরিশ টাকা মাইনে ধার্য হয়েছে।

সেসময়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সাহিত্যের পরিবেশ কেমন ছিল? সুবোধ ঘোষ বলেছেন: "খুব ভালো ছিল। এত ভালো যা ভাবা যায় না। আমি তো এখানে এসেই প্রথম গল্প লিখি। ফলে আমি জানি, কম্পোজিটর, প্রুফরীডার এমন কি সম্পাদক-মণ্ডলী পর্যন্ত প্রত্যেকটি লেখককে কীভাবে উৎসাহিত করতেন, অনুপ্রাণিত করতেন। তখন আমাদের কারো লেখা কাগজে বেরোলে এবং সে-লেখা ভালো হলে অফিসসুদ্ধু লোক তার জন্য আনন্দ করত।...সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের প্রতি আনন্দবাজার বরাবরই বেশি আগ্রহী। আগে দেখেছি রবিবাসরীয় বিভাগের ঘরটি ছিল সাহিত্যের নামকরা আড্ডা। সমকালীন সাহিত্য, অতীত দিনের সাহিত্য দেশ-বিদেশের সাহিত্য প্রভৃতি নিয়ে তখন খুব আলোচনা হত। বাজারে নতুন কোনো উপন্যাস প্রকাশিত হওয়া মাত্র তা নিয়ে আমরা আলোচনা ও সমালোচনায় মত্ত হতুম। হাতের কাছে না পেলে বইটি তৎক্ষণাৎ কিনেও আনা হয়েছে বহুক্ষেত্রে। সেকালের খ্যাতনামা লেখকদের প্রায় সকলেই আসতেন এই অফিসে।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথ? তিনি কখনো আসেননি? সুবোধ ঘোষ বলেছেন: "রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনো এ অফিসে আসেননি, কিন্তু এই কাগজের প্রতি ওঁর খুব মমতা ছিল। মন্মথবাবু যেতেন জোড়াসাঁকোয় ওঁর লেখা আনতে, প্রুফ দেখাতে। উনি নাকি বলতেন, তোমরা বড়ো ভালো করে আমার লেখাটা সাজাও, দেখলেই সুখ পাই, বেশ ভালো লাগে।"[২০]

১৯৪১ সালের ৭ জানুআরি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপিত হয়েছে:

"আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় পত্রিকার নীতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার মূলগত মতানৈক্য বিদ্যমান বলিয়া মনে করায় আনন্দবাজার পত্রিকার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহার সহিত একটা মীমাংসায় পৌঁছিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইতেছে, তবে এই সন্তোষ আমি অন্তরে পোষণ করিতে পারিতেছি যে, বন্ধুভাবেই আমরা পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় অদ্য ৭ই জানুয়ারী হইতে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর,
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ।"

"আনন্দবাজার ত্যাগ করার পর অধুনালুপ্ত 'স্বরাজ' ও 'সত্যযুগ' পত্রিকার সম্পাদনা ভারও তিনি (সত্যেন্দ্রনাথ) গ্রহণ করেন এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসাবে কিছুদিন 'যুগান্তর' পত্রিকায় কাজ করেন। নিজ সম্পাদনায়, ১৯৪১ সালে 'অরণি' নামে একটি প্রগতিশীল সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করেন। নির্ভীক ও প্রগতি-

শীল মতামতের জন্য কাগজখানি বহুল প্রচারিত ও সমাদৃত হয়।...গত মহাযুদ্ধের সময়ে গ্রেট বৃটেনের গ্লোব সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান যখন কলিকাতায় একটা শাখা অফিস স্থাপন করেন, তখন সত্যেন্দ্রনাথ উহার প্রধান সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি এক বৎসরকাল ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের সভাপতির পদও অলংকৃত করেন।"

১৯৫১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ রাশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনে গিয়েছেন। বিদেশ থেকে ফিরে এসে আবার তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেছেন। তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল।

হ্যাঁ, প্রফুল্লকুমার সরকার ১৯৪১ সালের ৭ জানুআরি থেকে আবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক হয়েছেন।

বিধুভূষণ সেনগুপ্ত লিখেছেন: "যখনই সময় পেতাম, যেতাম আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর (প্রফুল্লকুমার) কাছে। আলোচনা হত সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও রাজনীতি নিয়ে। সব সময়েই উজ্জ্বল প্রীতি-মাখানো হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করতেন তিনি। তাঁর ব্যক্তিত্বে এই স্নিগ্ধ হাসি ছিল চিরজ্যোতির্ময়। আনন্দবাজার পত্রিকার ওপর কত ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, কত ক্ষতি ও সংকটের আবর্ত এসেছে, কিন্তু তাঁর হাসি কখনো ম্লান হয়নি মুহূর্তের জন্যও।"[২১]

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন: "কর্মীর সংখ্যা কম থাকায় প্রফুল্লকুমারকে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত, অর্থাৎ সংবাদ অনুবাদ, বিজ্ঞাপন অনুবাদ প্রভৃতি থেকে সম্পাদকীয় লেখা পর্যন্ত সব কাজই করতে দেখেছি। তিনি মনেপ্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে কখনো ক্রোধ বা অভিমান দেখিনি। ভৃত্য না পেয়ে বহু সময় তাঁকে দিনে কুড়িবার একতলা-তেতলা করতে হত। বেলা ১১টায় অফিসে এসে প্রয়োজন হলে রাত্রি দুটো পর্যন্ত বহুদিন তিনি বিনা অভিযোগে কাজ করে গিয়েছেন। তখনও ধনী হননি, কাজেই ঐ সময়ের মধ্যে ভালো খাদ্যগ্রহণ করাও সম্ভব হত না।"

খুব খিদে পেলে অফিসে প্রফুল্লকুমারকে চার পয়সার মুড়ি কিনে খেতে দেখা গেছে। কিন্তু তামাক না হলে চলেনি। কৃষ্ণকুমার দাস বলেছে: "লেখবার আগে ওঁকে (প্রফুল্লকুমার) তামাক সেজে দিতে হত। লেখবার সময় নানা কাজে ওঁর কাছে গেছি, উনি বিরক্ত হননি। বরং দরজার কাছে দাঁড়ালেই বলতেন, কী চাই? যদি তামাক নিভে যেত, তবে ডাকতেন ধরিয়ে দেবার জন্যে। তামাক খেতেন আর লিখতেন।"[২৩]

হরিপদ মহলানবীশ বলেছেন: "একদিন সন্ধ্যার পর কী কাজে তাঁর (প্রফুল্ল-কুমার) কাছে গেছি। তামাক খাচ্ছিলেন। অন্যান্য দিন আমরা কেউ গেলেই তাড়াতাড়ি গড়গড়ার সটকাটা নামিয়ে কথা বলতেন। সেদিন তা করলেন না,—সংক্ষেপে "বলুন" বলে আবার তামাক খেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর সটকাটা রেখে একজন বেয়ারার নাম করে বললেন, "আজ ওকে গালি দিয়েছি—হারামজাদা বলে ফেলেছি। মনটা ভারি বিশ্রী লাগছে; কেন গালিটা দিলাম।" বেয়ারাটিকে চিনতাম দুর্বিনীত বলে ওর দুর্নাম ছিল। সে গুরুতর অপরাধ না করলে প্রফুল্লবাবু নিশ্চয় তার ওপর চটতেন না। অন্য কেউ হলে তাকে হয়তো কঠোর শাস্তি দিতেন, গালাগালি দিয়ে ভূতছাড়া করতেন, প্রফুল্লবাবু কেবল বলেছিলেন হারামজাদা—গালি হলেও অনুচ্চারণীয় নয়; কিন্তু তবু তাঁর সে কি গভীর অনুতাপ।"[২৪]

জ্যোতিষচন্দ্র দাশগুপ্তের বাড়ি পূর্ববঙ্গে, মানুষ হয়েছেন উত্তরবঙ্গে। ১৯৩৭ সালে তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় চাকরি পেয়েছেন।

কিছুকাল পরের কথা।

প্রফুল্লকুমার তখন শুধু আনন্দবাজারের ডিরেক্টরই নন, সম্পাদকও, সর্বক্ষণ

কর্মব্যস্ত।

জ্যোতিষচন্দ্র অফিসে বসে কাজ করছেন, হঠাৎ দেশের বাড়ি থেকে একটি টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত। বাবার ডবল নিউমোনিয়া, অবিলম্বে বাড়ি যেতে হবে। অথচ তখন মাসের শেষ, হাতে একটিও পয়সা নেই।

টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে জ্যোতিষচন্দ্র প্রফুল্লকুমারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রফুল্লকুমার তখন সম্পাদকীয় রচনায় ব্যস্ত, জ্যোতিষচন্দ্রকে দেখে লেখা থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। জ্যোতিষচন্দ্র টেলিগ্রামটা রাখলেন প্রফুল্লকুমারের সামনে।

টেলিগ্রামে একবার চোখ বুলিয়ে প্রফুল্লকুমার জিজ্ঞেস করলেন—বাড়ি যাবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পরমাত্মীয়ের মতো প্রফুল্লকুমার জেনে নিলেন বাড়িতে আর কে কে আছেন, বাবার বয়স কত, দাদা কোথায় থাকেন ইত্যাদি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—ছুটি পাওনা আছে?

—হ্যাঁ।

টেবিলের উপর থেকে একটা প্যাড এগিয়ে দিয়ে প্রফুল্লকুমার বললেন—একটা দরখাস্ত লিখে দিন।

দরখাস্ত লেখা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লকুমার ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন।

ছুটি তো পাওয়া গেল, কিন্তু টাকা? হাতে যে একটি পয়সাও নেই। কাচুমাচু হয়ে জ্যোতিষচন্দ্র বললেন—আরেকটা কথা ছিল।

জ্যোতিষচন্দ্রের অসহায় মূর্তির দিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে প্রফুল্লকুমার জিজ্ঞেস করলেন—টাকার দরকার?

জ্যোতিষচন্দ্র ঘাড় নাড়লেন।

—কত টাকা?

টাকার অঙ্ক শুনে প্রফুল্লকুমার আবার প্যাডটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—আরেকটা দরখাস্ত লিখুন।

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর। দরখাস্ত হাতে নিয়ে জ্যোতিষচন্দ্র হাজির হলেন ক্যাশিয়ার নির্মল দাশগুপ্তের কাছে। দরখাস্তটা নেড়েচেড়ে দেখে তিনি বললেন—তাই তো, বড়ো মুশকিলে ফেললেন জ্যোতিষবাবু। ক্যাশ তো বন্ধ হয়ে গেছে।

—তাহলে উপায়?

—উপায় একটা আছে। প্রফুল্লবাবু যদি বলেন তাহলে আমি টাকা দিতে পারি।

আবার তিনতলায় প্রফুল্লকুমারের ঘরে এলেন জ্যোতিষচন্দ্র। তখনও তিনি ঘাড় গুঁজে একমনে লিখে চলেছেন। আবার কি ওঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে? যদি উনি রাগ করেন?

একটু ইতস্তত করে জ্যোতিষচন্দ্র প্রফুল্লকুমারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

প্রফুল্লকুমার বললেন—আবার কী ব্যাপার?

সব শুনলেন প্রফুল্লকুমার। তারপর দরখাস্তটা হাতে নিয়ে কী যেন একটু ভাবলেন। হয়তো ভাবলেন, প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করতে তিনি ক্যাশিয়ারকে বলতে পারেন না; কিন্তু নিয়ম মানতে গেলে একজন দরিদ্র কর্মী টাকার অভাবে তাঁর রুগ্ন বাবাকে দেখতে যেতে পারবেন না, চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে পারবেন না।

দু-এক মিনিট কী যেন ভেবে নিয়ে প্রফুল্লকুমার বললেন—নির্মলবাবুকে বলুন একটা ভাউচার করে দিতে। ভাউচারটা নিয়ে আসুন, তারপর আমি দেখছি।

আবার নির্মল দাশগুপ্তের কাছে গেলেন জ্যোতিষচন্দ্র। একটা ভাউচার লিখিয়ে

নিয়ে ফিরে এসে জ্যোতিষচন্দ্র দেখলেন, প্রফুল্লকুমারের টেবিলের কাছে পাতিরাম দাঁড়িয়ে আছেন, টাকার ব্যবস্থার জন্য প্রফুল্লকুমার ইতিমধ্যে পাতিরামকে ডাকিয়ে এনেছেন। ভাউচারটা জ্যোতিষচন্দ্রের হাত থেকে নিয়ে প্রফুল্লকুমার পাতিরামের হাতে দিয়ে বললেন—তুমি টাকাটা ওকে দিয়ে দাও। কাল ক্যাশ খুললে টাকাটা নিয়ে নিও।

এই ঘটনার সূত্রে জ্যোতিষচন্দ্র উত্তরকালে বলেছেন: "ওই ঘটনার পর আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। শান্ত আত্মসমাহিত প্রফুল্লকুমার সরকারের সেই বরাভয় মূর্তির সামনে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে প্রণাম করতে গিয়ে অনুভব করলাম চোখের জলে সব কিছুই ঝাপসা। দু' হাত বাড়িয়ে তিনি যখন আমায় কাছে টেনে নিলেন তখন প্রচণ্ড আবেগে আর আনন্দে আমার সারা শরীর কাঁপছে। সেই পরম বৈষ্ণবের শান্ত হাতের সান্ত্বনায় আমার সব দুর্ভাবনা কেটে গিয়েছিল।"[২৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংবাদপত্রসেবায় প্রফুল্লকুমারের কৃতিত্বের কথা স্মরণ করে ১৯৪২ সালে তাঁকে ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীসঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৯৪১ সালের ১৩ মার্চ, বিংশ বর্ষে পদার্পণ করে লিখেছে: "দেশবাসী ইহার (আনন্দবাজার পত্রিকা) মধ্যে আপনাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছে, ইহার ভাষার মধ্যে তাহাদেরই মনের ভাষা, তাহাদেরই নিত্যকার সুখদুঃখবেদনার প্রতিধ্বনি শুনিয়াছে। 'আনন্দবাজারের' এই সাধনার জন্যই বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী তাহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ১৯৪১ সালের ৯ এপ্রিল ও ১১ এপ্রিল, প্রকাশিত 'বর্তমান অবস্থায় কর্তব্য' ও 'হক মন্ত্রীমণ্ডলীর ব্যর্থতা' এবং ১৯ ও ২৪ এপ্রিল প্রকাশিত 'যৎকিঞ্চিৎ' নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও মন্তব্যের জন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নামে আদালতে নালিশ এসেছে। সমন পেয়ে প্রফুল্লকুমার সরকার ও সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯৪১ সালের ১৪ জুলাই, চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির হয়েছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৪১ সালের ১৫ জুলাই, লিখেছে: "গত এপ্রিল মাসের বিভিন্ন তারিখে ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও মন্তব্য প্রকাশ করা সম্পর্কে কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অভিযোগক্রমে ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট গত মঙ্গলবার সমন জারীর আদেশ দেন এবং তাঁহাদের উপর সমন জারী হয়। তদনুসারে তাঁহারা গত সোমবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির হন। সোমবার উহাদের উভয়কেই দুইশত টাকার করিয়া ব্যক্তিগত জামীন মুচলেকায় মুক্তি দেওয়া হয়...।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৪২ সালের ২ মার্চ, একবিংশ বর্ষে পদার্পণ করে লিখেছে: "জনসাধারণের নিকট হইতে আমরা যে আন্তরিক সহযোগিতা ও আনুকূল্য লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁহাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় 'আনন্দবাজার পত্রিকার' প্রচার যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইতিপূর্বে এদেশের কোন সংবাদপত্রের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আজ ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় সংবাদপত্র—বাঙ্গলার বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ইহার বিপুল প্রচার।"

দোলযাত্রা উপলক্ষে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বরাবর বন্ধ। কিন্তু অন্তত একবার এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে।

১৯৪২ সালের ২ মার্চের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপিত হয়েছে: "যুদ্ধ

ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত; এমন অবস্থায় যুদ্ধের নিত্যনূতন পরিস্থিতি প্রত্যহ পাঠকগণের গোচর করা আবশ্যক। সুতরাং এবার শ্রীশ্রীদোলযাত্রা উপলক্ষে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় বিভাগ বন্ধ থাকিবে না এবং কাগজ যথারীতি প্রকাশিত হইবে।"

গবর্ণমেণ্টের ক্রমবর্দ্ধমান ও অসম্মানজনক বিধিনিষেধ এমনভাবে আরোপিত হচ্ছে যে কারো পক্ষে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে সংবাদপত্র প্রকাশ অসম্ভব। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৪২ সালের ২০ অগস্ট, বিজ্ঞাপিত করেছে: "১৫ খানি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র গত ১৭ই আগস্ট যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আগামীকল্য হইতে কার্য্যকরী হইবে। সুতরাং অদ্যকার সংখ্যার পর আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকিবে।"

কয়েক দিনের জন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রকাশ স্থগিত রইল।

১৯৪২ সালের ২৭ অগস্ট 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুরেশচন্দ্র মজুমদার গ্রেপ্তার হলেন। উত্তর কলকাতার মোহনলাল ষ্ট্রিটের বাড়ি থেকে তাঁকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সুরেশচন্দ্র কয়েকমাস প্রেসিডেন্সী জেলে নিরাপত্তারক্ষার্থ বন্দী হয়ে থেকেছেন। ১৯৪৩ সালের ৩০ জুন সাড়ে নটায় তিনি মুক্তি পেয়েছেন। "মুক্তিলাভের পরই শ্রীযুক্ত মজুমদার সরাসরি "আনন্দবাজার পত্রিকা" ও "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" অফিসে মোটর-যোগে উপস্থিত হন এবং তথায় কয়েক মিনিট অবস্থান করিয়া উপস্থিত কর্মীদের সহিত দেখা সাক্ষাতের পর তাঁহার মোহনলাল ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে গমন করেন। সন্ধ্যার সময় তিনি পুনরায় কিছুক্ষণের জন্য অফিসে আসেন এবং তথায় কর্মীবৃন্দ ও বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছার আদানপ্রদান করেন।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৪৩ সালের ১ জুলাই লিখেছে: "শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার গত বুধবার প্রাতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। দশ মাস পূর্বে, গত ২৭শে আগস্ট তিনি ভারতরক্ষা আইনে ধৃত হন। গ্রেপ্তারের পূর্ব হইতেই তিনি রক্তচাপ রোগে ভুগিতেছিলেন। গ্রেপ্তারের পর জেলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙিয়া পড়ে। চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে হয়; কিন্তু স্বাস্থ্যোন্নতি হয় না—রক্তচাপ ও অনিদ্রারোগ তাঁহাকে দিন দিন দুর্বল করিয়া ফেলে। আজ নিতান্ত ভগ্ন-স্বাস্থ্যে তাঁহাকে কারামুক্ত করা হইল। ভগ্ন-স্বাস্থ্যের দরুণ বহু পূর্বেই তাঁহাকে কারামুক্ত করা কর্তব্য ছিল। বিগত মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে তাঁহাকে মুক্তিদানের চেষ্টা করা হইলেও তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই! কেন পারে নাই, কাহার বা কাহাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা রাজনীতিক বন্দীদের কারাবাস ও কারামুক্তির জন্য দায়ী, সেকথা কাহারও অজ্ঞাত নহে। আজ গবর্ণমেণ্ট বহু বিলম্বে হইলেও, সুরেশবাবুর সম্পর্কে কর্তব্যপালন করিয়াছেন। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল যে এ বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে আমরা কার্পণ্য করিব না।"

উত্তরকালে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছেন: "বন্ধনমুক্ত কংগ্রেসনেতাদের সহিত সুরেশচন্দ্র বাহিরে আসিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস পুনর্গঠন এবং নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব কৃতিত্বের সহিত পালন করিয়াছেন। গণপরিষদের সদস্য হইয়া তিনি শাসনতন্ত্র রচনায় নেতৃবৃন্দকে পরামর্শ দিয়াছেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে 'বন্দেমাতরম' জাতীয় সঙ্গীতরূপে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করে। কংগ্রেসের প্রবীণ কর্মীরূপে তিনি কেন্দ্রীয় উচ্চ পরিষদে নির্বাচিত হন। নয়াদিল্লীর রাজনৈতিক মহলে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন।"[২৬]

১। Political Department Proceedings No. B109, April 1938
২। Political Department Proceedings No. B548, December 1939

৩। Political Department Proceedings No. B225, July 1939
৪। Political Department Proceedings No. B548, December 1939
৫। Political Department Proceedings No. B548, December 1939
৬। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ মার্চ ১৯৭২।
৭। কৃষ্ণকুমার দাসের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
৮। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
৯। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ মার্চ ১৯৭২।
১০। যোগেন্দ্রমোহন সেনের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
১১। Political Department Proceedings Nos. 232-38, May 1940
১২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ মার্চ ১৯৪০।
১৩। তদেব।
১৪। তদেব।
১৫। তদেব।
১৬। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ জুন ১৯৫৫।
১৭। Political Department Proceedings Nos. B597-98, August 1940
১৮। Political Department Proceedings Nos. B404-05, August 1940
১৯। সুবোধ ঘোষের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
২০। তদেব।
২১। বিধুভূষণ সেনগুপ্ত; সাংবাদিকের স্মৃতিকথা (কলকাতা, ১৯৫৫), পৃ ২৫-২৬।
২২। ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার
২৩। কৃষ্ণকুমার দাসের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
২৪। হরিপদ মহলানবীশের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
২৫। জ্যোতিষচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
২৬। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারঃ সুরেশচন্দ্র মজুমদার (কলকাতা, ১৯৫৪), পৃ ৮।

ইতিহাসে আনন্দবাজার

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৪৩ সালের ২১ মার্চ, দ্বাবিংশবর্ষে পদার্পণ করে লিখেছে: "জনসাধারণের এই অন্ন সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের আত্মরক্ষার সমস্যাও নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। কাগজের অভাবে সংবাদপত্রের কলেবর হ্রাস এবং মূল্যবৃদ্ধি করিতে হইতেছে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতেই ক্ষীণকায় সংবাদপত্রগুলিকে দ্বিগুণ মূল্যে অভাবগ্রস্ত দেশবাসীর দ্বারে পেঁছাইয়া দিতে হইবে—ইহা তাঁহাদের পক্ষে যেরূপ কষ্টকর—আমাদের পক্ষেও তেমনি মর্ম্মান্তিক!"

১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বিজ্ঞাপিত করেছে:

"বর্তমান মহাযুদ্ধের দরুণ পৃথিবীর সর্বত্রই আজ সংবাদপত্র মুদ্রণোপযোগী কাগজের ভয়ানক অভাব ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে সংবাদপত্র মুদ্রণোপযোগী কাগজ প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এখানে সংবাদপত্র পরিচালনা এক মহা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্তমানে কানাডা ও আমেরিকা ছাড়া আর কোন স্থান হইতে মূল্য দিয়াও কাগজ পাওয়া যায় না এবং সমুদ্রপথের অনিশ্চয়তার দরুণ ঐ দুই স্থান হইতেও কাগজ আমদানী করা প্রায় অসম্ভব হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় পৃথিবীর সর্বত্রই কাগজের সমস্যা সমাধানের জন্য সংবাদপত্রের আকার ও পৃষ্ঠসংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মূল্য বৃদ্ধি করিয়া প্রচারসংখ্যা সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যে কাগজ মজুত আছে উহার দ্বারাই যাহাতে বর্তমানে সংবাদপত্র পরিচালিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতের সকল সংবাদপত্রের আকার ও উহার মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

উক্ত নিয়ন্ত্রণাদেশ অনুসারে আগামী ১লা এপ্রিল হইতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে'র আকার ৪ পৃষ্ঠা মূল্য দুই আনা হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে কেবল রবিবাসরীয় সংখ্যা ৮ পৃষ্ঠা দুই আনা থাকিবে। ঐ তারিখ হইতেই সংক্ষিপ্ত আনন্দবাজার পত্রিকার প্রকাশও অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

আমরা আশা করি, পাঠকবর্গ অতীতে যে সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা 'আনন্দ-

বাজার পত্রিকা'কে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন, বর্তমান সংকটের মধ্যেও সেই সাহায্য ও সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইবে না।"

১ এপ্রিল ১৯৪৩। সেদিন থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রথম পৃষ্ঠায় নিয়মিত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, বিজ্ঞাপন নামমাত্র। ইতিপূর্বে দু-একবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদ প্রকাশিত হলেও তা রীতি হিসেবে গৃহীত হয়নি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রথম পৃষ্ঠা ইতিপূর্বে সাধারণত বিজ্ঞাপনেই ভর্তি থেকেছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৪৪ সালের ৯ মার্চ, ত্রয়োবিংশবর্ষে পদার্পণ করে লিখেছে:

"বর্তমানে জাতির পক্ষে যে-সব সংকট দেখা দিয়াছে, অতীত ইতিহাসে তাহার তুলনা বিরল। সমগ্র বাঙলা দেশের বুকের উপর দিয়া দুর্ভিক্ষের যে ঝড় বহিয়া গেল, তাহার সঙ্গে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরেরই একমাত্র তুলনা হইতে পারে। এই দুর্বিপাক বাঙলা দেশকে বিধ্বস্ত করিয়াছে; ইহার আঘাতে এদেশের সমাজ-ব্যবস্থা একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে। বহু গ্রাম জনহীন শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছে; ইহার ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি—সকল দিক হইতেই বাঙলা দেশ আজ বিপন্ন।...

ইহার পর, জাতির সর্বাধিক ব্যাপক রাজনৈতিক সমস্যা রহিয়াছে; প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিক এই সমস্যাকেই আমরা অন্যান্য সমস্যার মূল কারণ বলিয়া মনে করি এবং আমাদের বিশ্বাস এই যে, পরাধীন অবস্থাজনিত এই রাজনীতিক সমস্যার সমাধান ব্যতীত দেশের অপর কোন সমস্যারই স্থায়ীভাবে সমাধান হইতে পারে না। জাতির পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বাধীনতা এবং আমরা যদি স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ না হই, তবে অন্য উপায়ে স্বার্থসংঘাতপূর্ণ বর্তমান জগতে আর্থিক এবং সামাজিক বিপর্যয় হইতে রক্ষা পাওয়া আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না।"

১৯৪৪ সালের ১৩ এপ্রিল প্রফুল্লকুমার সরকার লোকান্তরিত হয়েছেন। 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা', ১৯৪৪ সালের ১৪ এপ্রিল, বিজ্ঞাপিত করেছে: "আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও ডিরেক্টর শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনে অদ্য শুক্রবার, ১৪ই এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকিবে। সুতরাং আগামীকল্য শনিবার, ১৫ই এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হইবে না।"

দীর্ঘদিন প্রফুল্লকুমারের সহকর্মী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কিন্তু প্রফুল্লকুমারের বিরুদ্ধে সত্যেন্দ্রনাথ জীবনে কখনো নালিশ করার মতো কিছু দেখেননি। বহুদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সম্পাদনা করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ, কিন্তু তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রফুল্লকুমারের মতো মানুষ না থাকলে সত্যেন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারতেন না। সত্যেন্দ্রনাথ স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন: "প্রথম ১২ বৎসর আনন্দবাজার পত্রিকা পদে পদে যে সময় অর্থাভাব, অনটন ও বহু প্রকার পীড়নের ভিতর দিয়া চলিয়াছে সেই সময় প্রফুল্লবাবু যে কি অক্লান্ত ধৈর্য সহকারে দিনের পর দিন উহার সেবা করিয়াছেন তাহা অবর্ণনীয়।... তিনি ছিলেন নিরলস, নিরভিমান মানুষ। কোনদিন তাঁহার মুখ হইতে একটা মাত্র কটু কথা বা রূঢ় কথাও বাহির হইতে দেখা যায় নাই। তাঁহার সহিষ্ণুতা ছিল অসীম; রুচি বা শালীনতাও ছিল অনন্যসাধারণ।... তাঁহার জীবন ছিল নিয়মানুবর্ত্তিতায় বাঁধা, কোনও দিন তিনি এক চুল কর্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। আনন্দবাজার পত্রিকার তিনি অন্যতম মনিব ছিলেন; কিন্তু মনিবের বা চাকর শাসাইবার মনোবৃত্তি তিনি কখনও দেখান নাই।"[১]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৬ সালের ১৪ এপ্রিল, বলেছেন: "মানুষ প্রফুল্লকুমারকে আমি প্রণাম করি এই কারণে যে তিনি শত উদ্বেগ ও সংকটের মুহূর্তেও

ঈশ্বরের চরণ আঁকড়ে ছিলেন। প্রফুল্লকুমারের মধ্যে আমরা পেয়েছি এক প্রেমিক মানুষকে। দ্বৈত সত্তা তাঁর মধ্যে ছিল না। সত্যকে তিনি নির্ভীকভাবে প্রকাশ করে গিয়েছেন।"

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৯ সালের ১৩ এপ্রিল, বলেছেন: "আনন্দবাজারের জয়যাত্রার ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের ত্যাগ ও কৃতিত্ব জড়িয়ে রয়েছে প্রফুল্লকুমার তাঁদের মধ্যে অন্যতম।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৪৫ সালের ২৬ ফেব্রুআরি, চতুর্বিংশবর্ষে পদার্পণ করে লিখেছে: "স্বাধীনতা আসে নাই। এই বেদনা অন্তরে বহিয়াই চলিতেছি। কারারুদ্ধ জাতীয় আত্মার মর্মবেদনা প্রকাশের জন্যই 'আনন্দবাজার' দেখা দিয়াছিল। আজ পুনরায় জাতীয় নেতৃবৃন্দ কারার অন্তরালে। বয়সের ভার অগ্রাহ্য করিয়া এবং গভীর শোকের আঘাত ভুলিয়া সদ্য কারামুক্ত গান্ধীজী দৃঢ়করে পতাকা ধারণ করিয়া এখনও জাতির পুরোভাগে বর্তমান; সংকল্পসাধনার দুর্দমনীয় তেজ ও তপঃশক্তি অনির্বাণ বহ্নির মত নয়নে জ্বলিতেছে; শান্তি ও অহিংসার সেই শাশ্বত বাণী এখনও অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসে বিশ্বমানবের নিকট প্রচার করিতেছেন। ভারতের দ্বারপ্রান্তে, নিকটে ও দূরে বিপুল অস্ত্রের ঝঞ্জনা। তাহারই মধ্যে তপশ্চারী ভারতের আত্মা শান্তি ও অহিংসার বাণী প্রচার করিতেছে; স্থূল ও জড়শক্তির প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া মানবের অধ্যাত্মসাধনার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় এই বিরাট প্রহেলিকা চিরকাল মনীষীদিগের চিন্তা ও বিস্ময়ের বিষয় হইয়া থাকিবে। বিশ্বব্যাপী যে মহাপ্রলয়ের ধ্বংসলীলা চলিতেছে, তাহার মধ্য হইতে এই একটা প্রশ্নই সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া দেখা দিতেছে—সভ্যতার গতি কোন দিকে প্রধাবিত হইবে? ইহার পর যে নূতন সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী, সে সৃষ্টি কি প্রকৃতি লইয়া দেখা দিবে— জড়বাদ, না অধ্যাত্মবাদ? বিদ্যা, না অবিদ্যা? দেবত্ব, না অসুরত্ব? সর্বদেশে নির্জিত— নিপীড়িত—বিক্ষুব্ধ মানবাত্মা পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্নই করিতেছে। এই বৃহৎ প্রশ্ন সম্মুখে লইয়াই আমরা নববর্ষে প্রবেশ করিলাম। বন্দে মাতরম্।"

১৯৪৬ সালের ১৭ মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' পঞ্চবিংশ বর্ষে পদার্পণ করল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে স্মরণ করে সেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "ভারতের রাজনীতিতে নব রশ্মিচ্ছটার বিকাশ দেখিতেছি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মসাধনা ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের যাত্রাপথে যেন নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছে। ১৯৪২ সালের পর হইতে অবসাদগ্রস্ত ভারত 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র প্রেরণায় বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের ন্যায় জাগিয়া উঠিয়াছে। দেশের সর্বত্র নূতন শক্তির স্ফুরণ দেখা দিয়াছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠন ও অভিযান ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে কত বড় ঘটনা তাহার উপলব্ধি ক্রমশঃই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। গান্ধীজী পুনঃ পুনঃ দৃঢ়বিশ্বাসে বলিতেছেন সুভাষচন্দ্র জীবিত আছেন। সমগ্র ভারতবর্ষ একবাক্যে প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিতেছে—মহাত্মার কথাই সত্য হউক।"

১৯৪৬ সালের অগস্টের কয়েকটি দিন কলকাতা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বীভৎস হয়ে উঠেছে। চতুর্দিকে নরহত্যা ও লুঠ-তরাজের রাজত্ব। দুর্দশা থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'ও নিস্তার পায়নি; কিন্তু সেই দুর্দিনেও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কর্তব্যে যথাসাধ্য অবিচল থেকেছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৪৬ সালের ২৭ অগস্ট, লিখেছে:

"গত ১৬ই অগাস্ট শুক্রবার মুসলিম লীগের "প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দিবসের" অনুষ্ঠান উপলক্ষে আহূত ময়দানের মুসলিম জমায়েতের বহু পূর্ব হইতেই আনন্দবাজার আফিসের উপর লীগ সমর্থকদের ধারাবাহিক আক্রমণ আরম্ভ হয়। বর্মণ ষ্ট্রীট ও

বালমুকুন্দ মক্কর রোডের সংযোগ স্থলে বেলা দ্বিপ্রহর হইতেই উন্মত্ত মুসলমান জনতার সমাবেশ হইতে থাকে এবং চতুর্দিকে লুঠতরাজ আরম্ভ হইয়া যায়। আমাদের আফিসের সকল প্রধান ফটকই যুগপৎ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং আফিসের সকলকেই নীরব ও সতর্ক থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। দ্বারোয়ান, বেয়ারা, কেরাণী, মেশিনম্যান এবং যুবস্থানীয় অনেকেই আত্মরক্ষা এবং প্রাণের বিনিময়েও এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করিবার সংকল্প গ্রহণ করে।

ইতিমধ্যে লাঠি, তরবারি ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মুসলমান জনতা ধ্বনি করিতে থাকে এবং প্রত্যুত্তরে বর্মণ ষ্ট্রীট এবং চিৎপুরের সংযোগ স্থল হইতে একদল হিন্দুও ধ্বনি করিতে থাকে। ক্রমে উভয় দল হইতে উভয়ের প্রতি ইষ্টক খণ্ড নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। আনন্দবাজারের কর্মীগণ আফিসের গবাক্ষ হইতে দাঙ্গা ও ধ্বনি না করিবার জন্য উভয় দলের প্রতি আবেদন জানান। তাহার পর সকল আবেদন ব্যর্থ করিয়া অপরাহ্ণ প্রায় চারি ঘটিকায় আনন্দবাজার পত্রিকার সর্টিং পোষ্ট আফিসে অগ্নি প্রদান করা হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুণ্ডাগণ কর্তৃক আমাদের আফিস-বাটীও আক্রান্ত হয়। উপায়ন্তর না দেখিয়া তখন অবরুদ্ধ অবস্থায়ই সকলে প্রাণপণে বাধা দিতে থাকে এবং এই প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করে। সম্মুখে যুধ্যমান আততায়িগণের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ হইতে ২০০০ হাজার হইবে এবং তাহাদের পিছনেও অগণিত জনতা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল এবং নানাপ্রকার লীগের ও হিন্দুবিরোধী আক্রমণাত্মক ধ্বনি সহ উহাদিগকে উত্তেজিত করিতেছিল। পুলিশের কোটপ্যাণ্টধারী (পদস্থ কর্মচারীর ন্যায়) জনৈক ব্যক্তিকেও উক্ত জনতার মধ্যে বারংবার ব্যস্তভাবে চলাফেরা করিতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু দাঙ্গা প্রশমনকল্পে তিনি কোনও প্রয়াস করিতেছেন বলিয়া মনে হইল না।

ইতিমধ্যে প্রায়ই আমাদের প্রতি ইষ্টক বর্ষিত হইতে থাকে। তাহার পর প্রায় দুই ঘণ্টার সাময়িক বিরতির পর পুনরায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে আফিস-বাটীর সম্মুখস্থ আমাদের গুদাম বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করা হয় এবং যুগপৎ আফিস বাড়ী পুনরায় আক্রান্ত হয়। অনুকূল বাতাসে অগ্নি ক্রমশঃ বর্ধিতায়তন হইয়া উঠে। জনতা আর একবার আমাদের প্রধান আফিসে আগুন লাগাইবার চেষ্টা করে। ইতিপূর্বে বহু চেষ্টায় পোষ্ট আফিসের অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এবার পুনরায় অগ্নিসংযোগ হইলে আনন্দবাজার আফিস ও বর্মন বাজার সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া আমাদের কর্মীগণ আক্রমণকারিগণকে বাধা দিতে থাকে। পুলিশের সাহায্যের জন্য লালবাজারে সংবাদ দিলেও কোনও সাহায্য আসিয়া পেঁছায় নাই। ফায়ার ব্রিগেডকে পুনঃ পুনঃ সংবাদ দিয়াও বিশেষ কোনও ফল হয় নাই। রামলোচন মল্লিক রোড ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থল, তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট এবং জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থান হইতে ছোরামারা ও নরহত্যার সংবাদ আসিয়া আমাদের নিকট পেঁছিতে থাকে। জোড়াসাঁকো থানা এবং কলিকাতা পুলিশের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার প্রভৃতি পুলিশ প্রধানগণকে সকল সংবাদ, বিশেষতঃ আমাদের আফিস ও গুদাম ঘর আক্রমণের সংবাদ দিয়া সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হয়।

পরের দিন শনিবার আমাদের কর্মিগণ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া গুদাম বাড়ীতে গিয়া বালতি দ্বারা অগ্নি নির্বাণের চেষ্টা করেন; কিন্তু, পর্যাপ্ত জল না পাওয়ায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। অতঃপর ষ্টীরাপ পাম্প দ্বারা গুদাম ঘরের অগ্নি নির্বাণ করিবার চেষ্টা করিলে নিকটস্থ মসজিদ হইতে কর্মিগণের প্রতি বৃষ্টিধারার ন্যায় ইষ্টক বর্ষিত হইতে থাকে। তাহা সত্ত্বেও যতক্ষণ সম্ভব উক্ত আক্রমণকে উপেক্ষা করিয়াই আফিসের বেয়ারাগণ গুদাম ঘরের দিকে জল নিক্ষেপ করিতে থাকে। অতঃপর জাতীয় অ্যাম্বুল্যান্স

বাহিনীর চেষ্টায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে একদল ফায়ার ব্রিগেড আসিয়া অগ্নি আয়ত্তের মধ্যে আনেন এবং প্রায় ৩ ঘণ্টার চেষ্টার পর উক্ত অগ্নি নির্বাপিত করিতে সমর্থ হন। পরদিন রবিবার পুনরায় আমাদের গুদাম সংলগ্ন এক পান মৌরীর গুদাম হইতে ধূম কুণ্ডলী ও অগ্নিশিখা নির্গত হইতে দেখা যায়। টেলিফোন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হওয়ায় আর ফায়ার ব্রিগেডকে সংবাদ দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। অবশেষে অপরাহ্ণ বেলায় একদল কর্মী শাবল (shovel) ও বালতি নিয়া অগ্রসর হইয়া খুব নিকট হইতে পান মৌরীর গুদামে জল বর্ষণ করিতে থাকে এবং জলের অভাব না হওয়া পর্যন্ত উহারা সর্বপ্রকারে অগ্নি নির্বাপিত করিবার যথাশক্তি চেষ্টা করে।

এদিকে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ আমাদের মেস বাড়ীতে যুগপৎ অগ্নি সংযোগ ও আক্রমণ করা হয়। কিন্তু তখন অগ্নি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল এবং উন্মত্ত জনতার আক্রমণ ও চীৎকারে অবস্থা এরূপ ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, আমাদের আফিস হইতে সেখানে (দূরত্ব যদিও অতি সামান্য) কোনও সাহায্য প্রদান করাই সম্ভবপর ছিল না। ভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত মেস বাড়ীটি রক্ষা পায়।

ইতিমধ্যে সান্ধ্য আইন ও ১৪৪ ধারা জারী এবং সামরিক বাহিনীর কর্মতৎপরতায় সহরের অবস্থা অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আসে। দীর্ঘ তিনদিন অবরুদ্ধাবস্থায় থাকিয়া অতি আয়াসে ২ পৃষ্ঠা করিয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রকাশিত হয় এবং অতি সাবধানতার সহিত উক্ত দিবসত্রয়ের কাগজ হকারগণের নিকট প্রদান করা হয়। অতঃপর গত সোমবার হইতে অবস্থা কতকটা শান্তভাব ধারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মিগণ অধিক সংখ্যায় কার্যে যোগ দিতে থাকেন। তাহার ফলে এই কয়দিন যাবৎ কাগজের পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইতেছে।

অগ্নিতে আমাদের বহু মূল্যবান কাগজ বিনষ্ট হওয়ায় আমাদিগকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। দাঙ্গাকারী জনতার ইষ্টক বর্ষণে আমাদের অন্যূন ২৫ জন কর্মী আহত হইয়াছেন। তবে কাহারও আঘাত বিশেষ গুরুতর নহে। সকলকেই প্রাথমিক সাহায্য ও চিকিৎসা করা হইয়াছে। বর্তমানে নিয়মিত আফিস খোলা হইতেছে এবং আফিসের কার্যাদি চলিতেছে।"

উত্তরকালে কৃষ্ণকুমার দাস বলেছে: "দাঙ্গার সময় বর্মণ স্ট্রীটের বাড়ীতে ভয়ে ভয়ে থাকতাম। ঐ সময় মুসলমানরা তিনবার অফিস আক্রমণ করেছিল। আমি নিজে আহত হয়েছিলাম ওদের ছররা গুলিতে। আমরাও ইটপাটকেল নিয়ে রুখে দাঁড়াতে তবে ওরা সরে গিয়েছিল। রাত্রে যাঁরা থাকত তাঁদের জন্যে অফিসে রান্না হত। রান্নার জন্য ঠাকুর রাখা হয়েছিল। প্রথম দিকে হাটবাজার করা যেত না। তখন কাগজের ঠোঙ্গায় একমুঠো করে ভাত খেয়েছি। সঙ্গে নুনও জোটেনি। এইরকম দু'দিন চলেছিল।"[২]

১৯৪৬ সালের ৮ ডিসেম্বরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় মালদহ জেলার চাপাই নবাবগঞ্জের কোন ধর্মস্থান অপবিত্রকরণের একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেই সূত্রে মামলা দায়ের হল। চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯৪৭ সালের ৩১ মার্চ, রায় দিয়েছেন—সম্পাদকের ২০০, টাকা দণ্ড অন্যথায় দু-মাস সশ্রম কারাদণ্ড; মুদ্রাকর ও প্রকাশকের ৫০, টাকা দণ্ড অন্যথায় দু-সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ড।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৪৭ সালের ৭ মার্চ, ষড়বিংশবর্ষে পদার্পণ করে লিখেছে: "বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের নির্দিষ্ট মেয়াদকাল ঘোষণার পরে আজ ভারতে এক নূতন দায়িত্ব ও সমস্যা দেখা দিয়াছে। আশা ও আশংকা জাতির চিত্তে একইকালে উদিত হইতেছে। ঘোষণার অস্পষ্টতা ভেদ করিয়া ইহার তাৎপর্য আয়ত্ত করিতে হইবে এবং অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পথ সুগম করিবার জন্যই জাতিকে সচেতন সতর্কতার সহিত কর্তব্য পালন করিতে হইবে। আনন্দবাজার সমগ্র জাতির সঙ্গে সেই কর্তব্য পালন

করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইবে না।"

ভারতবর্ষের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট চিরস্মরণীয়। সেদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন হল, ভারতবর্ষে প্রায় দুশো বছরের বিদেশীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান হল। পরম আনন্দের কথা। কিন্তু বেদনাও কি নেই? 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, লিখেছে: "যে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা জাতির কল্পনায়, জাতির স্বপ্নে, জাতির জাগ্রত চেতনায় প্রেরণা দান করিয়াছিল, তাহা আজ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে ভেদ-বিদ্বেষের বিষাক্ত ছুরিকাঘাতে দ্বিধাখণ্ডিত। এই খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন ভারতের রক্তক্ষরা বেদনা ভুলিবার নহে। ১৫ই আগস্ট অখণ্ড ভারতের অখণ্ড সত্তার যে গতিমুক্তির পথ-নির্দেশ, আজ হইতে আরম্ভ হোক তাহারই তপশ্চারণ। জয় হিন্দ।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র জন্মের মুহূর্তে তার সর্বসত্তা আচ্ছন্ন করে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, স্বাধীনতার দিনেও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' মহাত্মা গান্ধীকে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন না করে থাকতে পারেনি:

"স্বাধীনতার উৎসব অনুষ্ঠানের পরম আনন্দময় শুভদিনে আমাদের পক্ষে সমধিক আনন্দ ও গৌরবের বিষয়, মহাত্মাজী স্বয়ং আজ আমাদের মধ্যে। এই নবলব্ধ স্বাধীনতার যিনি অগ্রদূত, যাঁহার সাধনা ও তপঃপ্রভাব জাতিকে নূতন করিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়াছে, সেই পথে পরিচালিত করিয়াছে এবং বহুবিঘ্নসংকুল পথ অতিক্রম করিয়া জাতিকে লক্ষ্যস্থলে লইয়া আসিয়াছে, আজিকার শুভ প্রভাতে সর্বাগ্রে তাঁহার প্রতিই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিব। স্বাধীনতার আলোকবর্তিকা তুলিয়া ধরিয়া তিনি আমাদের তমসাচ্ছন্ন চিত্তলোক উদ্ভাসিত করিয়াছেন; কৃতজ্ঞ জাতি তাঁহাকে পিতৃ-সম্বোধনের সসম্ভ্রম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। জাতির পিতৃস্থানীয় এই মহাপুরুষের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াই নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের সীমার অপরাপর হইতে মুক্তি-অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন; আর আজ নবলব্ধ স্বাধীনতার উৎসব অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে রাষ্ট্রনায়ক জওহরলাল সর্বাগ্রে জাতির পিতার নিকটেই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। আমরা অনেক সময় তাঁহাকে যথাযথ অনুসরণ করিতে পারি নাই, অযোগ্য অনুগামিরূপে গণ্য হইয়াছি। তথাপি অসাধারণ আত্মবিশ্বাস এবং অনন্যসাধারণ ক্ষমা ও নিরভিমানিতায় তিনি আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। স্বাধীনতার উৎসবের শুভ-মুহূর্তে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কৃতজ্ঞতা নিবেদনের সুযোগ পাইলাম ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য।

স্বাধীনতার উৎসবের দিনে আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি, কিন্তু উৎসবের ক্ষেত্রে তিনি নাই। শান্তি ও ঐক্যের সাধক পুনরায় আর এক কঠোর তপশ্চর্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতাপ্রসূত ভেদবুদ্ধির সংঘর্ষে উন্মথিত হইয়া যে হলাহল উঠিয়াছে, তাহা পান করিতে হইবে। এই হলাহলের সংহারক্রিয়া যদি প্রতিরুদ্ধ না হয় তাহা হইলে মুক্তি ব্যর্থ হইবে, স্বাধীনতা ব্যর্থ হইবে, ধর্ম ব্যর্থ হইবে, সমাজ ব্যর্থ হইবে, সভ্যতা ব্যর্থ হইবে। ভারতবর্ষের মধ্যে এবং জগতের মধ্যে একটি মাত্র ব্যক্তিই আছেন যিনি মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তিতে এই হলাহল কণ্ঠে ধারণ করিতে পারেন। সমগ্র জগৎ স্তব্ধদৃষ্টিতে গান্ধীজীর এই নূতন সাধনার দিকে চাহিয়া আছে।

পাকিস্থান নামে বাঙলার যে অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহাকেই এই নূতন সাধনার ক্ষেত্র করিবার জন্য গান্ধীজীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। সদ্য সদ্য তাহা না হইলেও প্রাথমিক আয়োজনস্বরূপে অশান্তি-বিব্রত রাজধানীর এক কোণে শান্তি ও ঐক্যের মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালাইয়া তিনি সাধনায় বসিয়াছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে ও স্থিরভাবেই বুঝিয়াছেন যে, শান্তি ও ঐক্য ভিন্ন আমরা নবলব্ধ স্বাধীনতার কল্যাণময় প্রসাদ লাভ করিতে পারিব না।

অদ্যকার শুভদিনে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, লোকোত্তর মহাপুরুষের

এই সাধনা সার্থক হউক, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য ভুলিয়া সকলে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করুক তাঁহার আশীর্বাদ ও কল্যাণকামনা। লোকোত্তর ব্যক্তিদের কর্মনীতি সময়ে সময়ে দুর্জ্ঞেয় এবং আপাতদৃষ্টিতে দুর্বোধ্য পথ ধরিয়া অগ্রসর হয়। ক্লেশ, ক্ষয় ও ক্ষতি যতই আমরা ভোগ করিয়া থাকি সাময়িক ঘটনায় অভিভূত হইয়া জাতির এই পরমকল্যাণসাধকের ব্রতে কেহ যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই যেন তাঁহার এই দুশ্চর পথযাত্রায় সহায় হইতে পারে।"

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুআরি মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন। দুঃসংবাদ দ্রুত চলে এল।

দু-তিনজন সাংবাদিককে সুরেশচন্দ্র ডেকে পাঠালেন। তাঁরা এলেন। কিন্তু সুরেশচন্দ্রের মুখে কোনো কথা নেই। টেবিলের উপর একটা সম্মুখ বাহু আরেকটা সম্মুখ বাহুর উপর ন্যস্ত করে, তার উপর কপাল ঠেকিয়ে তিনি নিস্পন্দ নিঃশব্দ অবস্থায় পড়ে আছেন।·ঘণ্টাখানেক পরে তিনি মাথা তুলে বললেন—কাল কাগজে কোনো সংবাদ, কোনো বিজ্ঞাপন কিছুই থাকবে না; থাকবে কেবল এই সর্বনাশা খবর এবং তাঁর নানা ধরণের ছবি।[৩]

১৯৪৮ সালের ৩১ জানুআরির 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপন বা অন্য কিছু ছাপা হল না, ছাপান হল শুধু মহাত্মা গান্ধীর কথা ও ছবি। চতুর্থ পৃষ্ঠাটি প্রায় শূন্য, এক কোণায় সম্পাদকীয় রচনা—সাকুল্যে চারটি বাক্য, আঠারো পয়েণ্ট ভারতী টাইপে ছাপা:

"মহাত্মা গান্ধী নিহত হইয়াছেন। দেশের মুক্তিসাধনায় যিনি জীবনধারণ করিয়াছিলেন স্বদেশবাসীর হস্তেই তাঁহার জীবনান্ত ঘটিয়াছে।

প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের প্রাণবধে যে শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিল।

ভগবান আমাদিগকে মার্জনা করুন!"

পরের দিনের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তেও একবিন্দু বিজ্ঞাপন নেই, আদ্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর কথা ও ছবি।

উত্তরকালে হরিপদ মহলানবীশ বলেছেন: "অনেকদিন পরে মাউণ্টব্যাটেন বিলাতে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "সেদিন গান্ধীজীর প্রতি সব চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা দেখিয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড।" মহাত্মাজীর হত্যাকাণ্ডের পরদিন কোটি কোটি ভারতবাসী যা বলেছিল, ম্যাউণ্টব্যাটেনের উক্তি তারই প্রতিধ্বনি মাত্র।"[৪]

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৪৮ সালের ২৫ মার্চ, সপ্তবিংশবর্ষে পদার্পণ করে লিখেছে: "পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিকামনায় আত্মপ্রকাশ করিয়া "আনন্দবাজার পত্রিকা" দেশসেবার যে ব্রত নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া আসিয়াছে, আজ পরিবর্তিত অবস্থায় আমরা সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়াই চলিব। স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে বটে, কিন্তু বিশ্রামের সময় আসে নাই, প্রযত্ন শিথিল করিবার অবসর আমাদের নাই। এই নবলব্ধ স্বাধীনতাকে রূপ দিবার জন্য একনিষ্ঠ সাধনা ও তপস্যার আয়োজন। নূতন জাতি গঠন ও নূতন রাষ্ট্র গঠনের সেই তপস্যায় নিযুক্ত হইবার জন্য দেশের যুবক ও কর্মীদিগের প্রতি, দেশের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইয়া আমরা নববর্ষের কর্মপথে অগ্রসর হইলাম।"

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার একদিন সুরেশচন্দ্রকে বললেন—বৃটিশের আমলে সরকারের কাজের তীব্র সমালোচনা আনন্দবাজার করত। অথচ আজকাল আনন্দবাজার সরকারের অন্ধ সমর্থক কেন?

সুরেশচন্দ্র স্বভাবসুলভ হাসি হাসলেন। বললেন—দেখুন, আমি কংগ্রেস করি বলে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসকে সমর্থন করি কিন্তু আনন্দবাজার করে না। নতুন সরকার, সবে কাজে হাত দিচ্ছে, প্রথমেই বিরূপ সমালোচনা বা আক্রমণ করলে ডিমরালাইজড হয়ে যাবে। সরকারের পক্ষে তা যেমন ক্ষতিকারক হবে, তার চেয়েও বেশি ক্ষতি হবে দেশের:

সুরেশচন্দ্র একটু থামলেন। তারপর দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন—এটা নিশ্চিত জানবেন, একটু হাটতে শিখলেই আনন্দবাজার কঠোর মনোভাবের সঙ্গে সরকারের কাজের পর্যালোচনা করবে। কারণ আনন্দবাজার জনসাধারণের পত্রিকা, কোনো বিশেষ দলীয় মুখপাত্র বা ক্ষমতাসীন সরকারের প্রবক্তা নয়।[৫]

কলকাতা ট্রাম কোম্পানি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে, ১৯৫৩ সালের ১ জুলাই থেকে ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের এক পয়সা বেশি ভাড়া দিতে হবে।

ট্রাম কোম্পানি গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সে সময়ে ট্রাম কোম্পানি কিম্বা গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করেনি, ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ করেছে: "জনসাধারণের আর্থিক সংস্থান, বিশেষ করিয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়সম্পন্ন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের আর্থিক সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করিয়া ভাড়া বৃদ্ধি করা যে সঙ্গত নহে—ইহাই আমরা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি।"

এবং যাত্রীরা বাড়তি ভাড়া দিতে রাজি নয়। চতুর্দিকে তীব্র বিক্ষোভ। ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন চলতে লাগল।

অবস্থা ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠেছে। ১৯৫৩ সালের ৩ জুলাই; কলকাতা ও হাওড়ায় ন'জন নেতাসহ সাতশতাধিক মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছেন, বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রামে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা, পটকা ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেছে, ট্রাম চলাচল কার্যত বন্ধ।

ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে, ১৯৫৩ সালের ৪ জুলাই, কলকাতা ও সহরতলীতে পূর্ণ হরতাল পালিত হল।

ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে কলকাতার জীবনযাত্রায় দারুণ বিপর্যয় দেখা দিল—সবিস্তার ইতিহাস এখানে আপাতত অনাবশ্যক। প্রতিরোধ আন্দোলন দমনে সে সময়ে পুলিশী জুলুমের তীব্র নিন্দা বহু কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি, ১৯৫৩ সালের ১৫ জুলাই, হরতালের আহ্বান জানিয়েছে। কংগ্রেস হরতালের বিরোধী; কয়েকটি কংগ্রেসী কুযুক্তি ও কুপরামর্শের হুবহু প্রতিধ্বনি করে গভর্ণমেণ্ট ব্যক্ত করেছে: বর্তমান আন্দোলনের পেছনে জনসমর্থন নেই। জনসাধারণ সরকারী নির্দেশ নতশিরে মেনে নিয়ে বাড়তি হার ভাড়া গুণে ট্রামে যাতায়াত করার জন্য এবং হরতাল পণ্ড করার জন্য ব্যাকুল।

১৯৫৩ সালের ১৫ জুলাই হরতাল সফল হল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৫৩ সালের ১৬ জুলাই, সম্পাদকীয় স্তম্ভে হরতালের দিনের কলকাতা ও সহরতলীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবন্ত মন্তব্য বিবরণ দাখিল করেছে এবং কংগ্রেসী নেতৃত্বের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়নি: "প্রভাতে রুদ্ধদ্বার বিপণি ও জনশূন্য যানবাহনহীন রাজপথে পুলিশ বাহিনী সুরক্ষিত যাত্রিহীন ট্রাম ও সরকারী বাস ধাবিত হইল। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী জনতা ফুটপাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পুলিশ বুঝিয়া লইল, ইহারা যাত্রী নহে, দর্শক। অতএব সঞ্চালিত যষ্ঠি নির্দেশে হুকুম আসিল, হট যাও। এক পক্ষ হুকুম করিবে, অপরপক্ষ তামিল করিবে এ পোড়া দেশে আজ পর্যন্ত পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে প্রভু ও দাসের এই অলিখিত সম্পর্ক। তাহার উপর হরতালের আশ্চর্য সাফল্যে ততক্ষণে মাথাগুলি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। জনতাকে

পশুপাল বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত পুলিশ লাঠি তুলিয়া তাড়া করিতে লাগিল। যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহার চুল ধরিয়া গলা ধাক্কা দিতে দিতে কয়েদী গাড়ীতে তুলিতে লাগিল। বাহুবলের এই কুৎসিত অপপ্রয়োগ দেখিয়া শত শত তরুণের রক্ত শীতল থাকিবার কথা নয়, জনতার ধিক্কার ফাটিয়া পড়িল। সহরের নানা অঞ্চলে পুলিশের বলপ্রয়োগের প্ররোচনায় লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইল। যাদবপুরে কাঁদুনে গ্যাসের সহিত বুলেট চলিল।... আরো একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। পূর্বদিন যে অতুল্যবাবু, কলিকাতার জনসাধারণের উপর অসামান্য প্রভাবশালী কংগ্রেস-নায়ক অতুল্যবাবু, হরতালের অশান্তি উপদ্রব হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার স্পর্ধাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাঁহার অহিংস সংকীর্তনের দলকে সহরের আনাচে কানাচে কোথাও দেখা গেল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেতা এবং মন্ত্রীদের পরামর্শ-দাতা বলিয়া কথিত অতুল্যবাবু দিব্য নিশ্চিন্তে গা ঢাকা দিয়া রহিলেন। জননায়ক হইতে গেলে, জনতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। সে সাহস, সে মর্যাদাবোধ যাঁহাদের নাই, যাঁহারা চালাকী ও অপভাষণে অযোগ্যতা ও দুর্বলতা ঢাকিয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহাদের কবলিত জাতীয় কংগ্রেসের মর্যাদা যে ধূলায় লুটাইবে, ইহা পরিতাপের বিষয় হইলেও বিস্ময়ের নহে।"

১৯৫৩ সালের ১৬ জুলাই কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ গুলিবর্ষণ করেছে. ট্রাম ও সরকারী বাস চলেনি, কলকাতার রাস্তায় সৈন্যদল টহল দিয়েছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৫৩ সালের ১৭ জুলাই লিখেছে: "লালদীঘির দপ্তরখানা হইতে সুসমাচার বিতরিত হইল, "গত ১৫ই জুলাই বামপন্থী দল যে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ, এইদিন অধিকাংশ বাজার, দোকান, শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আপিস ও ডকে স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম চলে।... শতকরা ৯০ ভাগ চটকলে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলে। হাওড়া ও খিদিরপুর অঞ্চলে অধিকাংশ কারখানাগুলিতে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলে। সহরতলীর ট্রেনগুলির চলাচল অনিয়মিত হওয়ায় সরকারী আপিসগুলিতে উপস্থিতির সংখ্যা হ্রাস পায়, কিন্তু গড়ে শতকরা ৫০ ভাগ লোক কাজ করে। কোন কোন আপিসে উপস্থিতির হার শতকরা ৭০ হইতে ৮০ ভাগ ছিল।" এই নির্ভেজাল সত্য সংবাদের সহিত জনতার নষ্টামির সুদীর্ঘ তালিকা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। একজন রসিক লোক বলিতেন, সদা সত্য কথা বলিবে, কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিবে। ইঁহার শিষ্যসেবকগণ যে সরকারী প্রচার বিভাগ জুড়িয়া বসিয়াছেন, ঘন ঘন প্রচারিত সরকারী বিবৃতিগুলি পাঠ করিয়া তাহার রসিকতা উপভোগ করিতেছি। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বিলাত যাইবার সময় রাজ্যভার দুইজন সহকারীর উপর দিয়া গিয়াছেন। শ্রীপ্রফুল্ল সেন ও শ্রীকালীপদ মুখার্জি যদিও লজ্জার মাথা খাইয়া খিড়কীর দ্বার দিয়া পুনরায় মন্ত্রিমণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছেন, তবুও তাঁহারা গান্ধীভক্ত এবং কংগ্রেস সেবক। ইঁহাদের সম্মতিতে প্রকাশিত বিবৃতি পাঠ করিয়া সেকালের বৃটিশ সিভিলিয়ান-দের রাঙগামুখও লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিত। আমাদের দেশে একটা চলতি কথা আছে, ঘরের বিড়াল বনে গিয়া বন-বিড়াল হয়। নিতান্ত নিরীহ যে বিড়াল দুটি কংগ্রেসের আনাচে কানাচে মিউ মিউ করিয়া ক্ষুধার আবেদন জানাইত, দপ্তরখানার গহন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারাই আজ মন্ত্রিত্বের ল্যাজ ফুলাইয়া মাথা তুলিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া দাঁত দেখাইতেছে। এই প্রহসনের এইখানেই শেষ নয়। মহাবীর অতুল্য ঘোষ ওয়েলিংটন স্কোয়ারের রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। বুধবার তাঁহার অহিংস কংগ্রেসী চমুর টিকিটিও দেখা গেল না। তথাপি কংগ্রেস একেবারে বীরশূন্য হয় নাই। অবগুণ্ঠনবতী কংগ্রেসের অন্তঃপুর হইতে বীরশ্রেষ্ঠ বিজয় সিংহ নাহার, কংগ্রেসী মহলের তকমাহীন সচিব নাহারজী, এক বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন, "১৫ জুলাইটা শান্তিপূর্ণ না হইলেও ভালভাবেই কাটিয়াছে, যাহা কিছু

ঘটিয়াছে এই ৬০ লাখ লোকের সহরে তাহা এমন কিছু নয়। যাঁহারা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন, (পুলিশ না ভাড়াটিয়া দালাল?) তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি, অভিনন্দন জানাইতেছি সেই বীর ট্রাম ও বাসকর্মীদের যাঁহারা যানবাহন চালু রাখিয়াছিলেন। সকৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ দেই সেই সব ধীরমস্তিষ্ক সাহসী নাগরিকদের যাঁহারা গুণ্ডামির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন।"

সরকারী ও বেসরকারী কংগ্রেসের দুই অংশই মিথ্যার মলিন পাংশু নিক্ষেপে দেশবাসীর চক্ষে ধূলি দিতে চাহে। ভীরুর অপরাধী বিবেক আতঙ্কে নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। জাতীয় কংগ্রেসের শ্মশানযাত্রায় এই শববাহী দলের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ১৪৪ ধারার নিস্তব্ধ অন্ধকার কি করুণ, কি বীভৎস। সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহারা অন্ধকার পিচ্ছল পথে অপঘাতের গহ্বর লক্ষ্য করিয়া মরণ অভিসারে চলিয়াছে। সমগ্রভাবে কংগ্রেস পক্ষাঘাতে পঙ্গুর মত স্তব্ধ হইয়া কি এই দৃশ্য দেখিবে? পৌরুষ ও ন্যায়বুদ্ধি কি দেউলিয়া হইয়া গেল? বামপন্থীদের শিরে অভিশাপ বর্ষণ করিয়া এবং দেশের জাগ্রত যুবশক্তিকে গুণ্ডা ও দুষ্কৃতকারী বলিয়া অপবাদ দিয়া কি তোমরা মানবতার বিচারশালায় নিরপরাধ প্রমাণিত হইবে?"

১৯৫৩ সালের ১৭ জুলাই কলকাতার অবস্থার আরো অবনতি হল—স্থানে স্থানে রাস্তার আলো নির্বাপিত, জনতা ও পুলিশে খণ্ডযুদ্ধ, বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ।

শেষপর্যন্ত গবর্ণমেণ্ট নতি স্বীকার করেছে। গবর্ণমেণ্ট ট্রাম কোম্পানিকে জানিয়েছে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়ার বৃদ্ধির প্রশ্নটি একটি নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনালের হাতে দেওয়া হবে এবং সেই ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কোম্পানী যেন বর্দ্ধিত হারে ভাড়া আদায় স্থগিত রাখে।

প্রতিরোধ আন্দোলন বন্ধ হয়নি, ১৯৫৩ সালের ১৯ জুলাই ১৪৪ ধারা অমান্য করে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে সভা ও শোভাযাত্রা হল।

২০ জুলাই ১৯৫৩: বিকেলবেলা কালীঘাটে জনসভায় পুলিশ লাঠি চালিয়েছে, ধরপাকড় করেছে। সেদিন সেখানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র একজন কর্তব্যরত রিপোর্টার পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। "পুলিশের এক ডেপুটি কমিশনার ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়াও উক্ত সাংবাদিককে সার্জেণ্ট ও কনেষ্টবলের নির্দয় অত্যাচার হইতে বাঁচাইতে পারেন নাই। তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়াই উক্ত সাংবাদিককে নির্মমভাবে লাঞ্ছনা করা হয়। তাঁহার হাতে ও পিঠের বহুস্থানে কালশিরা পড়িয়া যায় এবং তাঁহার চশমাটি খোয়া যায়।"

এই ঘটনার প্রায় একযুগ পরে—১৯৬৬ সালের ২৪ মার্চ—'আনন্দবাজার পত্রিকা'র আরেকজন কর্তব্যরত রিপোর্টার পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন।

১৯৬৬ সালের ২৪ মার্চ রাত্রি এগারোটা নাগাদ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে খবর এল, কাশীপুর এলাকায় দু-দল পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অন্যতম রিপোর্টার বিধান সিংহ টেলিফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন।

রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ কাশীপুর থানার কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে বিধান সিংহ অফিসের দিকে যেতে না যেতেই একজন পুলিশ অফিসারের কাছে বাধা পেলেন। চোখের পলকে তিনি দেখে নিলেন—থানার গোটা অফিস ঘরটা তছনছ, টেলিফোন আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড, ফাইল কাগজপত্র ইতস্তত ছড়ানো। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন পুলিশ অফিসারের কাছে বিধান সিংহ নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন—এ কী! আপনি এ সময় থানায় এসে পড়েছেন কেন?

বিধান সিংহ বললেন—কোথাও তো কোনো নিষেধ দেখলাম না। আর থানাই তো

নিরাপদ জায়গা।

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, একদল উত্তেজিত সশস্ত্র পুলিশ থানা কম্পাউণ্ডের মধ্যেই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র গাড়িখানা ঘিরে ফেলেছে। ড্রাইভারকে কিল চড় মারা হচ্ছে। একজন পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে তিনি ড্রাইভার ও গাড়িখানাকে মুক্ত করলেন। ড্রাইভার ও গাড়ি মুক্ত হল, কিন্তু ততক্ষণে ওই সশস্ত্র পুলিশের দল বিধান সিংহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দলের কারো কারো মুখে শোনা গেল—বাহারসে রিপোর্ট লেনে আয়া; মারো, মারো।

সঙ্গী পুলিশ অফিসারটি বিধান সিংহকে নিয়ে থানার বাইরে এসে বি-টি রোডে পড়লেন। কিন্তু ততক্ষণে সশস্ত্র পুলিশের ওই দলটিও পিছন থেকে এসে পড়েছে। তারা সমানে বিধান সিংহকে মারতে লাগল—কিল, চড়, ঘুঁষি—নাকে, মুখে, চোখে, বুকে, পাঁজরায়। তিনি বি-টি রোড পার হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু বি-টি রোডের অপর প্রান্তে যেতে না যেতেই ওই খাকি হাফ প্যাণ্ট ও গেঞ্জি গায়ে সশস্ত্র পুলিশের দল চতুর্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলল। তাদের হাতে ইট আর পাথর। একজন মাত্র দশ হাত দূর থেকে প্রচণ্ড বেগে ইট ছুঁড়ে মাথায় মারল। মাথা ফেটে রক্ত—মুখ, চোখ, গলা বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল।

হঠাৎ ঘটনাস্থলে একটি বেতারভ্যান এসে উপস্থিত। একজন পুলিশ অফিসার তাড়াতাড়ি বিধান সিংহকে ভ্যানে তুলে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ভ্যানের উপর দমাদম ইট পড়তে লাগল, ইটের ঘায়ে ভ্যানের একজন পুলিশকর্মীও আহত হলেন, কোনোরকমে ভ্যানটি স্টার্ট নিল, তারপর একটানে আর-জি-কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

গভীর দুঃখের সঙ্গে স্মরণীয়, ব্রিটিশ আমলেও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কোনো সাংবাদিক পুলিশের হাতে এভাবে লাঞ্ছিত হয়নি।

১৯৫৪ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নতুন রোটারী কিনেছে। উত্তরকালে যোগেন্দ্রমোহন সেন বলেছেন: "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কাগজের টানাটানি পড়ায় পত্রিকার পাতা কমিয়ে দিতে হয়। এবং সেই সময়ই পাঠকদের জন্য 'সংক্ষিপ্ত আনন্দবাজার' নামে আরো একটি কাগজ বার করা হত। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ এই সময়ের মধ্যে আমাদের অবস্থা আস্তে আস্তে আরো বাড়তে থাকে। আমরা প্রথম রোটারী মেশিনের অর্ডার দিই ১৯৩৯ সালে। কিন্তু যুদ্ধের জন্য সে অর্ডার বাতিল হয়ে যায়। ফলে ১৯৫৪ সালে আমরা নতুন রোটারী কিনি।"[৬]

প্রেস কমিশন ১৯৫৪ সালে মন্তব্য করেছে যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কাছে "The distinction of having had over a long period the largest circulation of any individual newspaper in the country."[৭]

প্রেস কমিশন ১৯৫৪ সালে মন্তব্য করেছে:

"The Ananda Bazar Patrika is known for its extensive coverage of news and enjoys to-day the largest circulation for any daily newspaper in any language published from one location."[৮]

১৯৫৪ সালের ১২ আগস্ট সুরেশচন্দ্র মজুমদার ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৫৪ সালের ১৪ আগস্ট বিজ্ঞাপিত করেছে: "স্বর্গত শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে আগামী সোমবার (১৬ই আগস্ট) আনন্দবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ের সকল বিভাগের কার্য বন্ধ থাকিবে। সুতরাং মঙ্গলবার (১৭ই আগস্ট) আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশিত

হইবে না।"

পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন থেকে আমৃত্যু সুরেশচন্দ্র নানাভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত থেকে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। অসামান্য প্রভাব সত্ত্বেও তিনি কখনো কর্পোরেশন কি আইন-সভায় কোনো পদের জন্য প্রার্থী হননি। ১৯১৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি উত্তর কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি, নির্বাচন বোর্ড, কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েসন, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সংগঠনী কাজে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

'রবীন্দ্র-ভারতী'র সঙ্গেও সুরেশচন্দ্রের নাম অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত হয়ে আছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৮ সালের ১২ অগস্ট, বলেছেন: "রবীন্দ্র-ভারতী স্থাপনার মূলেও সুরেশবাবুর দান অনস্বীকার্য। রবীন্দ্র-ভবনের একাংশ অবাঙালীর কাছে বিক্রী হয়েছিল এবং ওর কিয়দংশ ভাঙাও হয়েছিল। সুরেশবাবু তা শুনতে পেয়ে অত্যন্ত বেদনাবোধ করেন এবং সরকারী হস্তক্ষেপের সাহায্যে ঐ প্রচেষ্টা রোধ করেন। তিনি ঐ সময় সচেতন না হলে আজ রবীন্দ্র-ভবনের কাছে হয়তো একটা গুদাম স্থাপিত হত।"

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ১৯৬১ সালের ১২ অগস্ট, বলেছেন: "প্রধানত সুরেশচন্দ্রের চেষ্টার ফলেই বর্তমানে "রবীন্দ্রভারতী" প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। এর গোড়াপত্তন তিনিই করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রস্মৃতিরক্ষাকল্পে সুরেশচন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টা করে প্রায় চোদ্দলক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন।

উত্তরকালে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছেন: "সুরেশচন্দ্র অবিবাহিত ছিলেন। কিন্তু পারিবারিক জীবনের স্নেহমমতার মধ্যেই তিনি বর্ধিত হইয়াছেন। সরলাবালা তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিবার পর, তাঁহার পিতা কিশোরীলাল সরকার এবং ভ্রাতা ডাঃ সরসীলাল সরকারও তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ইঁহাদের গৃহেই তাঁহার প্রথম কর্মজীবন অতিবাহিত হইয়াছে। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশ হইবার পর প্রফুল্লকুমার শ্বশ্রূমাতা, সহধর্মিনী ও পুত্রকন্যাদের লইয়া স্বতন্ত্র বাসা করিলে সুরেশ-চন্দ্র পরবর্তী জীবনে এইখানেই আমৃত্যু বাস করিয়াছেন। প্রফুল্লকুমারের পুত্রকন্যাগণ মাতুল সুরেশচন্দ্রকে জননীর সহোদর ভ্রাতার মতই শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীমান অশোককুমার তাঁহার সর্মাধিক প্রিয় ছিল। তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে মাতুল সুরেশচন্দ্র অশোককুমারকে পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে শিক্ষাদান করিয়াছেন। এবং পত্রিকা পরিচালনার ভার তাঁহার অনুরক্ত ভাগিনেয় অশোককুমারের স্কন্ধেই অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।"[১]

অশোককুমার সরকারের জন্ম ১৯১২ সালে। ছেলেবেলা থেকেই চতুর্দিকে সংবাদপত্র দেখেছেন আর রাজনীতির আলোচনা শুনেছেন। স্কুলে পড়ার সময়েই রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়ে গেছে। কলেজে ঢুকে অশোককুমার অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের উত্তর কলকাতা শাখার সক্রিয় সদস্য হয়েছেন।

দেশে যখন আইন অমান্য আন্দোলন চলছে, অশোককুমার তখন কলেজের ছাত্র। আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, শাস্তি পেয়েছেন ছ-মাসের কারাবাস। তখন থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত তিনি রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকেছেন।

১৯২৮ সালে অশোককুমার কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের সময় সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর-এর সদস্য হয়েছেন। ১৯৩৬ সালে কিছুকাল মানবেন্দ্রনাথ রায় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের বাড়িতে থাকতেন, খেতেন প্রফুল্লকুমার সরকারের বাড়িতে; সেই সময়ে অশোককুমার মানবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছেন। অশোককুমার ভাগ্যবান, মহাত্মা গান্ধী-সহ দেশের বরেণ্য নেতাদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ তিনি পেয়েছেন।

আগেও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অফিসে যাতায়াত ছিল, অশোককুমার সক্রিয়-

ভাবে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যোগ দিয়েছেন ১৯৪২ সালে। ইতিমধ্যে তিনি চাটার্ড অ্যাকাউণ্ট্যান্সি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রথম দিকে অশোককুমার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ম্যানেজমেণ্ট, অ্যাকাউণ্টস, বিজ্ঞাপন, প্রচার ইত্যাদি বিভাগের দেখাশোনা করেছেন; ১৯৪৪ সালে ডিরেক্টর হয়েছেন।[১০]

১৯৫৪ সালের ১৬ অক্টোবর সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৫৪ সালের ১৭ অক্টোবর, লিখেছে:

"বাঙলায় সংবাদপত্রজগতে সত্যেন্দ্রনাথের স্থান আর পূরণ হইবে না। সত্যেন্দ্রনাথের বিয়োগে সংবাদপত্রজগৎ কি হারাইল, কতটা হারাইল, তাহার পরিমাপ করিবে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ।...

বস্তুতঃ সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন অনন্যসাধারণ তীক্ষ্ণধী শক্তিমান লেখক। সংবাদপত্রজগতে এইরূপ সব্যসাচীসদৃশ শক্তিমান লেখক আর কেহ আছেন বলিয়া আমরা জানি না। যে কোন বিষয় লইয়াই তিনি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য যে কোন বিষয় লইয়াই তিনি অনবদ্য বলিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙলার সংবাদপত্র সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে তাহার তুলনা নাই। বাঙলার সংবাদপত্রজগৎ এই অসীম শক্তিমান লেখকের নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিবে।...

জাতির অসার দেহে প্রাণস্পন্দন আনিয়া দিবার জন্য তাঁহার অগ্নিবর্ষী লেখনী শুধু আগুনের হলকাই ছড়ায় নাই, সংবাদপত্রের মধ্যে অপূর্ব রসসাহিত্য সৃষ্টিতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মিথ্যা, ভণ্ডামি ও অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার শ্লেষাত্মক সার্থক রচনা বিস্মৃত হইবার নহে।...

উদারহৃদয় সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে কোন সংকীর্ণতার গ্লানির ছোঁয়াচ ছিল না, তাঁহার হৃদয় ছিল ভালবাসাময়, প্রেমপূর্ণ। সত্যেন্দ্রনাথ সহজেই মানুষকে আপন করিয়া লইতে পারিতেন। মজলিসী আলাপ-আলোচনায় সত্যেন্দ্রনাথের সমকক্ষ লোক এ-যুগে কমই দেখিয়াছি। সংবাদপত্র সাহিত্যের সেবা করিতেই তিনি ভালবাসিতেন—সমগ্র জীবন ইহারই সাধনা তিনি করিয়াছেন। এই সাধনার যাহা সিদ্ধি তিনি লাভ করিয়াছিলেন। জাতির ও মানুষের সেবার যে পরম আকুতি তাঁহার মধ্যে ছিল, সংবাদপত্রের মাধ্যমে সেই সেবাব্রতই তিনি উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

অকৃতদার সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত-অনুরাগীর অভাব নাই। আমরা জানি, আমাদের মত তাঁহারা সকলেই সত্যেন্দ্রনাথের পরলোকগমনের সংবাদে মর্মাহত হইয়াছেন। আনন্দবাজারের সত্যেন্দ্রনাথের অভাবজনিত শোকে এই প্রতিষ্ঠানের সকলেই আমরা মুহ্যমান। আমরা দেশবাসীর সহিত একাত্ম হইয়া সত্যেন্দ্রনাথের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি। সত্যেন্দ্রনাথ সংবাদপত্রজগতে যে কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, মৃত্যুর সাধ্য নাই তাহা ম্লান করিতে পারে।"

১৯৫৫ সালের ১৮ জুন সায়াহ্নে কলকাতার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ৬নং সুতারকিন স্ট্রীটের নবনির্মিত অফিস ভবনের উদ্বোধন হল। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নবগৃহের উদ্বোধন করলেন। নব ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বানী প্রেরণ করেছেন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশোককুমার সরকার প্রারম্ভে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য অভ্যাগতদের সাদর সম্বর্ধনা জানালেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর ভাষণে বললেন যে তিনি এখানে বক্তৃতা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেননি। বললেন—সুরেশবাবুর মুখ ভেবে, তাঁর স্মৃতি মনে করে আমি এখানে না এসে থাকতে পারিনি।

অশোককুমার সরকার তাঁর ভাষণে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও সমবেত অতিথিবৃন্দের উদ্দেশে বললেন—আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও সাপ্তাহিক দেশের নবগৃহ প্রতিষ্ঠার উৎসবে আপনাদের শুভাগমনে আমরা অনুগৃহীত হয়েছি এবং এই উপলক্ষে আপনাদের অভ্যর্থনা করার সুযোগ লাভে নিজেদের পরম ভাগ্যবান মনে করি। আমাদের স্বর্গগত পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার জীবিত থাকলে আজ এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁরাই আপনাদের অভ্যর্থনা জানাতেন। তাঁদের অবর্তমানে সেই কর্তব্যপালনের দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। আমরা তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি। তাঁদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান এই নবগৃহে প্রতিষ্ঠিত হল, এ যে তাঁরা দেখে যেতে পারলেন না সেই বেদনা আমরা আজ গভীরভাবে অনুভব করি।

অনুষ্ঠান শেষে চপলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের যক্ষ্মা সাহায্য ভাণ্ডারে ১০০১৲ টাকার একটি তোড়া দিলেন।

১৯ জুন, ১৯৫৫ সাল। সেদিন ৬নং সুতারকিন স্ট্রীটস্থ 'আনন্দ প্রেস' থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে।

উত্তরকালে পাতিরাম পারিজা বললেন: "১৯৫৫ সালে পত্রিকা সুতারকিন স্ট্রীটে এল। আনন্দবাজারের বিক্রীর ভার শুরু থেকে আমার হাতে। প্রথম কয়েক বছরের কথা বাদ দিলে বিক্রীতে আনন্দবাজার সবার আগে। মাঝখানে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত আনন্দবাজার বিক্রী একটু কমে এসেছিল। ১৯৫৫ সালের পর থেকে আবার বাড়তে থাকে—এখনো তার চাহিদা বেড়েই চলেছে। এখন কেবল আমিই বিক্রীর জন্য নিয়ে থাকি দু'লক্ষ কাগজ। রবিবারে আরো বেশি কাগজ নিতে হয়।"[১১]

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ এপ্রিল ১৯৪৪।
২। কৃষ্ণকুমার দাসের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
৩। হরিপদ মহলানবীশের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
৪। তদেব।
৫। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
৬। যোগেন্দ্রমোহন সেনের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
৭। Report of the Press Commission, Part II (Delhi, 1954), p. 140
৮। Report of the Press Commission, Part II (Delhi, 1954), p. 180
৯। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার: সুরেশচন্দ্র মজুমদার (কলকাতা, ১৯৫৪), পৃ ৮-৯।
১০। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ মার্চ ১৯৭২।
১১। পাতিরাম পারিজার সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।

ইতিহাসে আনন্দবাজার

১৯৫৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক হয়েছেন অশোককুমার সরকার। উত্তরকালে তিনি বলেছেন: সম্পাদনার দিকে আসবার কথা আগে ভাবিনি, ম্যানেজমেণ্ট সংক্রান্ত নানা বিভাগেই ছিল আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। মনে তাই দ্বিধা, সঙ্কোচ ছিল। সেটা শেষপর্যন্ত কাটাতে হল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'কে তখন নানাভাবে নতুন চেহারা দেবার কথা ভাবা হচ্ছে। সন্তোষবাবুর* (সন্তোষকুমার ঘোষ) খুব উৎসাহ। আমি রাজি হয়ে গেলাম। ফল কী হয়েছে, সে তো আপনারা জানেন। বলতে পারেন, আমার সৌভাগ্য। ঠিকই। আবার এ-ও ঠিক, আমার পাশে যোগ্য কর্মীরা ছিলেন। আছেন। এইটুকু আমার গর্ব, কাজের মানুষকে চিনে নিতে আমার ভুল হয়নি।"[1]

'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এককালে 'দধিকর্দম' প্রকাশিত হয়েছে, 'দধিকর্দম' বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছোটো ছোটো লেখা।

অশোককুমার সরকার একদিন প্রস্তাব করলেন—দুটো গুরুগম্ভীর সম্পাদকীয়ের পর একটা সরস অথচ বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পাদকীয় থাকা দরকার। তাতে পাঠকেরা যেমন বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাবে, তেমনি গতানুগতিকতার বাইরেও যাওয়া যাবে। এর বিষয়বস্তু যেমন বৈচিত্র্যময় হবে, তেমনি এর লেখার ভঙ্গি ও ভাষাও হবে সেইরকম।

উত্তরকালে সুবোধ ঘোষ বলেছেন: "অশোকবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থার্ড এডিটোরিয়াল বেরোতে লাগল। অনতিবিলম্বেই টের পাওয়া গেল, অশোকবাবুর অনুমান মিথ্যা নয়। পাঠকেরা সাদরে এটিকে গ্রহণ করলেন।"[2]

তৃতীয় সম্পাদকীয় রচনা অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছিল, এ-সত্যে তিলার্ধ সংশয় নেই।

---

* প্রসংগত উল্লেখ্য, দিল্লী থেকে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫১ সালে সন্তোষকুমার ঘোষ সেখানে নিযুক্ত ছিলেন, দিল্লীর সংস্করণটি দীর্ঘজীবী হয়নি, সেখান থেকে সন্তোষকুমার ঘোষ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বার্তা-সম্পাদক হয়ে এসেছেন এবং পরবর্তীকালে সংযুক্ত সম্পাদক হয়েছেন; ইতিপূর্বে কিছুকাল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সংযুক্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন সরোজ আচার্য।

কয়েকটি বাঙালী তরুণের নন্দাঘুণ্টি অভিযাত্রী দলের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নাম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। নন্দাঘুণ্টি অভিযানের ব্যয়ভার বহন করেছে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। ইতিপূর্বে এদেশে আর কোনো সংবাদপত্র এই ধরণের পর্বতশৃঙ্গ অভিযানের ব্যয়ভার বহন করেনি।

অভিযানের প্রাক্কালে, ১৯৬০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংস্থার কার্যালয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে অভিযাত্রীদলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সম্বর্ধনা জানানো হল। দলের নেতা সুকুমার রায় সেদিন বলেছেন—আমাদের এই অভিযানের ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য আমরা বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলাম। এরকম একখানা পত্র আমরা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংস্থার ডিরেক্টর শ্রীঅশোককুমার সরকারকে পাঠিয়েছি। পত্রপাঠ শ্রীসরকার আমাদের ডেকেছেন এবং আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর অভিযাত্রীদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে রাজি হয়েছেন। এজন্য আমরা শ্রীসরকার ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংস্থার কাছে কৃতজ্ঞ।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পক্ষ থেকে এই অভিযাত্রীদলের ব্যয়ভার বহনের কথা উল্লেখ করে প্রবোধকুমার সান্যাল বললেন—১৯২২ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংস্থা জাতীয়তাবাদের যে আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন, তাঁদের এই কাজও সেই ঐতিহ্যেরই একটা প্রকাশরূপে সারা ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এজন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ধন্যবাদার্হ।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' স্টাফ রিপোর্টার গৌরকিশোর ঘোষ ও ফটোগ্রাফার বীরেন্দ্রনাথ সিংহকে সংবাদ প্রেরণ ও চিত্রগ্রহণের জন্য এই অভিযানে সহযাত্রী করে দিয়েছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৬০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, লিখেছে: "গিরিলঙ্ঘনের সর্বকনিষ্ঠ প্রয়াসটিকে আমরা বিশেষ করিয়া অভিনন্দিত করিতেছি এই কারণে যে, অভিযাত্রী দলের সকলেই বয়সে নবীন, পর্বত-পর্যটনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা কাহারও নাই, তবু শুধু সাহস এবং সঙ্কল্পকে সহায় করিয়া কয়েকটি বাঙালী তরুণ একটি দুরূহ-দুরারোহ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে অগ্রসর হইয়া গেলেন। সকলেই বাঙালী, আমাদের আনন্দ এই জন্যও; বিত্ত নহে, নিঃশঙ্ক চিত্তই ইঁহাদের সম্পদ। এই অভিযান জয়যুক্ত করিয়া তুলিতে এই প্রতিষ্ঠান সামান্য সহায়তা যদি করিয়া থাকে তবে কর্তব্যবোধ হইতেই করিয়াছে, এবং দুইজন প্রতিনিধিকে অভিযাত্রিদলের সহযাত্রী করিয়া দিয়াছে, সেও কর্তব্যের প্রেরণায়। ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে এমন উদ্যম সম্ভবত এই প্রথম; কিন্তু সে-জন্য শ্লাঘা প্রকাশ করিতে চাহি না, কেননা গৌরবের দিন ত পড়িয়াই রহিল। আসল উল্লাস-উৎসব সেই দিন, যেদিন তরুণদল সাফল্য অর্জন করিয়া ফিরিয়া আসিবে। সর্বাংশে সফল যদি না-ও হয় তবু কিন্তু গর্ব করিবার কিছু থাকিবে। মহৎ প্রয়াসের পুরস্কার প্রয়াস নিজেই।"

১৯৬০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর রাত্রে অশোককুমার সরকার হাওড়া স্টেশনে আনুষ্ঠানিক ভাবে দলনেতা সুকুমার রায়ের হাতে জাতীয় পতাকা জড়ানো একটি বরফ-গাঁইতি তুলে দিলেন। নন্দাঘুণ্টি অভিযাত্রীদলকে নিয়ে হরিদ্বার এক্সপ্রেস রাত্রি ১০-২০ মিনিটে ছাড়ল। বাঙালী অভিযাত্রীদলের হিমালয় অভিযান এই প্রথম। "অভিযাত্রী দল ২৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পিপুলকোটি পৌঁছেন। ঐখানেই প্রথম দেখা যায় নীল আকাশের গায়ে সাদা আস্তরণের মত নন্দাঘুণ্টি। কিন্তু সে বহুদূরে। সূর্যালোকিত ঐ ধবল পর্বত-শিখরের ইশারায় অভিযাত্রী দল রুক্ষ বন্ধুর পথে চড়াই ভাঙিয়া অগ্রসর হইতে হইতে ৬ই অক্টোবর ঘন্যাকুল হইতে শিবির গুটাইয়া যাত্রা শুরু করেন। দুই দিনের শেষে অভিযাত্রী দল ১২ হাজার ফুট উঁচুতে প্রাথমিক বেশ ক্যাম্প পৌঁছান। এইখানেই তাঁহারা অজানা পথের হদিশ প্রথম পান, তারপর ১৩ হাজার ফুটের অধিক উঁচু এক গিরিপথ দিয়া যাওয়ার সময় ইহার নামকরণ হয় আনন্দবাজার

পত্রিকার নামে "আনন্দ-ধুরা"—অর্থাৎ আনন্দ গিরিপথ। সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ম্যাপে ঐ গিরিপথের উল্লেখ ছিল না। তারপর ১৫ হাজার ফুট উঁচুতে এক নম্বর শিবির স্থাপন করা হয়। পরে তিনটি উচ্চতর শিবিরও স্থাপিত হয়।"

এই অভিযাত্রীদল, ১৯৬০ সালের ২২ অক্টোবর, ২০৭০০ ফুট উঁচু নন্দাঘুণ্টি শৃঙ্গের সর্বোচ্চ শিখর জয় করেছে। অশোককুমার সরকার হাওড়া স্টেশনে দলনেতা সুকুমার রায়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন জাতীয় পতাকা জড়ানো একটি বরফ-গাঁইতি, সেটিএ বাঙালী কীর্তির স্বাক্ষরস্বরূপ নন্দাঘুণ্টি শৃঙ্গের উপরে গেঁথে রাখা হল। সেটি বাঙালী কীর্তির স্বাক্ষরস্বরূপ নন্দাঘুণ্টি চিরাচরিত সহজগম্য দক্ষিণাপথ ছেড়ে উত্তরের এক অজানা পথে প্রথম পাড়ি দিয়ে নতুন একটি পথ আবিষ্কারের গৌরবও অর্জন করেছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৬০ সালের ২৯ অক্টোবর, লিখেছে: "নন্দা ঘুণ্টির চূড়ায় অভিযাত্রীগণ শুধু জাতীয় পতাকাই প্রোথিত করেন নাই, মানুষ যে সবার উপরে, এই সত্যকেও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গর্ব এই জন্য যে, আরও একবার প্রমাণ পাওয়া গেল—বাঙালী শুধু হঠে না, শুধু গণ্ডী-ঘেরা অন্তরালে নিশ্চিন্ত বিলাস করে না, আগাইয়া যাইতেও জানে, এখনও জানে, প্রকাশ্য প্রচ্ছন্ন নানা চক্রান্ত সত্ত্বেও জানে। আর আমাদের—এই পত্রিকার—বিশেষ শ্লাঘা এই জন্য যে, এই উদ্যোগের সঙ্গে আমাদের উৎসাহ এবং যৎসামান্য সহায়তা যুক্ত করিয়া দিতে পারিয়াছিলাম। সন্দিগ্ধ আর হিসাবীরা তখন যাহাই বলুন, ফলই প্রমাণ করিয়া দিল—আমাদের সিদ্ধান্ত ভুল হয় নাই।"

অতঃপর আরো কয়েকটি অভিযানের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নাম অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত হয়ে আছে।

মানা শৃঙ্গ জয়ের জন্য অভিযানের কথায় আসতে হয়। বাঙালী তরুণ পর্বত অভিযাত্রী দলের অভিযান। এই অভিযানের মুখ্য উদ্যোক্তা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক অশোককুমার সরকার। দলের নেতা বিশ্বদেব বিশ্বাস। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন: "দেশবাসীর মধ্যে পর্বতারোহণ সম্পর্কে উৎসাহ আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। অবশ্য এজন্য আনন্দবাজার পত্রিকার কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। এবারে বহু প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা সাহায্য পেয়েছি। আর এর জন্য ধন্যবাদ দিই আনন্দবাজারের সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারকে। এবারও তিনি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।"

অশোককুমার সরকার, ১৯৬১ সালের ১৫ অগস্ট রাত্রে, হাওড়া স্টেশনে বিশ্বদেব বিশ্বাসের হাতে তুলে দিলেন জাতীয়-পতাকাবাহী তুষার-গাঁইতি—২৩,৮৬০ ফুট উঁচু মানার শীর্ষে স্থাপনের জন্য।

এই অভিযাত্রীদলকে নিয়ে দেরাদুন এক্সপ্রেস ছাড়ল রাত ৮-৫৫ মিনিটে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৯৬১ সালের ১৭ অগস্ট লিখেছে: "বাঙালী যুবশক্তির সম্মুখে এই পর্বতারোহী দলটি দুর্বার প্রাণশক্তির যে আদর্শ ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার মূল্যও কম নয়। সকলেই আজ বুঝিয়াছেন যে, ইঁহাদের সাফল্যে আমাদের সকলেরই সাফল্য, ইঁহাদের গৌরবে আমাদের সকলেরই গৌরব। সেকথা উপলব্ধি করিয়া প্রতিটি দেশবাসীই ইঁহাদের সাফল্য কামনা করিলেন; প্রত্যেকেই প্রার্থনা করিবেন যে, জয়যুক্ত হইয়া ইঁহারা প্রত্যাবর্তন করুন। দেশবাসীর সেই অকুণ্ঠ শুভেচ্ছার সহিত আমাদের শুভেচ্ছাকেও আজ আমরা যুক্ত করিয়া দিতেছি।"

কিন্তু প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় অভিযাত্রীদের এই প্রয়াস সার্থক হয়নি।

পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘের সংগঠনায় সিকিম হিমালয় অভিযানের উদ্যোগ হয়েছে। বাঙালী পর্বতারোহী দলের অভিযান। এই অভিযানের বিপুল ব্যয়ের সমুদয় ভার

'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠী বহন করেছেন।

অভিযানের নেতার নাম বিশ্বদেব বিশ্বাস।

২২ মার্চ ১৯৬৪ সাল। সকালবেলা। পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘের সভাপতি ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক অশোককুমার সরকার শেয়ালদা স্টেশনে বিশ্বদেব বিশ্বাসের হাতে জাতীয় পতাকা জড়ানো গাঁইতি অর্পণ করলেন। এবং নেপালের পশুপতিনাথের প্রসাদী ফুল।

সকাল ৯-৩৫ মিনিটে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ছাড়ল। এই বাঙালী পর্বতারোহী দলের যাত্রারম্ভ হল।

অভিযাত্রীদলের পক্ষে নিমাই বসু ও মদন মণ্ডল, ১৯৬৪ সালের ৩ মে, ২১,৬৫০ ফুট উঁচু হিমালয়ের কাব্রুডোম শিখর জয় করেছেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শেরপা পাশাংলামা ও শেরপা কারমা। "শ্রীঅশোককুমার সরকার যে জাতীয় পতাকা গত ২২শে মার্চ নেতা বিশ্বদেবের হাতে তুলে দেন সেই পতাকাই গত ৩রা মে সিকিম হিমালয়ের একটি পর্বত শীর্ষে উড়েছে।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৬৪ সালের ১১ মে, লিখেছে: "আমাদিগের পত্রিকার বিশেষ আনন্দ এই যে, এই অভিযানে আমরা প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করিতে পারিয়াছি।"

নিমাই বসু, ১৯৬৬ সালের ১৮ অগস্ট এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন—এবার আমরা মানা জয় করবই, কামেটও। ১৯৬১ সনে আমরা মানা পাহাড়ে উঠবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় অভিযাত্রীদের সেই প্রথম প্রয়াস সার্থক হয়নি।

মানা-কামেট পর্বত অভিযাত্রীদের সহনেতা নিমাই বসু দলনেতা বিশ্বদেব বিশ্বাস। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংবাদপত্রগোষ্ঠী এই অভিযানের উদ্যোক্তা।

১৯ অগস্ট, ১৯৬৬ সাল। পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘের সভাপতি ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক অশোককুমার সরকার হাওড়া স্টেশনে বিশ্বদেব বিশ্বাসের হাতে সঙ্ঘের পতাকা তুলে দিয়ে বললেন—মানা-কামেট পর্বত শীর্ষে পতাকা উঠবে এই আমার আশা, প্রার্থনা।

অভিযাত্রীদের নিয়ে রাত্রি ৮-৩৪ মিনিটে দুন এক্সপ্রেস রওনা হল।

১৯৬৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘের সদস্যেরা ২৩,৮৬০ ফুট উঁচু দুর্ধর্ষ মানা শৃঙ্গে আরোহণ করেছেন। ইতিপূর্বে আর কোনো ভারতীয় পর্বতারোহী এই শিখরে উঠতে পারেননি। প্রাণেশ চক্রবর্তী উত্তর গিরিশিরার বিপজ্জনক পথ ধরে চূড়ায় উঠে একটি রেকর্ড স্থাপন করেছেন। মানা বিজয়ের মরণপণ সংগ্রামে ছ-জন সদস্য এবং শেরপা আহত হওয়ায় দলনেতা বিশ্বদেব বিশ্বাস এবারের মতো কামেট অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ত্রিশূলী পর্বতমালার পশ্চিমে অবস্থিত লামপাক পর্বতমালার মোট ছটি শিখর আছে। উচ্চতম শিখরটি ২১,৭৭০ ফুট।

১৯৬৮ সালের ৩১ অগস্ট পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘের সদস্যেরা কলকাতা থেকে যাত্রা করেছেন। দলের নেতা নিমাই বসু।

১৯৬৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর অভিযাত্রী দলটি লামপাক শৃঙ্গ জয় করেছেন। শীর্ষে আরোহী হয়েছেন প্রদ্যোত চট্টোপাধ্যায়, তাপস ভট্টাচার্য, সুজন কোলে, শিশির ঘোষ ও তিনজন শেরপা—পাশাং শেরিঙ, নিমা দোরজী ও থোন্ডু। খবরটি, ১৯৬৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর, কলকাতায় এল। পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘের সভাপতি ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক অশোককুমার সরকার এক তারবার্তায় এই বিজয়ী দলের নেতা নিমাই বসু এবং শিখরবিজয়ী চারজন সদস্য ও তিনজন শেরপাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অতঃপর, ১৯৬৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর, প্রদ্যোত, তাপস ও সুজন লামপাক শ্রেণীর আরেক অনামী শীর্ষে আরোহণ করেছেন; সঙ্গে শেরপা ছিলেন পাশাং শেরিঙ, নিমা দোরজী, নিমা তেনজিং ও পোর্টার বচনসিং।

লামপাক অভিযানের সদস্যেরা কলকাতায় ফিরে এলেন ১৯৬৮ সালের ২ অক্টোবর। সেদিন সন্ধ্যায় দলনেতা নিমাই বসু জাতীয় পতাকা, সঙ্ঘের পতাকা ও ওখানকার সামরিক বাহিনীর পতাকা সঙ্ঘের সভাপতি ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক অশোককুমার সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন।

জর্জ অ্যালবার্ট ডিউক ও পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ১৯৬৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, বিকেল তিনটায় আন্দামানের পথে কলকাতার গঙ্গাবক্ষে নৌকো ভাসালেন। নৌকোর নাম রাখা হয়েছে—কানোজি আংরে। এই নৌকোর আয়তন ২০ ফুট×৫ ফুট; কোনো যন্ত্রপাতি নেই, পাল নেই, থাকার মধ্যে আছে দুটি মাত্র দাঁড়। আন্দামানের পথে দুই তরুণ অভিযাত্রীর যাত্রা শুরু হল। সেদিন এক্সপ্লোরার্স ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান মিহির সেন বলেছেন—ভারতীয় তরুণতরুণীদের ঘরমুখী মনোভাব পরিহার করে সমুদ্রযাত্রা ও দুঃসাহসী অভিযানে উৎসাহিত করার জন্যই এই উদ্যোগ আয়োজন।

ডিউক—পিনাকী, ১৯৬৯ সালের ৫ মার্চ, দুস্তর সমুদ্র পার হয়ে আন্দামানের কূলে পেঁছেছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৬৯ সালের ৭ মার্চ, লিখেছে: "যে দুইটি ভারতীয় তরুণ তরঙ্গসঙ্কুল বঙ্গোপসাগর একটি সামান্য নৌকায় অতিক্রম করিয়া এক মাসের মধ্যে আন্দামানের কূলে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারা কেবল ভারতবর্ষের গৌরব নয়, বিশ্বেরও গর্ব। যে অসামান্য সাহস ও অপূর্ব মনোবল তাহারা দেখাইয়াছে তাহাতে বোঝা যাইতেছে তারুণ্যের অমর দীপ্তিতে তাহারা উদ্ভাসিত। তাহাদের কৃতিত্ব কোনও দিগ্বিজয়ী অভিযাত্রী অপেক্ষা কম নয়। তাহাদের সাফল্যের পরিমাপ কয় হাজার মাইল তাহারা অতিক্রম করিয়াছে—জলে, স্থলে, না অন্তরীক্ষে—তাহাতে নয়। তাহাদের কৃতিত্বের নিরিখ তাহাদের অসাধ্যসাধনের অটল সঙ্কল্প। সে সঙ্কল্প যাহার থাকে কোনও কাজই তাহার কাছে অসাধ্য নয়। জীবন-মৃত্যু তাহাদের পায়ের ভৃত্য। চিত্ত যাহাদের চরম সঙ্কটেও ভাবনাহীন তাহারা সকল জাতিরই মাথার মণি! সমগ্র জাতির সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া অভিনন্দন জানাই কনোজি আংরের দুই বীর নাবিক ডিউক আর পিনাকীকে দেশের মুখ রাখিয়াছে বলিয়া। সঙ্গে সঙ্গে সাধুবাদ দিই একসপ্লোরার্স ক্লাবের কর্মকর্তা শ্রীমিহির সেন ও তাঁহার সহযোগীদের ভারতীয় তরুণের কাছে সম্ভাবনার এক নূতন দ্বার খুলিয়া দেওয়ার জন্য।"

১৯৬৯ সালের ১১ মার্চ একটি বিমানে করে ডিউক—পিনাকী আন্দামান থেকে দমদমে এসে নেমেছেন।

বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছেন দু-জনে।

দুদিন পরে—১৯৬৯ সালের ১৩ মার্চ—ডিউক—পিনাকী 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ভবনে এলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক অশোককুমার সরকার ডিউক—পিনাকীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আর ডিউক—পিনাকী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছেন—আন্দামান অভিযানে সংবাদপত্রগুলির মধ্যে আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের দান ছিল সবচেয়ে বেশি।

এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের চেয়ারম্যান মিহির সেনও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর সহযোগিতায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংবাদের ভাষায়

কথ্যরীতি প্রবর্তন করেছে। স্বামী সোমানন্দ অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন: "আনন্দবাজারে চলিত ভাষা ব্যবহারের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। প্রায় সত্তর বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা সাহিত্যের ভাষা কীরূপ হওয়া উচিত তা অনুভব করেছিলেন। বাংলার সকল জেলার চলিত ভাষার স্রোতধারা রাজধানী কলকাতায় এসে মিলিত হয়ে স্বাভাবিক বলিষ্ঠ যে বর্তমান চলিত ভাষার ধারা গড়ে উঠেছে, তাই ব্যবহার করবার কথা তিনি বলেছিলেন। শুধু বলেন নি, তিনিই বোধ হয় প্রথম এই কলকাতার কথ্যভাষা ব্যবহার করে এর তীব্র গতিশক্তি বলিষ্ঠতা প্রাঞ্জলতা স্পষ্ট দেখিয়ে দেন। তখন উদ্বোধন পত্রিকায় এই ভাষায়ই লেখা হত। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পরবর্তীকালে এই ভাষা গ্রহণ করেন এবং বর্তমান কথাসাহিত্যিকগণও প্রায় সবাই এই ভাষায়ই লেখেন। তবে দৈনিক খবরের কাগজে সর্বাংশে এই চলিত ভাষা ব্যবহার করে আপনারা বাংলা সংবাদ সাহিত্যে তথা বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করলেন। কৃত্রিম সাধুভাষা পরিত্যাগ করে চলিত ভাষা পূর্ণ প্রচলনের দ্বারা সমস্ত বাংলায় সংহতি ও উন্নতির পথিকৃৎ আপনারা হলেন।"[৩]

সংবাদের ভাষায় প্রথমে কথ্যরীতি প্রবর্তনের পর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অ-সংস্কৃত শব্দের যুগলবিচ্ছেদে উদ্যোগী। ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সংবাদ-অংশে বানান সংস্কার আরম্ভ হয়েছে। তৎসম শব্দে হাত দেয়নি, প্রধানত বিদেশী ও কিছু তদ্ভব শব্দের বানানে নতুনত্ব এনেছে। প্রধানত মুদ্রণের প্রয়োজনে এই নতুনত্ব। ব্যাকরণ আর উচ্চারণ নির্ভুল রেখে শব্দের বন্ধন ভেঙেছে।

কিন্তু এই বানান সংস্কারের কি সত্যি-সত্যি প্রয়োজন আছে? 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৬৫ সালের ৩০ জুলাই, নিবেদন করেছে:

"প্রথম কথা, সংস্কারের প্রয়োজন আছে কিনা। আছে। বিবর্তন প্রাণী-তত্ত্বের একটি মূল কথা, এবং ভাষা যদি প্রাণবান হয়, তবে তার আধার বানানও প্রয়োজনের তাগিদে পরিবর্তিত হতে বাধ্য। আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে বাংলা বানান সংস্কারের ভার নিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথাবাগীশদের উষ্মা সত্ত্বেও বহু শব্দের অনাবশ্যক দ্বিত্ব বর্জন করা হয়েছিল এবং বর্ণহানি সত্ত্বেও শব্দগুলির দ্বিজত্ব যায়নি। 'কর্ম' তেমনই পটু আছে, 'সূর্য' তেমনই ভাস্বর, 'পূর্বে'র মহিমাও যথাপূর্ব।

আবার যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে, তবে পদের অন্তঃস্থিত 'ম' স্থানে অনুস্বারের বিধানে সংগীত কিছুমাত্র মাধুর্য হারায়নি, সংকট নিয়ে নতুন কোনও সংকটও দেখা দেয়নি। ফলে ভাষা সবল না হোক, পাঠের পক্ষে কিছুটা তো সরল হয়েছে। এই একটি বিষয়ে হিন্দী রীতি আগে থেকেই যুক্তাক্ষরের মোহ থেকে মুক্ত। দৃষ্টান্ত লখনউ, মাদরাজ।

যে-কোনও সংস্কারে প্রথম বাধা আসে অভ্যাস থেকে। শব্দগুলির একটি করে চিত্র আমাদের মনে ছাপা আছে, নতুন রূপ তার সঙ্গে মেলে না, খটকা জাগায়। কিন্তু অভ্যাস অজরামরবৎ শাশ্বত পদার্থ নয়, বদলায়, আস্তে আস্তে সবই সয়। ক্রমে অপরিচিত রূপটিই পরিচিত হয়ে ওঠে, আর সেটি যদি সহজতর হয়, তবে আরও বেশী মনোমতও হয়ে ওঠে। তাছাড়া নতুন শিক্ষার্থীদের—স্বদেশী শিশু কিংবা বিদেশী আগন্তুক—বেলায় অভ্যাসের প্রশ্ন তো ওঠে না! আগে থেকেই জটিলতার বেড়াগুলি যথাসম্ভব খুলে দিলে আপত্তি কোথায়? সহজ বানান সহজ পাঠের প্রথম পাঠ হোক।...

সংযুক্তাক্ষরা বঙ্গভাষার বন্ধন ঈষৎ শিথিল না হলে তার চালচলনের আড়ষ্টতা দূর করা অসম্ভব।

ছাপাখানা এবং টাইপরাইটারের কাজে জড়িত ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, বাংলা

যুক্তাক্ষর পদে পদে কী অমিত্র-অক্ষর। এমনিতেই অক্ষরসংখ্যা পঞ্চাশের কাছাকাছি, তদুপরি যুক্তাক্ষরের দৌলতে মোট সংখ্যা চতুর্গুণ বেড়ে আছে। বাহাত্তর ইঞ্চি বহরের আঠারো হাত ধুতি নিয়ে ট্রামেবাসে চলার মতই যুক্তাক্ষরে জড়ানো বাংলা ভাষা সহজে চলে না, পদে পদে হোঁচট খায়, দু-পা এগোতে না এগোতে জিরোতে চায়।

তাই ভাষাকে যদি সচল করতে হয়, যদি আধুনিক প্রয়োজনের উপযোগী করতে হয়, তাহলে যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে।...”

নতুন রীতি প্রবর্তনের সময়ে নেপথ্যের ক্রিয়াকর্মও নিতান্ত সামান্য নয়। সেসময়ে বার্তাসম্পাদক সহকর্মীদের কাছে এ-বিষয়ে কিস্তিতে কিস্তিতে একাধিক প্রস্তাব ছাপার অক্ষরে বিতরণ করেছেন। প্রথম প্রস্তাবটি আদ্যন্ত উদ্ধার করি:

“সংবাদে কথ্যরীতির প্রবর্তনের পরীক্ষায় সোৎসাহ সহযোগিতার জন্য সহকর্মীদের ধন্যবাদ। তবু, কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তি কিংবা অস্পষ্ট ধারণা সম্ভব। নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি ঠিক নির্দেশনামা নয়, তবে সহকর্মীদের কাজের পক্ষে সহায়ক হতে পারে।

এক: চলতি বা কথ্যরীতি কেন। সহজ সাধুরীতি বেশি প্রাঞ্জল এবং সুবোধ্য, না কথ্যরীতি—এ বিতর্ক অনাবশ্যক। ভালো হোক, বা মন্দ হোক, এই রীতি বেশ কিছুকাল যাবৎ সাহিত্যের প্রায় একমাত্র বাহন। সংবাদপত্রেও বিবিধ কলমে তার ক্রমিক অনুপ্রবেশ এই রীতির উৎকর্ষের না হোক, অনিবার্যতার স্বীকৃতি। যা আংশিক, তাকে সর্বাঙ্গীণ করে তোলার উদ্যোগে আনন্দবাজার পত্রিকা অগ্রণী হতে পারে।

দুই: কথ্যরীতির প্রকৃতি কী। কথ্যরীতি অর্থ চটুলতা নয়। আমরা আপাতত শুধু ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামেরই কথ্যরূপ গ্রহণ করব। যেখানে সম্ভব সেখানে এবং শৈলীকে বিশেষ একটি শক্তি দিতে ক্রিয়াপদ পরিহারও করব।

চলতি রীতিও অপ্রগল্ভ এবং গম্ভীর হতে পারে। নিদর্শন রাজশেখর বসুর শেষ জীবনের রচনা।

আমাদের সংবাদের ভাষার শব্দ সমষ্টি প্রধানত হবে সংস্কৃত-ভিত্তিক, অর্থাৎ তৎসম বা তদ্ভব শব্দের প্রাধান্য বাঞ্ছনীয়।

কারণ, সাধুরীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামগুলি দীর্ঘতর বলে বিশেষ্যাদি সহজ হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু কথ্যরীতিতে একে ক্রিয়াপদগুলি হ্রস্ব ও লঘু, তাতে বিশেষ্যাদিও হালকা হলে, লেখার চালও চপল হয়ে যাবার আশঙ্কা। ফলে সংবাদ প্রার্থিত ব্যঞ্জনা, গভীরতা না-ও পেতে পারে।

নূতন রীতির আদর্শ এবং লক্ষ্য কী, সেটা স্পষ্টতর করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতিদিনকার কাগজের একটি ফাইল বার্তা বিভাগে রক্ষিত হবে। সহকর্মীদের প্রতি অনুরোধ, তাঁরা যেন অবসর মত মার্জিনের মন্তব্যাদি পড়ে রাখেন।

তিন: রচনারীতির পরবর্তী অপরিহার্য প্রশ্ন—বানান। তৎসম, তদ্ভব, এমন কী দেশজ শব্দগুলিরও বেশির ভাগ সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই। বৈচিত্র্য দেখা দিতে পারে ক্রিয়াপদ নিয়ে। সম্পূর্ণ একটি “স্টাইলশীট” তৈরী করা সময় সাপেক্ষ। প্রথম কিস্তি হিসাবে কয়েকটি নমুনা আজই দাখিল করা যাক:

করছে—‘কোরছে’ কিংবা ‘কর্ছে’ নয়। এই আদলে—বলছে, নড়ছে ইত্যাদি।

বললু গেল, করল, এল, হল। শেষ অক্ষরে “ও”কার অনাবশ্যক। অর্থাৎ এলো, বোললো, হোলো ইত্যাদি নয়।

‘ওঠে’—যেমন সে রোজ সকালে ওঠে।

‘উঠে’—সকালে উঠে সে পড়তে বসল।

‘বোঝা’—তার কথা বোঝা ভার। বুঝা নয়।

‘র’ এবং ‘ড়’-এর পার্থক্য স্মরণ রাখবেন। তৎসম শব্দ না হলে ‘র’-এর পরে ‘ণ’-প্রকরণের প্রয়োজন নেই। রানী। বিদেশী রোনাল্ড।

দেশজ বা বৈদেশিক শব্দে যুক্তাক্ষরের আধিক্য না ঘটাই ভাল। যথা সব্‌জি, ভর্‌তি, সমরসেট, লখনউ।

এতে ছাপাখানার কাজ ও প্রুফ পড়ার সুবিধা হবে।

এবার বানানের দ্বৈত ঘটে থাকে এমন কয়েকটি (১) বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত:

উঠান—উঠোন নয়; বিকাল—বিকেল নয়; হিসাব—হিসেব নয়; সুবিধা—সুবিধে নয়; জন্য—জন্যে নয়; উপর—ওপর নয়।

(২) ক্রিয়াপদ: পারি না, করি না। পারিবে বা করিবে নয়, যদি-না উদ্ধৃতি হয়।

এলেন—আসলেন নয়। সেই মত এল, আস্‌ল নয়। পারিনি, করিনি—পারি নাই, করি নাই, পারি নেই, করি নেই নয়।

সঙ্গে—'সাথে' নয়।

আঞ্চলিক ইডিয়ম সম্পর্কে সাবধানতা দরকার।

'শ' 'স'; হ্রস্ব 'ই', দীর্ঘ 'ঈ' ইত্যাদির ব্যবহারে অথবা 'কর্তব্য' কার্যাদিতে দ্বিত্ব পরিহারে অভিধানসম্মত আধুনিক বানান অনুসরণ করাই উত্তম।

প্রয়োজনবোধে আরও দৃষ্টান্ত সংযোজন করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য এই তালিকা ক্রমশ-প্রকাশ্য।"

ষষ্ঠ প্রস্তাব থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি:

"আমরা প্রধানত ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের ক্ষেত্রেই চলতি হওয়ার পন্থী, এই কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। অর্থাৎ ঠান্ডা হাওয়ার বদলে সুশীতল সমীরণই সেব্য। কেন, তার ব্যাখ্যা পূর্বেই একবার দেওয়া হয়েছে, সহকর্মীরা আরএকবার চোখ বুলিয়ে নেবেন। কী এবং কি-এর ব্যবহার-পদ্ধতি আয়ত্ত করা শক্ত কি? হলেও এমন আর শক্ত কী!

দেশজ এবং বৈদেশিক বিশেষ্যগুলিতে যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব বর্জন করব, এই সঙ্কল্প স্মরণীয়। দৃষ্টান্ত: ক্যানসার, আনসার, মুনশী, রিকশ। দু-একটি বাক্যে মাঝে-মাঝে ক্রিয়াপদ বাদ দিলে বক্তব্য যে গতি পায়, সে-রহস্য, অনুমান করি, এখনও অনেকেরই অনধিগত। মাঝে-মাঝে পরখ করে দেখতে পারেন।"

সপ্তম প্রস্তাবটি আদ্যন্ত তুলে দিচ্ছি:

"ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব পর পর ছয়টি বিতরণ করা হয়েছে, কাগেজেও কাটাকাটি করা হচ্ছে রোজ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছু ভুল দিনের পর দিন ছাপা হয়ে চলেছে। সন্দেহ হয়, সকলে কাটা কাগজ দেখেন কিনা। কিংবা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবগুলি আদৌ পড়েছেন কিনা। আরও দুঃখের কথা, কোন কোন কপিতে সঠিক বানান থাকা সত্ত্বেও মুদ্রণ ও রীডিং বিভাগের অসাবধানতায় ভুল বানানই ছাপা হচ্ছে।

আশ্চর্যের কথা, বার বার বলা সত্ত্বেও সহকর্মীদের কানে হ্রস্ব স্বর কিছুতেই বাজছে না। তাই এখনও কাগজে বের হয় দানী, জরীপ, লরী, বাউন্ডারী, পাখী, বাড়ী, বাঁশী। হিসাবে বা জন্য না লিখে, কী রিপোর্টার, কী সাব-এডিটর, অনেকেই হিসেবে ও জন্যে চালিয়ে যাচ্ছেন। কি এবং কী-র মধ্যে পার্থক্য কী আজও অধিকাংশ সহকর্মী ঠিক ধরতে পারলেন না। উপর-এর বদলে ওপর এবং ওঠের বদলে উঠে নির্বিবাদে চলছে। গিয়েছে না লিখে গেছে লিখেছেনও অনেকে।

লখনউ-এর মত ভেঙে ভেঙে মুশকিল, নকশা, পালটা, বালব, হেলিকপটার ইত্যাদি লেখার জন্য নির্দেশ বহুবার দেওয়া হয়েছে, তবু কাজ হয়নি; এখনও বের হয় বাল্ব, মুস্কিল ইত্যাদি। তাছাড়া কতবার জানানো হয়েছে জানান নয় জানানো—কিন্তু ওকারকে কিছুতেই ধরে রাখা যাচ্ছে না। তেমনই (তেমনি বা তেম্নি নয়), পৌঁচেছে, বিকেল, সহর, ডিভিসন, পুলিস, বৈ কি, উহা ইত্যাদিও রোজ পাতা বোঝাই করে বের হয়।

অংশ গ্রহণ করার পরিবর্তে যোগদান লেখার অনুরোধও করা হয়েছে অজস্রবার,

কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই আহ্বানে যোগ দিতে কেউ সম্মত নন। চেনা নাম ইংরেজি আদ্যাক্ষরে লেখার অভ্যাসও যথাপূর্ব।

সহকর্মীদের কাছে বিনীত নিবেদন, ভাষা ও বানানের ব্যাপারে আর একটু সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সকলের সহযোগিতা ভিন্ন সংস্কার অসম্ভব।

রোজই কাজে বসার আগে পুরানো পাঠে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে কি ভালো হয় না?"

দশম প্রস্তাবটিও আদ্যন্ত উদ্ধার করি:

" 'কর্কশ', কিন্তু 'করপোরেশন'। অর্থাৎ যুক্তাক্ষরের বন্ধন খোলা হবে শুধু অ-সংস্কৃত শব্দের। সীমান্‌ত নয় সীমান্ত, চেষ্‌টা নয় চেষ্টা। আবার চ্যান্সেলার বা ইঞ্জিনিয়ারের বদলে চ্যানসেলার ও ইনজিনিয়ার চলুক। চলুক মারকিন, ট্যাকসি, একসপ্রেস, অবজারভার ইত্যাদি।

বানানের এই স্বাধীনতা বেশী নেওয়া হবে বিদেশী শব্দে, বিশেষ করে অপ্রচলিত স্থান বা ব্যক্তির নামে। তবে যেহেতু প্রত্যেকটি শব্দ শুধু কানে শোনার নয়, চোখে দেখারও, তাই বহুল-প্রচলিত স্থান বা ব্যক্তির নামের বানান এতদিন যা চলে এসেছে, তাই চলুক আপাতত। ওগুলি না ভাঙাই ভাল। লনডন বা পানজাব লিখলে ক্ষতি নেই, পড়তে বা বুঝতে অসুবিধা হয় না, তবু বহুল-প্রচলনের জন্য লণ্ডন ও পাঞ্জাব চালু থাকুক। কিন্তু সাণ্টো ডোমিঙ্গো না লিখে আমরা লিখব সানটো ডোমিনগো। লিখব আরজেনটিনা।

তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও স্মরণ রাখা দরকার মঙ্গল, বঙ্গ, সঙ্গে ইত্যাদি শব্দ ভাঙা যায় না, ভাঙতে হবে সংগীত, ঝংকার ইত্যাদি শব্দকে। কেননা যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে, তবে পদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ বিধেয়।

তাছাড়া লিখুন বাঙালী—কিন্তু বাংলা। এবং বৃটেন ও বৃটিশ না লিখে ব্রিটেন ও ব্রিটিশ লেখাই উচিত।"

একাদশ প্রস্তাবের কেবলমাত্র শেষ অনুচ্ছেদটি তুলে দিচ্ছি: "বিদেশী স্থান ও ব্যক্তির নামের বানান ভাঙার কাজ ভালই চলছে। এখন দেখা যাচ্ছে শুধু ইনডিয়া নয়, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, ইনদোনেশিয়া, অসট্রিয়া, উগানডা, ফ্রান্‌স ইত্যাদি দেশও অনায়াসে ভেঙে দুটুকরো করা যায়।"

১৯৬৫ সাল শুধু ভাষা সংস্কারের জন্য নয়, বানান সংস্কারের একটি বৃহৎ প্রয়াসের জন্য, প্রবোধচন্দ্র সেনের বিবেচনায়, স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বানান সংস্কারের কৃতিত্ব স্বীকার করে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন: "এই কৃতিত্বের জন্য বাংলা ভাষার অনুরাগী ও সংস্কারকামী মাত্রেরই অভিনন্দন তাঁদের প্রাপ্য।"[৪]

কিন্তু ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বানান সংস্কার সমর্থন করেননি। তিনি প্রতিবাদ করে লিখেছেন: "বাঙ্গালীর উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া সহজ-ভাবে কয়েকশত বৎসরের অভিজ্ঞতায় বাঙ্গলা বর্ণবিন্যাসপদ্ধতি বা বাঙ্গলা অক্ষরে লিখন-রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তে অনুসৃত নূতন এই রীতি কতকগুলি বিষয়ে তাহার বিরোধী এবং পরিপন্থী বলিয়া মনে হইতেছে, এবং ইহার প্রভাবে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের মনে তাহার মাতৃভাষার পঠনে অনুচিত এবং অনাবশ্যক বিভ্রান্তি আসিয়া যাইতেছে মাত্র—সাধারণ পাঠক ইহাতে দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন, মাতৃভাষার লিখন-শৈলী বা পরিপাটীর উপরে আঘাত পড়িয়া, বাঙ্গালী জাতীর মনন ও চিন্তনের পক্ষে ইহা হানিকারক হইতেছে।"[৫]

মনে রাখা দরকার, অজস্র পারিভাষিক শব্দ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সৃষ্টি করেছে এবং বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন: "বাঙ্গলা ভাষাকে সাংবাদিকতার উপযোগী বাহন করিবার জন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাঙ্গলা গদ্যের নূতন ভঙ্গী সৃষ্টি করিয়াছে এবং তজ্জন্য সহস্র পারিভাষিক শব্দও তাহাকে আবিষ্কার করিতে অথবা সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে। জাতীয় জীবনে ইহাও আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম উপহার।"[৬]

প্রবোধচন্দ্র সেন যথার্থ বলেছেন: 'আনন্দবাজার পত্রিকা' শুধুমাত্র পত্রিকা নয়—পত্রিকাটি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানও। বাঙালীর বড় কীর্তি ও আশার স্থল এই পত্রিকা। আনন্দবাজার কেবলমাত্র জাতীয় জীবনের চিন্তাধারাকেই গড়েনি—বাংলা ভাষাকেও রূপদান করেছে।"[৭]

এ-সত্য তর্কাতীত যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাঙলা ভাষার অতন্দ্র সেবা করেছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: " 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাঙ্গলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য, এবং বহু বৎসর ধরিয়া 'আনন্দবাজার' পত্রকারিতার মাধ্যমে বাঙ্গলা ভাষার অতন্দ্র সেবা করিয়া আসিয়াছে, সে সেবা বাঙ্গালী ভুলিবে না। বাঙ্গলা গদ্যের এ যুগের উপযোগী বিবর্তনে, 'আনন্দবাজার'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও সংবাদ-পরিবেশন বিশেষ লক্ষণীয় শক্তি সৌন্দর্য্য ও শালীনতা আনিয়া দিয়াছে।... বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, ভূদেব, চন্দ্রোদয়, কালীপ্রসন্ন, ব্রহ্মবান্ধব, পাঁচকড়ি প্রমুখ বাঙ্গলা পত্রকার-জগতের নমস্য পথিকৃৎদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এ যুগের 'আনন্দবাজার'-এর সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও প্রফুল্লকুমার সরকার এবং ইঁহাদের সহকর্মীরা, বিচার আলোচনা, তথ্যজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষাকে কতটা না শক্তিশালী করিয়া গিয়াছেন! বিদেশী বহু বহু শব্দের কত সুন্দর সহজবোধ্য বাঙ্গলা অনুবাদ দিনের পর দিন ইঁহারা বাঙ্গলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারে আনিয়া দিয়াছেন, সেই সব শব্দ আবার বহুশঃ সহজেই বাঙ্গালী গ্রহণ করিয়াছে, এবং লিখিত সাহিত্যের বাহিরে কথায়বার্তায়-ও ব্যবহার করিতেছে।"[৮]

১৯৬৮ সালে অশোককুমার সরকার রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছেন—পদ্মভূষণ।

১৯৬৮ সালের ৯ ফেব্রুআরি কলকাতার পৌর অধিবেশনে রাস্তার নাম পরিবর্তনের একটি প্রস্তাব অনুমোদিত হল। সুতারকিন স্ট্রীটের নাম বদল হয়ে নতুন নাম হল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের নামে। 'প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট'।

১৯৬৮ সালের ২৪ জুলাই থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হয়নি। কারণ—১৯৬৮ সালের ২৩ জুলাই থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অসাংবাদিক কর্মীরা ধর্মঘট করেছেন।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৯ সালের ১৩ এপ্রিল, বলেছেন: "আজ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ভারতের অদ্বিতীয় সংবাদপত্র। এটা আমাদের সকলেরই আনন্দের কথা, গর্বের কথা।"

১৯৬৯ সালের ৮ জুলাই ভারতের অদ্বিতীয় সংবাদপত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অফিস আক্রান্ত হল। বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ একদল ছাত্র আক্রমণ করেছে। কয়েকজন ছাত্র ভবনের দোতলা পর্যন্ত উঠে পার্টিসন দেওয়ালের কাঁচ ভাঙল। একতলার চেয়ার-টেবিল উল্টে দিল, বিজ্ঞাপন গ্রহণ বিভাগ তছনছ করল, টেলিফোনগুলো ভেঙে ফেলল। শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন বাবদ সংগৃহীত কিছু টাকা উধাও হয়ে গেল। পত্রিকার টেলিফোনের 'পি বি এক্স' ঘরেও আক্রমণের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মীরা ভিতর থেকে দরজা প্রাণপণে ঠেলে রাখায় শেষপর্যন্ত টেলিফোনের 'পি. বি. এক্স' নষ্ট হয়নি। পত্রিকা ভবনের সামনে দাঁড়ানো পত্রিকার গাড়িগুলো ছাড়া বাইরের কয়েকটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হল। এক নজরে ক্ষতির হিসাব—ভ্যানসহ আঠারোটি গাড়ির কাচ চুরমার, একটি ভ্যানে

আগ্নন, আর একটিতে লাগানেরা চেষ্টা, ঢিল আর সোডার বোতল নিক্ষেপের ফলে একতলা থেকে চারতলা পর্যন্ত জানালার কাচ চূর্ণবিচূর্ণ। পত্রিকার কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন।

কিছুক্ষণ পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এল এবং চার ঝাঁক কাঁদানে গ্যাস ছুড়ল।

ঘটনার পর যুক্তফ্রণ্টের কয়েকজন মন্ত্রী ও এম. এল. এ. সরেজমিন তদন্তে পত্রিকা ভবনে এলেন।

মনে রাখা দরকার, পশ্চিমবঙ্গে তখন যুক্তফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট এবং মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি ফ্রণ্টের সবচেয়ে বড়ো শরিক।

বহু সাংবাদিক, রাজনীতিক, ছাত্র, যুবক ও শ্রমিক সংগঠন, সাধারণ নাগরিক টেলিফোনে, চিঠিতে এবং বিবৃতি মারফৎ এই চন্ডামির নিন্দা করেছেন।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—এ-ভাবে টিকে থাকা যাবে না। এ তো 'অরাজক অবস্থা'। এ-ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে হবে।

ডঃ রমা চৌধুরী বলেছেন—'প্রেস' এর কণ্ঠরোধ হোক কেউ চায় না।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—সাংবাদিকদের লেখনীর মুখ দিয়ে জাতি কথা বলে। সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ জাতীয় জীবনের কণ্ঠরোধের সমান হবে। রাজনীতি বর্তমান কালের মানুষ ও সমাজকে এমন অসহিষ্ণু এবং হিংসাজর্জর করে তুলেছে যে অপরের কোন স্বাধীনতা বা স্বাধীন মতামত পোষণের অধিকার আজ মানুষ সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। এর ফলে জীবনে 'আরণ্য-নীতি' প্রকট হয়ে উঠেছে। যাদের দল ভারী, যে অধিকারে প্রতিষ্ঠিত সেই আজ দৈহিক শক্তির বলে সকল প্রকার স্বাধীনতা ও অধিকারের কণ্ঠরোধ করতে চায়, ফলে, সংবিধানে যে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি আছে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে চলেছে।

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন বলেছেন—এ ধরণের ঘটনা খুবই দুশ্চিন্তার বিষয়।

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন বলেছেন—এ ধরণের ঘটনা খুবই দুশ্চিন্তার বিষয়। কিভাবে চাপ
বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—সংবাদপত্রের উপর কোন রাজনৈতিক দল কিভাবে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করেন তা আমার জানা নেই। তবে, মঙ্গলবার সংবাদপত্রের অফিসে যা ঘটেছে তার জন্য সকলেই দুঃখিত এবং দুশ্চিন্তিত। কারণ, যে কোন প্রতিষ্ঠানের উপর এ-ধরণের আক্রমণ বা সেখানে ভাঙচুর করা অত্যন্ত অনুচিত। বিশেষত সংবাদপত্রগুলি যে জনসেবা করেন তা মনে রাখলে এই ধরণের ঘটনা শিক্ষিত সমাজকে উদ্বিগ্ন করে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন—পরম-অসহিষ্ণুতার এই যে লক্ষণ ক্রমশ উগ্র হয়ে উঠছে, এটা ভবিষ্যতের পক্ষে খুব দুশ্চিন্তার বিষয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন—অত্যন্ত ধিক্কারজনক ঘটনা। সংবাদপত্রগুলির নিজস্ব মতামত আছে; তা প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকারও আছে। এই ধরণের আক্রমণকে সমর্থন করি না।

মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা এবং তখন পশ্চিমবঙ্গের উপমুখ্য-মন্ত্রী জ্যোতি বসু, ১৯৬৯ সালের ১০ জুলাই, বিধানসভায় একটি বিবৃতিতে বলেছেন —ছাত্রদের বক্তব্য হল, সংবাদপত্র সম্পাদকদের বিভিন্ন ব্যাপারে নিজস্ব মতামত থাকতে পারে এবং তাঁরা সম্পাদকীয় স্তম্ভে তা অবাধে প্রকাশ করতেও পারেন, তবে ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তাঁদের ন্যায্য, নির্ভুল ও তথ্যাভিত্তিক সংবাদ পরিবেশন করা উচিত। ছাত্রদের মতে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কয়েকটি সংবাদ-পত্রে হয় বিকৃত বিবরণ প্রকাশ করা হচ্ছে অথবা সংবাদ সম্পূর্ণ চেপে যাওয়া হচ্ছে। এর পর ছাত্ররা যখন সেই সব বিকৃত সংবাদের ভুল সংশোধন করে বা প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিচ্ছেন কিংবা যেসব তথ্য আগে চেপে যাওয়া হয়েছিল সেই সব প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করছেন, তখনো সেই বিবৃতিগুলি যথাযথভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে না। এজন্য কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি প্রধান ছাত্রসংস্থার প্রতিনিধিদের এক সভায়

স্থির হয় যে, সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রগুলির মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হবে। কাজেই, ১৯৬৯ সালের ৮ জুলাই ছাত্রদের এক শোভাযাত্রা সংগঠন করা হয়। বিকেল সাড়ে তিনটার সময় শোভাযাত্রাটি যখন বৌবাজার স্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ-এর মোড়ে আসে, তখন সেই শোভাযাত্রার একটা অংশ মূল মিছিল ছেড়ে সুতারকিন স্ট্রীটে আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসের দিকে যায়। এই ছাত্রেরা ওই অফিসের সামনে বিক্ষোভ জানান। মনে হয়, কিছু ছাত্র অফিসের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং কিছু কাঁচের শারসি ও টেলিফোনের ক্ষতি করে, কয়েকটি কাঠের আসবাবপত্র উল্টে দেন। তাঁরা যখন ওই অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন অফিসের কম্পাউন্ডে দাঁড়ানো কয়েকটি গাড়িরও ক্ষতি করেন। খবর পাওয়া যায়, অফিসের কর্মচারীরা ছাত্রদের উদ্দেশে ফুলের টব ও কাগজ-চাপা ছোঁড়েন। কয়েকজন ছাত্র আহত হন। আহতদের মধ্যে দুজনকে এস এস কে এম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। পুলিশ হাঙ্গামাস্থলে এসে পড়ে এবং কাঁদানে গ্যাস ছেড়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। এসম্পর্কে বৌবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এসম্পর্কে অনুসন্ধান চলছে।... ছাত্রদের একটা ছোট প্রতিনিধিদল বিধানসভা ভবনে আমার ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা আমাকে ছাত্রসমাজের অভিযোগ ব্যাখ্যা করে বলেন এবং ওইদিনের ঘটনা সম্পর্কে তাঁদের (ছাত্রদের) বক্তব্য জানান। যা ঘটেছে তাতে আমি অসুখী এবং একান্তভাবে আশা করি তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৬৯ সালের ১২ জুলাই, লিখেছে:

"ধন্যবাদ—প্রথমে সর্বশ্রেণীর পাঠকবৃন্দকে। দলবদ্ধ হামলাবাজির কুৎসিত বীভৎসাকে আমরা সেদিন তীব্রস্বরে বলিয়াছিলাম "ধিক্"। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সকল স্তরে, কী কাছে কী দূরে, অসংখ্য কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে "ধিক্"। টেলিফোনে, টেলিগ্রাফে, ডাকযোগে উদ্বেগ—আক্রমণের জন্য। অভিনন্দন—নিঃশঙ্কতার জন্য। অগণ্য পত্র, জমা করিলে বিপুল স্তূপ; শুধু চুম্বকও যতগুলির ছাপা সম্ভব, তাহা সর্বমোটের তুলনায় নগণ্য।...

সমাজের সামগ্রিক বিবেক শিহরিত হইয়া সাড়া দিয়াছে। আমাদের সাহসের শিখা হইতে—কেহ কেহ বলিয়াছেন—নিজ নিজ দীপটি জ্বালাইয়া লইলেন। "যার ভয়ে, ভীত তুমি সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে"—সেই কবে উচ্চারিত এই মন্ত্রটির নিহিত অর্থ আপনা হইতেই আবার উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। হয়ত ইহাকেই বলে অভিশাপের ছদ্মবেশে আশীর্বাদ। প্রাপ্ত প্রত্যেকটি পত্র যেন এক-একটি ভোটপত্র, আমাদের স্বস্থানে স্থিত রাখে। স্থিত রাখে স্বধর্মেও। আরও একবার অনুভব করা গেল, জনপ্রিয় নেতার মত জনপ্রিয় পত্রিকারও শক্তির উৎস তাহার নিজস্ব নির্বাচনকেন্দ্র, তাহারই পাঠকমণ্ডলী।

ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রীকে। দলমতনির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর জননেতাকে, এই রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীকে—যাঁহারা বলিয়াছেন, সংবাদপত্রের দপ্তরে হানা বা হামলা সাংবাদিক-স্বাধীনতা হননের সমতুল। ধন্যবাদ সেইসব ছাত্র-সংস্থাকে, আমাদের সঙ্গে মত ও পথের পার্থক্য সত্ত্বেও, সেদিন যাঁহারা নির্ধারিত কর্মসূচীর বাহিরের ওই অপকর্মে ভূমিকা লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। স্থানীয় ও জাতীয় সংবাদপত্রগুলিকেও ধন্যবাদ. যাঁহারা নৈতিক দিক হইতে আমাদের বল জোগাইয়াছেন, পাশে দাঁড়াইয়াছেন।

আর ধন্যবাদ, জ্যোতিবাবু, আপনাকেও। আর কিছু না হউক, ব্যক্ত এই "একান্ত আশাটুকুর" জন্য যে, "যা ঘটিয়াছে তা আর ঘটিবে না।" সংবাদপত্র সম্পাদকের নিজস্ব মতামত থাকিতে পারে এবং তাঁহারা তা অবাধে পারেন প্রকাশিত করিতে—এই ভরসা-টুকুর মধ্যেও অনেকখানি স্বস্তি। আপনি বলিয়াছেন, ছাত্রদের বক্তব্য নাকি ইহা-ই। সবিনয়ে জিজ্ঞাস্য, কোন ছাত্রদের বক্তব্য? সেদিন যাহারা এখান হইতে তাড়াতাড়ি

আপনার দরবারে গিয়া এফ-আই-আর দাখিল করে, অর্থাৎ পহেলা এত্তেলা দেয়, তাহাদেরই কি? একথা তো তাহারা আমাদেরও বলিতে পারিত। আমরা কানে খাটো নহি, ঢিলের মুখে বলিবার কথাটাকে ছুঁড়িয়া দিল কেন? সম্পাদকীয় মতামত প্রকাশের অধিকার অবাধ,—এই সনদটির জন্যই তো আমরাও লড়িয়া আসিতেছি।

মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, এইবার একটি চ্যালেঞ্জ। ন্যায্য নির্ভুল ও তথ্যভিত্তিক সংবাদ পরিবেষণ করা উচিত, নিশ্চয়ই। কিন্তু জোরালো গলায় জানাইলেই নালিশ সত্য হয় না, চোখ রাঙাইয়া বলিলেও না। ভাসা-ভাসা অভিযোগ নয়, সাংবাদিক আদর্শ সম্পর্কে অযাচিত সদুপদেশও নয়, নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত চাই। সমালোচনা মাত্রেই যুক্তফ্রণ্টকে হেয় করার ষড়যন্ত্র নয়, এতদিনে এই আশ্বাস মিলিল. আমরা তাহাকে মাথায় তুলিয়াও লইলাম, কিন্তু খবরের ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ঘটিয়াছে এমন একটি নমুনা ফরিয়াদীরা দাখিল করুক। বলুক, কবে কোন কাগজের কোন পৃষ্ঠার কোন খবরটি অসত্য। এ যাবৎ যাহা যাহা ঘটিয়াছে বলিয়া বিবরণ বাহির হইয়াছে, ঘটে নাই তার কোনটা? হইতে পারে, ঘটনাগুলি তাহাদের পছন্দসই নয়। কিন্তু সেজন্য তো আমরা দায়ী নহি।

খাঁটি খবর জোগাড় করা আর বাহির করার পিছনে এক-একটি সংবাদপত্রের কত পরিশ্রম, কত জোগাড়-যন্ত্র, বাহিরের অনেকের পক্ষে তাহা জানার কথা নয়। তাহারা হয়ত পড়িয়াও দেখে না।... যেখানে একই সরকারের নানা শরিকের মধ্যে নিয়ত বিবাদ, সেখানে কে ঠিক করিয়া দিবে যে, কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক? কোন পক্ষের ভাষ্য ছাপা হইবে, কোন খবরটা নৈকষ্য? অথবা একেবারে কিছু না ছাপিলেই কি সাংবাদিক সততার পরাকাষ্ঠা হইবে? তার চেয়ে বরং সব ঘটনায় সব দলগুলি মিলিয়া পারেন তো, যৌথ বিবৃতি প্রচার করুন—হানাদারদের লাঠি আর আমাদের ল্যাঠা দুই-ই বাঁচিবে। অথবা সরকারী প্রেস নোট ছাড়া কিছুই ছাপা চলিবে না, এই ফরমানও জারি হইতে পারে—কিন্তু তাহা হইলে পয়সা দিয়া কাগজ কিনিবে কয়জন?

তবু, জ্যোতিবাবু, আপনাকে বিশেষ করিয়া ধন্যবাদ এইজন্য যে, আপনার বিবৃতি পড়িয়া মনে হয়, সেদিন যাহারা এখানে ঠেকিয়া ভাবিয়াছিল, ওখানে গিয়া ঠকাইবে-- "কর্ণে ন পশ্যতি"র সুযোগ লইবে—তাহারা পুরাপুরি সুবিধা করিতে পারে নাই। তাহাদের কী বলিয়া অভিহিত করিব? নিও-টেরারিস্ট, নয়া-সন্ত্রাসবাদী? তাহা-ই বা বলিতে পারিতেছি কই, কেননা সেকালের সন্ত্রাসবাদের মধ্যে আরও সাহস ছিল, মিথ্যাজাল রচনা ছিল না। আহত ছাত্রদের মধ্যে দুজনকে নাকি হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। জানিতে চাই, কোন হাসপাতালে? আপনার বয়ানে এক হাসপাতালের, আর দলীয় একটি মুখপত্রে আর-একটির নাম দেখিতেছি। জানিতে চাই. কোনটা সত্য? মুখপত্রের বিবরণে দেখি একজনের অবস্থা গুরুতর আর আপনার বিবৃতিতে আছে, "প্রাথমিক চিকিৎসা" করা হয়। আবার জানিতে চাই, সত্য কোনটা? সেই জন্যই, স্বতঃই আমাদের সিদ্ধান্ত, ফরিয়াদীদের ভাষ্য আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য মনে করেন নাই। শুধু একটি কৌতূহল, বিশ্বাস করিয়াছেন তবে কাহাকে—সুপ্ত পুলিশকে, না গুপ্ত পুলিশকে? পুলিশ সুপ্ত থাকিলে তো সেটা জনসাধারণের ট্যাকসে-গড়া খাজাঞ্চিখানার স্রেফ একটা নিকাশী নালা হইয়া যায়, আর গুপ্ত পুলিশের কত কেরামতি, সেটা নন্দজী হইতে অনেকেই আপনাকে বলিতে পারিবেন। উপমুখ্যমন্ত্রী মহাশয়! আপনি সেই গুপ্ত পুলিশকেই সত্যবাদী যুধিষ্ঠির ঠাওরান নাই তো!"

'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর, বিজ্ঞাপিত করেছে: "মুদ্রণের কাগজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রীর ব্যয় এত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি

পেয়েছে যে, কাগজ কিনে এবং সেই কাগজে সংবাদপত্র ছেপে আমাদের ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তদুপরি ১৫ নবেমবর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি কপি কাগজের উপর ০·০২ পয়সা হারে অন্তঃশুল্ক বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আগামী ১৫ নবেমবর (মফস্বল সংস্করণ ১৬ নবেমবর) থেকে আমরা আনন্দবাজার পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছি। বর্ধিত হারে প্রতি কপির নূতন বিক্রয় মূল্য হবে ০·২৬ পয়সা ও অন্তঃশুল্ক ০·০২ পয়সা। অর্থাৎ মোট ০·২৮ পয়সা। বিক্রেতাদের কমিশন দেওয়া হবে ০·২৬ পয়সার উপর।

সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে নিবেদন, তাঁরা যেন প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে এই ব্যাপারে, অতীতের মতই, আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।...”

আরো কয়েকটি সংবাদপত্র অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপত্রবিক্রেতা সমিতি মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সংবাদপত্র বিক্রী বয়কট আন্দোলন আরম্ভ করল। এই সমিতি অন্তঃশুল্ক দু-পয়সার উপর কোনো কমিশন দাবি করেনি, দাবি করেছে যে কোনো সংবাদপত্রে সারচার্জ বাদে মূল্যবৃদ্ধি করা চলবে না।

ফলে, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও আরো কয়েকটি সংবাদপত্র ১৯৭১ সালের ১৫ নভেম্বর থেকে কয়েকদিন বাস্তবপক্ষে প্রকাশিত হয়নি।

কিন্তু সে সময়ে রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল। পাকিস্তান যে কোনো মুহূর্তে ভারত আক্রমণ করতে পারে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (তথ্য ও বেতার) নন্দিনী সৎপথি সংবাদপত্রগুলির কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন—মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্ন স্থগিত রাখুন, শুধু উৎপাদন শুল্কের দুই পয়সা দাম বাড়ান।

নন্দিনী সৎপথি আশা করেছেন যে সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ সরকারের এই আবেদনে সাড়া দেবেন এবং শুধু উৎপাদন শুল্ক অতিরিক্ত নিয়ে অবিলম্বে আগেকার দামেই সংবাদপত্র প্রকাশন শুরু করবেন। নন্দিনী সৎপথি, ১৯৭১ সালের ২৪ নভেম্বর, সংসদে বলেছেন—সীমান্ত, বিশেষ করে পূর্বখণ্ডের অবস্থা গুরুতর। সংবাদপত্র না থাকলে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সর্বশেষ ও সঠিক সংবাদের জন্য সংবাদপত্রের প্রকাশ প্রয়োজন।

১৯৭১ সালের ২৫ নভেম্বর আবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হল। সেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে: "আমরা তাই এই আবেদনে সাড়া দিয়ে মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্ন আপাতত স্থগিত রাখছি। এবং পুরানো দামের (২২ পয়সা) সঙ্গে শুল্কের দুই পয়সা অতিরিক্ত নিয়েই (মোট ২৪ পয়সা) আমাদের কাগজ বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনো রচিত হয়নি, কিন্তু এ-বিষয়ে তিলার্ধ সংশয় নেই যে বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী ইতিহাসে একটি গৌরবময় নতুন অধ্যায় সংযোজিত করেছে। বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

বাঙলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিমন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলি, ১৯৭২ সালের ২৪ মার্চ, বলেছেন—আনন্দবাজার আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, তা আমরা কোনোদিন ভুলতে পারব না। আনন্দবাজার ছিল আমাদের সংগ্রামের সাথী। রোজ সকালে আনন্দবাজার পড়ে আমরা নতুন প্রেরণা পেয়েছি। তাঁদের ঋণ কখনো শোধ করা যাবে না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান 'আনন্দবাজার পত্রিকা'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে, ১৯৭২ সালের ২৪ মার্চ, বলেছেন—আনন্দবাজার আমাদের বিপদের দিনে যে সাহায্য করেছেন তা আমি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সব শুনেছি। আনন্দবাজারের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।...

আনন্দবাজার পঞ্চাশ বছর পার হয়েছে। কামনা করছি, আনন্দবাজার হাজার হাজার বছর চলুক।

সংবাদপত্রের রেজিস্ট্রারের ১৯৭১ সালের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে ১৯৭০ সালেও ভারতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'ই সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র; পরবর্তীকালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রচারসংখ্যা আরো বেড়েছে, তিন লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক পুণ্যক্ষণে অশোককুমার সরকার নিবেদন করেছেন:

"আনন্দবাজার পত্রিকার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। সুবর্ণ জয়ন্তীর আনুষ্ঠানিক আনন্দ লইয়া পত্রিকার জীবনে সমাগত যে নূতন বৎসর উদ্‌যাপিত হইতেছে, তাহার শুভ আরম্ভিক কৃত্য হিসাবে আমি সবার আগে পত্রিকার শ্রেষ্ঠ বান্ধব পাঠকসমাজের প্রতি আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে আমার শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি এই যে, অজস্র পাঠকের সৌহার্দময় আগ্রহ ও আনুকূল্য এই পত্রিকার অবিচল প্রতিষ্ঠার বনিয়াদ উত্তরোত্তর আরও দৃঢ় এবং আরও বিস্তারিত করিয়াছে। পাঠকেরা সন্তুষ্ট; এই সত্যটি আমার সম্পাদকীয় কর্তব্যের শ্রেষ্ঠ বিচার ও পুরস্কার।

আমি কোন মুহূর্তে বিস্মৃত হইতে পারি না যে, দেশবাসী এই পত্রিকার কাছে জনসেবার ও লোকহিতের একটি আদর্শোচিত ভাবনা এবং প্রেরণার প্রচার আশা করেন। খুবই সঙ্গত আশা, সঙ্গত দাবী। বিগত পঞ্চাশ বৎসরকালের ভাবনা কল্পনা ও কৃতিত্বের ঐতিহ্য পত্রিকাকে দেশবাসীর এই আশার সুযোগ্য আস্পদে পরিণত করিয়াছে। আমি বিশ্বাস করি, আমি অনুভব করি যে, সেই কৃতিত্বের ঐতিহ্য যেন ঐতিহাসিক পুণ্যবল হইয়া পত্রিকার সর্বক্ষণের দায়িত্বচেতনায় ও কর্তব্যনিষ্ঠায় সঞ্চিত রহিয়াছে। এই মহৎ সঞ্চয় আরও সমৃদ্ধ করিবার সঙ্কল্পই আমার সম্পাদকীয় কর্তব্যের প্রধান প্রেরণা হইয়াছে। যাহা দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থ, যাহা সার্বজনীন কল্যাণের অঙ্গীকার বহন করে, আমার সম্পাদকীয় চিন্তা অকুণ্ঠ নিষ্ঠার সহিত তাহারই অনুগামী হইবার অঙ্গীকার বহন করিতেছে।

এমন শ্লাঘা কখনও পোষণ করি নাই যে, সর্বক্ষেত্রে ও সকল ঘটনায় আমরা বৃহত্তর জনস্বার্থের সুরক্ষায়, অথবা পত্রিকার রূপ রীতি ও সৌষ্ঠবের মান উন্নত করিবার জন্য যে-প্রয়াস স্বীকার করিয়াছি, তাহাই একেবারে অখণ্ড ও চরম কৃতিত্বের ঘটনা হইয়া পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে। সাধ থাকিলেই সাধ্য থাকে না; বাধা আসিয়া সাধ্যতা ও সফলতাকে সীমিত করিয়া দেয়। এই সাধারণ সত্যটি পত্রিকার জীবনেও একটি সত্য। কিন্তু বিবেকের কাছে আমাদের কৈফিয়ত কখনও করুণ হইবার দুর্ভাগ্য লাভ করে নাই। কারণ, আমরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাই আমাদের আত্মপ্রত্যয়ের দীপ হইয়া জ্বলিয়াছে; এবং সেই সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা আমাদের সকল প্রয়াস উৎসর্গ করিয়াছি। অভিজ্ঞতার দ্বারা এই বিস্ময়কর সত্যটিও উপলব্ধি করিয়াছি যে, এক্ষেত্রে সফলতা ও তথাকথিত বিফলতা উভয়ই পত্রিকার শক্তি বাড়াইয়াছে। পত্রিকা শুধু তাহার নিজস্ব অভিমত ও বক্তব্যের আত্যন্তিক প্রচার ধারণ এবং বহন করে নাই, পত্রিকাতে পাঠকসমাজ ও জনসাধারণের বিশেষ অভিমত এবং বক্তব্যকে প্রশস্ত স্থান দিয়া আমরা জনমতের সহিত প্রত্যক্ষ সাহচর্যের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। জনসাধারণ আমাদের অভিমতকে যেমন সম্মানিত করিয়াছেন, আমরাও তেমনি জনমতকে সম্মানিত করিয়াছি।

পত্রিকার বিগত পঞ্চাশ বৎসরকালের কৃতিত্বময় ঐতিহ্যের ছবিটির দিকে তাকাইয়া

আমরা অবশ্যই গর্ববোধ করিতে পারি যে, আমাদের পত্রিকা পাঠকসমাজের বিপুল প্রীতি ও সমর্থন অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা ও আশা এই গর্ববোধে অভিভূত নহে। আমি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য পত্রিকার শক্তি ও প্রতিভাকে আরও বিচিত্র এবং নূতনতর উজ্জ্বলতায় দীপ্ত করিবার আশা ও সংকল্প পোষণ করি। যুগজীবনের ছবিটি পুরাতন জীর্ণতার অবলেপ বর্জন করিয়া নূতন বর্ণানুরঞ্জনা লাভ করিয়া চলিয়াছে। প্রিয় পাঠকগণের মনের মন্দিরে তাই নূতন অর্ঘ্য পেঁছাইয়া দিবার দায়িত্ব অহরহ অনুভব করিয়া থাকি। প্রতিষ্ঠায় সুস্থিত হইলেও সাংবাদিক অন্বেষণা রূপণা ও পরিবেষণে একটা স্থিতি লইয়া পড়িয়া থাকিবার নীতি আমাদের পত্রিকা অনুসরণ করে না। সংবাদ পরিবেষণে ও সম্পাদকীয় কর্তব্যে নূতন রীতি আহ্বান করিবার জন্য সদাজাগত গবেষণার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি। মানুষের মনের ও চোখের কাছে প্রাকৃতিক ছয় ঋতুর ডালি যেমন একই আলোছায়া ও একই রূপের পুষ্পামোদ বহন করে না, আমাদের পত্রিকা তেমনই জাতীয় প্রয়োজনের অথবা বিশ্বঘটনার শুধু এক রাজনীতিক রূপের পরিচয় বহন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে না। সাংস্কৃতিক ও অর্থনীতিক জীবনের অজস্র আগ্রহ এবং কর্মপ্রচেষ্টার, সাহিত্য শিল্প ও বিজ্ঞানের নিত্যবিচিত্র সৃষ্টির অভিনব পরিচয় পাঠকগণের কাছে রম্য আনন্দের উপহার করিয়া পেঁছাইয়া দিতে আমাদের পত্রিকার প্রয়াস উত্তরোত্তর আরও প্রবল হইবে। আমি জানি, ইহা সহজ ও সামান্য প্রয়াসে সম্ভব হইবার নহে। শিল্পীর কল্পনাকুশল প্রতিভা এবং গবেষকের অধ্যবসায় থাকিলে তবেই এই পরিকল্পনার দুরূহতা জয় করিতে পারা যাইবে। পাঠক-সমাজকে আমি শুভ প্রতিশ্রুতির এই বার্তা শুনাইতে পারি যে, পত্রিকা নূতনতর সংকল্প লইয়া এই প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, সংবাদপত্রের কর্তব্য নিতান্ত সংবাদ নিবেদন করিবার একটা কঠোর শুষ্কাচার নহে। ইহা সৃষ্টিশীল শিল্পকলার প্রকৃতির অনুরূপ একটি অনুশীলন। জনসাধারণ ও পাঠক-সমাজের সহিত আত্মিক সম্বন্ধ আরও নিবিড় করিবার জন্য আমাদের পত্রিকা অবশ্যই সৃষ্টিকুশল রম্যতা ও কৃতিত্বের সমারোহ লইয়া রূপান্বিত হইতে থাকিবে।

সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক পুণ্যক্ষণে আমি আগামী দিনের সংকেত অনুধাবন করিয়া এই আশার সঞ্চার অন্তরে অনুভব করিতেছি যে, ভবিষ্যতের পরীক্ষা শত দুরূহতার মূর্তি লইয়া দেখা দিলেও পত্রিকা তাহা জয় করিয়া এবং লক্ষ-লক্ষ পাঠকের কাছে প্রিয়তর রূপ লইয়া বিশাল সমাদর পাইতে থাকিবে। পাঠকগণের সেই সমাদর, সেই সঙ্গে তাঁহাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা আমাদের এই পত্রিকার উন্নতি সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্বল হইবে।”[১]

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র জনপ্রিয়তার কারণ সংক্ষেপে চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন:

"প্রকাশের কিছুকাল পরেই আনন্দবাজার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু কি কারণ? সেটা অবশ্যই অনুধাবনের বিষয়। কেননা, আনন্দবাজার গান্ধীজীর আদর্শকে এগিয়ে চলার পাথেয় করে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু বাঙলা দেশে তখন গান্ধীজীর মতাদর্শের বিরুদ্ধবাদীদেরও প্রবল পরাক্রম। সেই পরিবেশে গান্ধীবাদ সম্বল করে এগিয়ে যাওয়া, সংগ্রাম করা ও জয়লাভ করা সোজা কথা নয়।

এই বিজয়ের কয়েকটি সঙ্গত কারণ আছে বলে আমার মনে হয়। প্রথম কারণ: আনন্দবাজার যদিও ভিউজ views -এর দিক থেকে প্রথমাবস্থায় একটা নির্দিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু নিউজ news পরিবেশনের ক্ষেত্রে ছিল সম্পূর্ণ

নিরপেক্ষ। অহিংস কিংবা সহিংস—সব মতবাদের নিউজই নির্বিচারে প্রকাশিত হত। ফলে আপামর জনসাধারণের কাছে আনন্দবাজার প্রিয় ও গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় কারণ হল: আনন্দবাজারের ভাষা ছিল ঝরঝরে। অন্যান্য সমকালীন সংবাদপত্রের ভাষার চাইতে আনন্দবাজারের ভাষা, বাক্য গঠন ছিল অত্যন্ত সহজ ও সর্বজনগ্রাহ্য। এই সহজিয়া ভাবের জন্যও আনন্দবাজারের গতি অবাধ হয়ে ওঠে।

তৃতীয় কারণ: আনন্দবাজারের সমকালীন সংবাদপত্রে কলকাতার সংবাদই প্রাধান্য পেত বেশি। মফঃস্বল বাঙলার খবরাখবর ঐসব পত্রিকায় প্রায় থাকতই না। আনন্দবাজার রাজধানীর সংবাদের পাশাপাশি মফঃস্বল বাঙলার সংবাদ পরিবেশন করতে থাকে। সম্ভবত সারা বাঙলাদেশেই তার সংবাদদাতা ছিল বলেই আনন্দবাজার মফঃস্বল বাঙলার সংবাদ নিয়ে মফঃস্বলের নাগরিকদের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

তাছাড়াও, সাম্প্রতিককাল পর্যন্তও, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, কোন সংবাদ কতটা আকর্ষক করে পরিবেশন করা যায়, তা আনন্দবাজার জানে।...

তাছাড়া সবচেয়ে বড়ো জিনিস ছিল, আনন্দবাজার বাঙলাদেশ ও বাঙালীজাতিকে সর্বদা প্রাধান্য দিত। কি পরাধীন, কি স্বাধীন ভারতে—সর্বদাই বাঙলাদেশের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের দৃপ্ত দাবি জানিয়ে জনমত গঠনে সহায়ক হয়েছে আনন্দবাজার। বাঙলাদেশের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের প্রয়াসের পেছনে আনন্দবাজার স্বার্থহীন সমর্থন জানিয়েছে। ফলে বাঙালী জাতির কাছে আনন্দবাজার 'নিজের পত্রিকা' হয়ে ওঠে এবং আজও তা সগৌরবে বজায় রয়েছে।"[১০]

এই সত্যসুন্দর ব্যাখ্যার উপর কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞের বিবেচনায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এদেশে সার্থক সংবাদপত্রের পথপ্রদর্শক। সত্যরঞ্জন বক্সী বলেছেন: "আনন্দবাজার জাতির মুখপত্র। পরাধীন জাতির সে ছিল হাতিয়ার। আর স্বাধীন জাতির আজ সে দর্পণ। শত্রুরা যত নিন্দাই প্রচার করুক—আসলে সার্থক নিউজপেপারের পথ প্রদর্শন আনন্দবাজারই প্রথম করেছে এদেশে—দেশীয় সংবাদপত্রের জগতে।"[১১]

এ-সত্যে আজ আর সংশয় নেই যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বলিষ্ঠতা ও সাহসিকতার
সঙ্গে কর্তব্য পালন করেছে, বাঙলা সাংবাদিকতায় আধুনিকতার প্রবর্তন করেছে এবং
বাঙলা সংবাদপত্রকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০
সালের ১৩ এপ্রিল, বলেছেন: "আনন্দবাজারের প্রথম দান, বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে
অকুতোভয় সংগ্রাম। আনন্দবাজার বলিষ্ঠতা ও সাহসিকতার সঙ্গে সেই কর্তব্য পালন
করেছে। এবং তার দ্বিতীয় দান, বাঙলা সাংবাদিকতায় আধুনিকতার প্রবর্তন। আনন্দ-
বাজার চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বাঙলা সাংবাদিকতাকে গ্রহণ করেছিল এবং ইংরেজী কাগজের
মতো কৌলীন্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে। আনন্দবাজার সেই সংগ্রামে জয়লাভের
জন্য গর্ব করতে পারে। আজ বাঙলা সংবাদপত্র সকল বিষয়ে ইংরেজী কাগজকে
'সাঁড়াশির চাপে ফেলেছে।' সেকালের শিশুচারা আনন্দবাজার আজ বিরাট মহীরুহে
পরিণত হয়েছে। বাঙলা সংবাদপত্রকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার গৌরব ও কৃতিত্ব
আনন্দবাজারই দাবি করতে পারে।"
মনে রাখা দরকার, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' স্বাধীনতার পরবর্তীকালেই পরম
গৌরবের অধিকারী হয়নি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "আনন্দবাজার আজকে
অর্থাৎ এই স্বাধীনতার পরবর্তীকালেই পরম গৌরবের অধিকারী হয়নি; 'আনন্দবাজার'
তার জীবনের সূচনা থেকেই এই গৌরবের অধিকারী।"[১২]
বহু কর্মীর অনলস নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের ফলে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' পরম গৌরব
অর্জন করেছে। এবং সবকিছুর মূলে আছেন দুই অসাধারণ ব্যক্তি—সুরেশচন্দ্র
মজুমদার ও প্রফুল্লকুমার সরকার।

যদুনাথ সরকার, ১৯৫৫ সালের ১৩ এপ্রিল বলেছেন: "এই দুই অসাধারণ ব্যক্তি—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকারকে আমাদের ব্যস্তবাগীশ রাজনৈতিক মহল স্বীকার করিতে চাহেন নাই। পারিবারিক সম্পর্কের কারণে এই দুইখানি (আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড) পত্রিকার জন্মলাভের পূর্ব হইতেই আমি তাঁহাদের উভয়কেই চিনিতাম এবং পত্রিকা দুইখানির শৈশব হইতে পরিণত রূপের শক্তি-সামর্থ্য লাভ পর্যন্ত তাঁহাদের অব্যাহত ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিয়াছি। সুরেশ সংগঠক ও বাস্তব কর্মী পুরুষ ছিলেন এবং প্রফুল্ল ছিলেন সম্পাদনায় বুদ্ধিদাতা ও লেখক দলের পরিচালক। তাঁহাদের প্রত্যেককেই যে বহুবিধ অসুবিধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, তাহা বর্তমানে খুব অল্প লোকেই ধারণা করিতে পারে। কোনো লক্ষপতি পুঁজিপতি তাঁহাদের সাহায্যার্থ আসেন নাই, তাঁহাদের প্রতি কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের অন্ধ সমর্থন ছিল না। দেউলিয়া হইবার ভয় ও সরকারের ভ্রূকুটি গ্রাহ্য না করিয়া কেবল নিজেদের যোগ্যতা ও কঠোর পরিশ্রমের বলে তাঁহারা সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। পঠনক্ষম জনসাধারণকে সত্য ও প্রকৃত সংবাদ সুলভে সরবরাহ এবং আমাদের নির্বাচক মণ্ডলীর চিন্তাধারাকে বিজ্ঞতা ও শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা যদি দেশসেবার যথার্থতম পদ্ধতি হয়, তাহা হইলে এই দুইজন দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁহাদেরই কার্যের ফল আমরা সকলে ভোগ করিতেছি।"

যতদূরেই যাই, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ইতিহাসে শেষপর্যন্ত দুই আদিপুরুষের কাছেই ফিরে আসতে হয়—সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও প্রফুল্লকুমার সরকার।

যদুনাথ সরকার, ১৯৫৫ সালের ১৩ এপ্রিল, বলেছেন:

"বর্তমানে সংবাদ সরবরাহই প্রথম ও প্রধানতম কার্য হইয়াছে এবং ইহাই সংবাদপত্রের অস্তিত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তথাকথিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র-সমূহের প্রাচীন যুগে 'স্টেটসম্যান'-এর বিলাতী সাপ্তাহিক ডাক সংস্করণের সমস্ত সংবাদ চুরি ও রুদ্ধশ্বাস দ্রুততার সহিত অনুবাদ করিয়া প্রতি শনিবার ঐ সমস্ত সংবাদপত্র ছাপা হইত। মেল স্টীমার প্রতি শনিবার বোম্বাই হইতে ছাড়িত এবং তাহা ধরিবার জন্য overland edition 'স্টেটসম্যান' প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার কলিকাতায় প্রকাশিত হইত। এই সমস্ত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক খুব বেশী হইলে এই চুরি করা জিনিস ছাড়া অতিরিক্ত সামান্য কিছু স্থানীয় সংবাদ থাকিত।

প্রফুল্ল এই সমস্তই পরিবর্তন করিয়া দিলেন। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশে ও অন্যান্য প্রদেশের বড় বড় সহরে তাঁহার নিজস্ব সংবাদদাতাদিগকে নিযুক্ত করিলেন (অল্পসংখ্যক সবেতনে এবং অন্যান্য অধিকাংশই তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিছক দেশসেবার আগ্রহে) এবং আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদের স্তম্ভসমূহ শাসক ও শাসিতের দ্বারা সাগ্রহে পঠিত হইতে লাগিল। ইহা ধারাবাহিক আকারের ধর্মসভা পত্রিকা অথবা উপদেশাবলী নহে, প্রকৃত সংবাদপত্র হইল।

দ্বিতীয়ত: প্রফুল্ল আমাদের দেশের কত কত প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া বাঙ্গলা সাংবাদিকতাকে সরস, সমৃদ্ধ করিলেন। এইরূপে তাঁহার পত্রিকা বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক হইল এবং সংবাদে ও রাজনৈতিক বিষয়ের মন্তব্যেও নূতন ও দুর্লভ মনোহারিত্ব আমদানী হইল। কত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ বাঙ্গালী গ্রন্থকারকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গড়িয়া তুলিয়াছে, কত বিখ্যাত গ্রন্থকার ইহার বার্ষিক সংখ্যাসমূহে রচনা প্রকাশ করিয়া অনভ্যস্তরূপে দক্ষিণা লাভ করিয়াছেন। অন্যান্য সকলে প্রফুল্লের পথ অনুসরণ করিতেছেন। তিনি এইভাবে বাঙ্গলা সাংবাদিকতাকে আমেরিকার অর্থলোলুপ, চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী সংবাদপত্রের হীন অধোগতি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।"

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৭ সালের ১৩ এপ্রিল, বলেছেন: "কোনো ব্যক্তির

মৃত্যুর বহুকাল পরেও যদি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি স্বতঃ উৎসারিত হতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে তাঁর মধ্যে অমরতার উপাদান আছে। মৃত্যু প্রফুল্লকুমারের উপর যবনিকা নিক্ষেপ করতে পারেনি। মতবাদকণ্টকিত ও বিরোধতিক্ত আধুনিক যুগে সম্পাদক হিসাবে তিনি যে প্রকার সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা বিরল। আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁর জীবন্ত কীর্তিস্তম্ভ, কালজয়ী অমর কীর্তি।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মধ্যবর্তিতায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভাষা কেড়ে এনে বলছি, বাঙলা সংবাদপত্রজগতে 'নিঃশব্দ বিপ্লব' হয়েছে। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০ সালের ১৩ এপ্রিল, বলেছেন: "এই বিপ্লবের পুরোধা ছিলেন প্রফুল্লকুমার সরকার এবং আনন্দবাজারের এই কৃতিত্ব লাভে প্রফুল্লকুমারের অবদান অনস্বীকার্য।"

সজনীকান্ত দাস, ১৯৬১ সালের ১৩ এপ্রিল, বলেছেন: "প্রফুল্লকুমারের সাংবাদিক জীবনের মহিমা, তাঁর প্রশান্তি নিঃশব্দে যে ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করেছে তার ফলেই আজ আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠান এত বড় হয়েছে।"

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৬২ সালের ১৩ এপ্রিল, বলেছেন: "প্রফুল্লকুমার একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষী ছিলেন। প্রাচীন পণ্ডিতেরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী এই দুই প্রতিভার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উভয় প্রতিভারই অধিকারী ছিলেন।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৩ সালের ১৪ এপ্রিল, বলেছেন: "বাঙলাদেশের যে-কজন কৃতি সন্তান ভারতধর্ম নিষ্ঠাভাবে পালন করে গেছেন, প্রফুল্লকুমার তাঁদের একজন। তিনি ধর্মসাধনার সঙ্গে দেশের কল্যাণকর্মের সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়ে গিয়েছেন। দেশভক্তি এবং ঈশ্বরভক্তি একদেহে মিলিত হলে এক নতুন শক্তির সঞ্চার হয়। প্রফুল্লকুমারের মধ্যে এই শক্তি সকলে প্রত্যক্ষ করেছেন। পরম বৈষ্ণবের লক্ষণ, তাঁর বাক্য সুন্দর, তাঁর হাস্য সুন্দর এবং তিনি বিনয়ে অকৃত্রিম। প্রফুল্লকুমারের এই সকল গুণই বর্তমান ছিল।"

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৯ সালের ১৩ এপ্রিল, বলেছেন: "আমার লেখক জীবনের গোড়ার দিকে আমি প্রফুল্লকুমারের সুসংস্কৃত, আদর্শবাদী, চিন্তাশীল. দূরদর্শী মনের সংস্পর্শে এসেছিলাম। প্রফুল্লকুমারের প্রবন্ধ আমাদের মনে সুস্থ সমাজবোধ জাগিয়েছে, আমাদের চিত্তকে উন্মুখ করেছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিকে। তাঁর আদর্শনিষ্ঠা এবং কর্মনিষ্ঠার সমন্বয়ই আনন্দবাজার পত্রিকাকে প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় পরিণত করতে সমর্থ হয়েছে। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র মজুমদারের মুখটাও মনে ভেসে উঠছে বারবার।"

কিন্তু সুরেশচন্দ্রের জীবনের সর্বপ্রধান কীর্তি কী? সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছেন: "সুরেশচন্দ্রের জীবনের সর্বপ্রধান কীর্তি দৈনেক আনন্দবাজার পত্রিকা।"[১০]

প্রমথনাথ বিশী, ১৯৬২ সালের ১২ অগস্ট বলেছেন: "স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সুরেশচন্দ্রের প্রধান কীর্তি। 'রবীন্দ্র-ভারতী' প্রতিষ্ঠা আরেক কীর্তি। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কীর্তি তিনি নিজে। ঐ কীর্তিমান পুরুষ বাঙলাদেশে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন।"

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৬৬ সালের ১২ অগস্ট, বলেছেন: "ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে দেশে যে-সব কৃতী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সুরেশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। দেশপ্রেমের সঙ্গে বিপুল সংগঠন ও কর্মশক্তি তাঁর ছিল। তাঁর অকুতোভয় সাংবাদিকতার জন্য দেশের কথা সংবাদপত্রে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ পায়। অদ্ভুত কর্মশক্তির দ্বারা তিনি সফলতার চূড়ান্ত দেখিয়েছেন।"

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৯ সালের ১২ অগাস্ট, বলেছেন: "সুরেশচন্দ্রের জীবনকে বৃহৎ বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করা যায়। একেবারে সামান্য থেকে তাঁর ও

আনন্দবাজার পত্রিকার অংকুরোদ্গম। তখনকার দিনে দৈনন্দিন কাগজ ছাপাবার মতো পয়সা থাকত না। এই সামান্য অবস্থা থেকে আনন্দবাজার জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, সারা ভারতে এর বিরাট রূপ, এর কারণ এটি একটি সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "১৯২২ সন থেকে ১৯৫৪ সন পর্যন্ত 'আনন্দবাজার'কে তিনি (সুরেশচন্দ্র মজুমদার) পরিচালিত করেছেন। বাংলা দেশে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁর নাম উচ্চতম জীবনক্ষেত্র থেকে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত এবং স্বীকৃত। কিন্তু এই বিচিত্র মানুষটি সকল স্বীকৃতি সকল প্রচারণা সকল প্রতিষ্ঠার সমারোহ থেকে দূরে অবস্থান করেছেন। বাংলা দেশে বর্তমানকালে যাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাঁদের বোধ করি প্রতিটি জন (যাঁদের বয়স পঞ্চাশের কাছে) কোন-না-কোন সূত্রে এই মহান কর্মধন্য মানুষটির সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাঁর মিষ্টতা ও মাধুর্যের স্বাদে গন্ধে মুগ্ধ হয়েছেন বলেই আমার বিশ্বাস। এবং সকলেই একবাক্যে বলবেন যে, এই সংস্পর্শ পাবার জন্য তাঁরা এই মানুষটিকে সম্মুখে কোনো উচ্চাসনে অহংকৃত ভঙ্গিতে উপবিষ্ট দেখেননি। তাঁকে তাঁরা দেখেছেন, অন্তরালেই তিনি বসে আছেন; এবং তিনি নম্র ও স্মিত হাস্যময় একটি মানুষ"[১৪]

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ মার্চ ১৯৭২।
২। সুবোধ ঘোষের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
৩। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ জুন ১৯৬৫।
৪। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।
৫। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরেজী নাম ও শব্দ, 'দেশ' ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭, পৃঃ ২১-২২।
৬। আনন্দবাজার পত্রিকা, কংগ্রেস সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৪৮, পৃ, ৫৮।
৭। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।
৮। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরেজী নাম ও শব্দ 'দেশ' ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭, পৃঃ ২২।
৯। আনন্দবাজার পত্রিকা, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, পৃঃ ৩।
১০। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
১১। সত্যরঞ্জন বক্সীর সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।
১২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ অগাস্ট, ১৯৬৯।
১৩। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারঃ সুরেশচন্দ্র মজুমদার (কলকাতা, ১৯৫৪), পৃঃ ৫।
১৪। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ অগাস্ট, ১৯৬৯।

নির্ঘণ্ট

বিষয়	পৃষ্ঠা

EVALUATION UNIT Govt. of W. Bengal CALCUTTA-19

S.C.E.R.T., West Bengal Library Calcutta 25/3, B. C. Road